শুকতারা

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

ঊনচত্বারিংশৎবর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ-১৩৯৩

Hard Copy - Library
Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

গ্লুকন-ডি সুপারহিরো

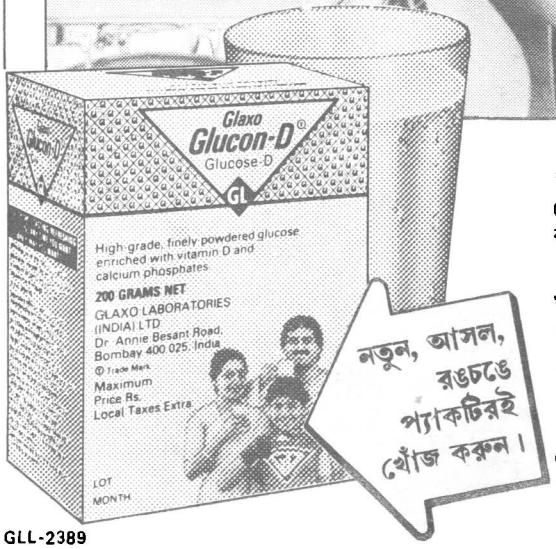

ক্লান্তিকর গরম হোক যতই নিদারুণ, গ্লুকন-ডি দিয়ে আপনার বাচ্চাকে প্রাণচঞ্চল রাখুন – এই নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয়তে থাকে গ্লুকোজ, ভিটামিন – ডি এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট।

গ্লুকন-ডি, জ্যুস, দুধ, চা, কফি বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খান, আর, পরিবারের সবাই এক অপূর্ব সতেজ করা পানীয় পান। ১০০ গ্রা., ২০০ গ্রা. ও ৫০০ গ্রা, প্যাকে পাবেন।
গ্ল্যাক্সো-র অবদান গ্লুকন-ডি

গ্লুকন-ডি®

শক্তি যোগানের পানীয়, সুপারহিরোর অতি প্রিয়

GLL-2389

বাঁটুল দি গ্রেট

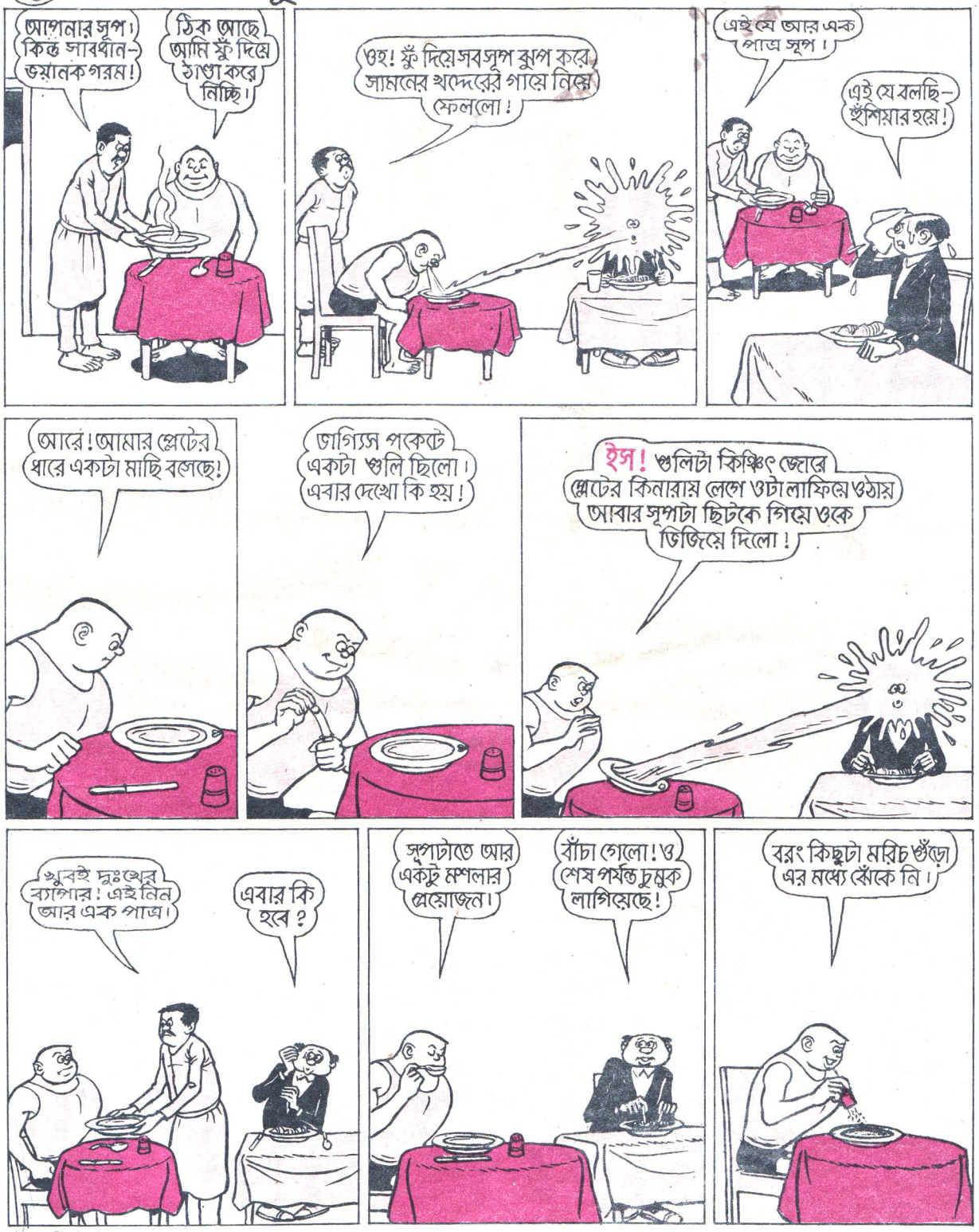
আপনার সূপ। কিন্তু সাবধান- ভয়ানক গরম!
ঠিক আছে আমি ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিচ্ছি।
ওহ! ফুঁ দিয়ে সব সূপ ঝুপ করে সামনের খদ্দেরের গায়ে নিয়ে ফেললো!
এই যে আর এক পাত্র সূপ!
এই যে বলছি- হুঁশিয়ার হয়ে!
আরে! আমার প্লেটের ধারে একটা মাছি বলেছে!
ডাগ্যিস পকেটে একটা গুলি ছিলো। এবার দেখো কি হয়!
ইস! গুলিটা কিঞ্চিৎ জোরে প্লেটের কিনারায় লেগে ওটা লাফিয়ে ওঠায় আবার সূপটা ছিটকে গিয়ে ওকে ডিজিয়ে দিলো!
খুবই দুঃখের ব্যাপার! এই নিন আর এক পাত্র।
এবার কি হবে?
সূপটাতে আর একটু মশলার প্রয়োজন।
বাঁচা গেলো! ও শেষ পর্যন্ত চুমুক লাগিয়েছে!
বরং কিছুটা মরিচ গুঁড়ো এর মধ্যে ঝেঁকে নি।

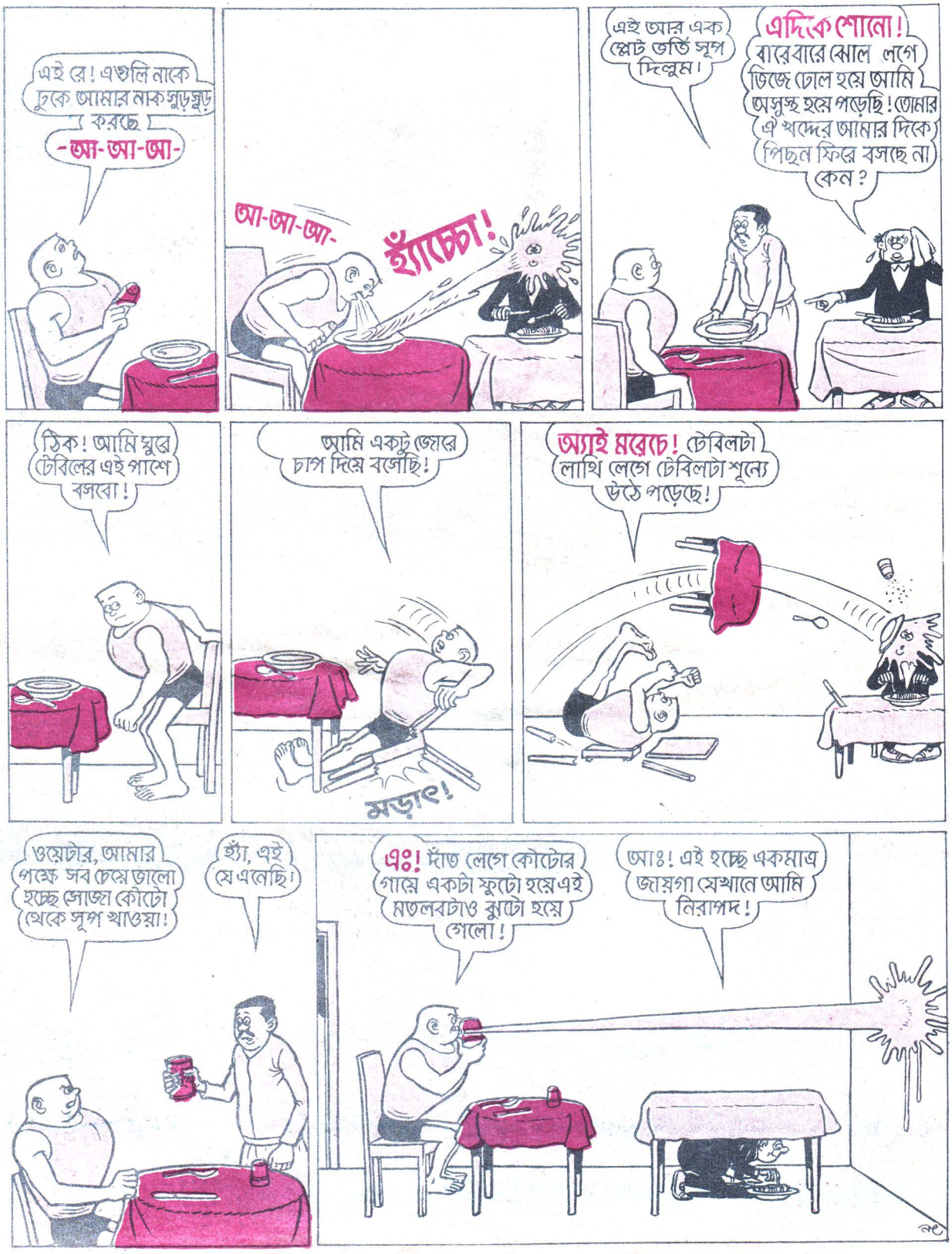
এই রে! এগুলি নাকে ঢুকে আমার নাক সুড়সুড় করছে
-আ-আ-আ-
আ-আ-আ-
হ্যাঁচ্চো!
এই আর এক প্লেট ভর্তি সুপ দিলুম।
এদিকে শোনো! বারেবারে ঝোল লেগে ডিজে ঢোল হয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি! তোমার ঐ খদ্দের আমার দিকে পিছন ফিরে বসছে না কেন?
ঠিক! আমি ঘুরে টেবিলের এই পাশে বসবো!
আমি একটু জোরে চাপ দিয়ে বসেছি!
মড়াৎ!
অ্যাই মরেছে! টেবিলটা লাথি লেগে টেবিলটা শূন্যে উঠে পড়েছে!
ওয়েটার, আমার পক্ষে সব চেয়ে ভালো হচ্ছে সোজা কৌটো থেকে সুপ খাওয়া!
হ্যাঁ, এই যে এনেছি!
এঃ! দাঁত লেগে কৌটোর গায়ে একটা ফুটো হয়ে এই মতলবটাও ঝুটো হয়ে গেলো!
আঃ! এই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে আমি নিরাপদ!

শুকতারা

বৈশাখ, ১৩৯৩

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 439/1 (2) T. B. C. (Dated 25th January 1982. 2a-2t/81)

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠাদ
১।	মৃত্যুদূতের কালোছায়া (ছবিতে গল্প) –নারায়ণ দেবনাথ	
২।	বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন ছবিতে গল্প) –নারায়ণ দেবনাথ	১৬১
৩।	খোকার দুষ্টুমি (কবিতা)–মৌসুমী গুপ্তা	১৬৫
৪।	রামধনুর সন্ধানে (রঙিন ছবিতে গল্প) –ময়ূখ চৌধুরী	১৬৬
৫।	অপূর্ব চাকি সৌরীন শিকদার (অগ্নিযুগের সৈনিক)–সুধীন্দ্রনাথ রাহা	১৬৮
৬।	ক্যাপ্টেন কুম্ভকর্ণ আর পটলা (সম্পূর্ণ উপন্যাস) –শক্তিপদ রাজগুরু	১৭২
৭।	হুডন ডুডন (রূপকথা)–জীবন ভৌমিক	১৮৩
৮।	মা-লক্ষ্মীর বাহন (সম্পূর্ণ উপন্যাস)–শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭
৯।	বাজনার ধাঁধা (কবিতা) –কমল লাহিড়ী	১৯৭
১০।	স্টার ট্রেক (ছবিতে কল্প বিজ্ঞানের গল্প)	১৯৮
১১।	পান্ডব গোয়েন্দা (গোয়েন্দা গল্প) –ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	২০০
১২।	সীবা (শিকারের গল্প) –গৌতম মুখোপাধ্যায়	২০৪
১৩।	খেলাধূলা–শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২১১
১৪।	অলৌকিক (সত্যঘটনা)–নন্দলাল ভট্টাচার্য	২২৩
১৫।	ইলেকট্রিক জীবাণু (বড়গল্প–কল্প বিজ্ঞানের) –অদ্রীশ বর্ধন	২২৬
১৬।	টোকোনের বন্ধু (ভূতের গল্প) –শিশিরকুমার মজুমদার	২৩৩
১৭।	নামেও মজা	২৩৭
১৮।	রূপোর নদী (ফ্রান্সিসের নতুন অভিযান) –অনিল ভৌমিক	২৩৮
১৯।	হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে মজার গল্প) –নারায়ণ দেবনাথ	২৪২
২০।	মেঘমুক্ত সূর্য (ঐতিহাসিক গল্প) –স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৪
২১।	যাদুর দেশে টারজান (এ্যাডভেঞ্চার) –সব্যসাচী	২৫১
২২।	এসো, দূরের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি (মহাকাশ বিজ্ঞান)–অরূপরতন ভট্টাচার্য	২৫৫
২৩।	বাঘ বেচারা (কবিতা)–দীপঙ্কর বিশ্বাস	২৫৭
২৪।	নকল ভূত (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) –সুব্রত বসাক	২৫৮
২৫।	বিফল যাত্রা (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) –পার্থসারথি সরকার	২৫৯
২৬।	সাহিত্য প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)	২৬০
২৭।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	২৬১
২৮।	দাদুমণির চিঠি	২৬৩
২৯।	তোমাদের পাতা	২৬৪
৩০।	আফ্রিকার জঙ্গলে (ভ্রমণ কাহিনী) –অমিয়কুমার হাটি	২৬৬
৩১।	বাহাদুর বেড়াল (ছবিতে গল্প) –নারায়ণ দেবনাথ	২৭০
৩২।	এপ্রিল ফুল (ফিচার) –আরতি বসু	২৭২

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য–হাতে নিলে ৫৩ টাকা। সডাক–৬৫ টাকা। মূল্য—৬·০০ টাকা

ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পেতে ট্যালকম পাউডার নয়, নাইসিল চাই।

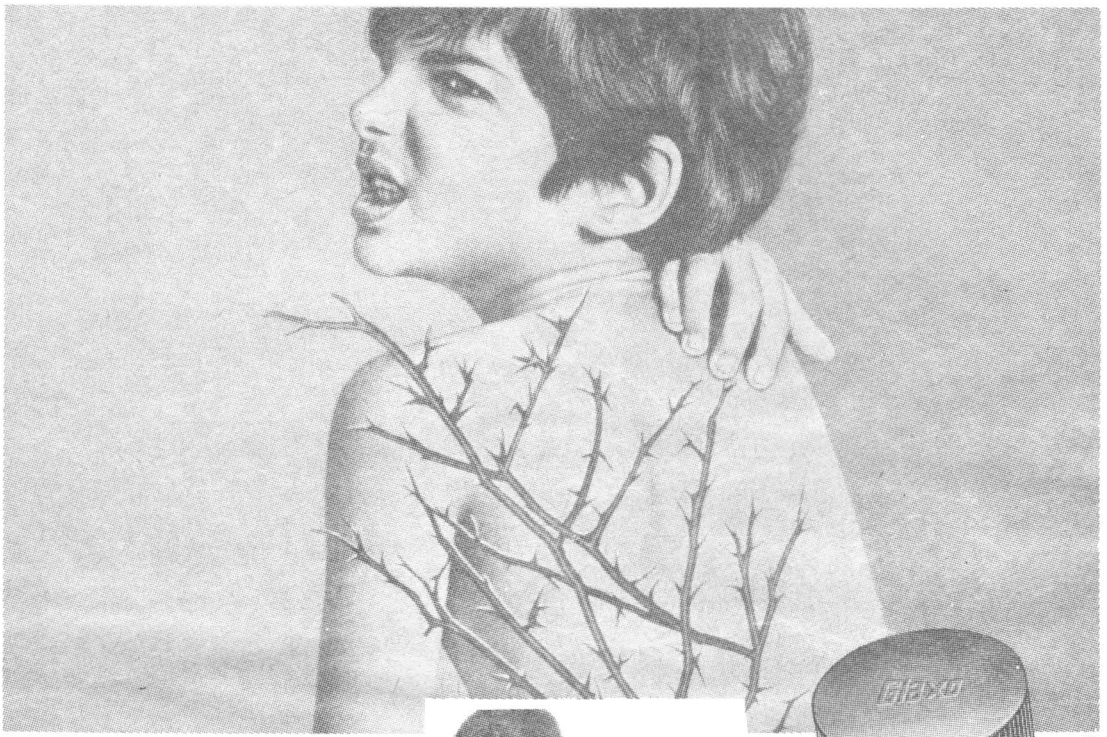

নাইসিল লাগান ঘামাচির কষ্ট থেকে চট্‌পট্ আরাম পান।

নাইসিল হ'ল এক ওষুধ মেশানো পাউডার। ঘামাচির সবরকম কষ্ট থেকে সঙ্গেসঙ্গে আরাম দেওয়ার জন্যেই এটি বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে। এটি চুলকানি, জ্বালাভাব থেকে নিমেষে আরাম দেয় আর ঘামাচি ছড়িয়ে পড়া রোধ করে, যা ট্যালকম পাউডার করতে পারে না।

নাইসিল, ঘামাচির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য উপায়।

১। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া নিবারণ করে। ২। ঘাম শুষে নেয়।
৩। দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু নষ্ট করে। ৪। ত্বকে স্নিগ্ধতা এনে দেয়।

স্বাস্থ্যের উৎস
গ্লাক্সো

GLL/8808

শুকতারা

৩৯শ বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • বৈশাখ, ১৩৯৩/এপ্রিল ১৯৮৬

খোকার দুষ্টুমি

মৌসুমী গুপ্তা

ঘুমপাড়ানি গান গায় মা
"আয় চাঁদ আয়।"
খোকা হেসে শুধায় মাকে
"চাঁদ কি ধরা যায়?"

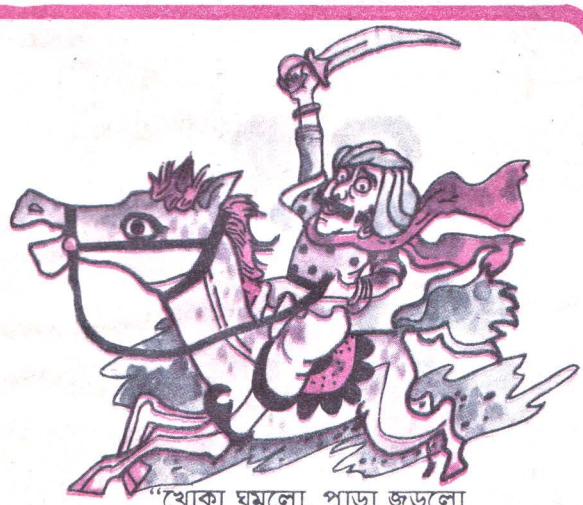

"খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লো
বর্গী এলো দেশে।"
"বর্গী কোথায় চন্ডিগড়ে?"
শুধায় খোকা হেসে।

"ঘুমের মাসি, ঘুমের পিসি
ঘুম দিয়ে যা।"
খোকা শুধায়, "মাসি-পিসি
রাতে ঘুমায় না?"

রাগ করে মা বলেন শেষে
"ঘুমোতে হবে না।"
খোকা বলে, "এবার আমার
ঘুম পেয়েছে মা।"

ছবিঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

আমরা নরকের সিংহদ্বার অতিক্রম করেছি ... একী !
নরকের দরজা পার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুর দেহ ছিটকে পড়তে লাগল তলার দিকে ... অবশেষে তারা এসে পড়ল জীবন্ত পৃথিবীতে ...
মৃত্যুপুরী থেকে আমরা এসে পড়েছি জীবন্ত পৃথিবীতে ... কিন্তু ওরা কারা লড়াই করছে ?
কী বিপদ ! ... অশনি ! উভয়পক্ষই আমাদের আক্রমণ করছে !
শল্য ! যদি বাঁচতে চাও, তো, অস্ত্র তুলে নাও। এখানে সবাই আমাদের শত্রু।
যদি বাঁচতে চাও, অস্ত্র ফেলে দাও।
অশ্বারোহী সৈন্যদল ! ... শল্য ! আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।
বিজয়ী সেনাদল শত্রুপক্ষের হতাবশিষ্ট সৈন্যদের বন্দী করল ...
সেনাপতি দেখুন – দু'জন আর্যযোদ্ধা !
দক্ষিণাবর্তের আর্যগণ তাহলে এই অনার্য বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে ! ... ওদের আমার কাছে নিয়ে এস ...
তোমরা দু'জন অনার্য বিদ্রোহীদের কাছে চলে যাও এবং গোপনে আমাদের কাছে তাদের গতি-বিধির সংবাদ দাও। পরিবর্তে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে।
এই যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করব না – আমরা এসেছি নেত্রাসুরের সন্ধানে।
ঐ নাম যারা উচ্চারণ করে তারা অভিশপ্ত জীব। ... সৈন্যগণ ! এই দুই মূর্খ বিদেশী যেখানে যেতে চায়, সেইখানে ওদের পৌঁছে দাও।

দুই বন্ধুকে বেঁধে দড়ি ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল একটি অশ্বারোহী সৈন্য…

প্রায় একঘণ্টা পথ চলার পরে তারা এসে থামল একটি উপত্যকার প্রবেশ-পথে। অশ্বারোহী সৈন্যটি দুই বন্ধুর বাঁধন কেটে তাদের দুটি ঢাল ও দুটি তরবারি দিয়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে স্থানত্যাগ করল…

শল্য! এই স্থান অতিশয় নির্জন… মনে হয় এখানে ভয়ের কারণ আছে। যে-সৈন্যটি আমাদের পৌঁছে দিল, সে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে স্থানত্যাগ করল কেন?… তার চোখেমুখে আতঙ্কের আভাস আমি লক্ষ্য করেছি।

শল্য! আমি এখানে বিপদের আভাস পাচ্ছি।

আমিও এক অশুভ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করছি। অশনি! তরবারি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকো।

অশনি! সামনে মানুষ আছে।

কিন্তু ওরা একটুও নড়ছে না!

একটি মূর্তির কাছে এগিয়ে গেল অশনি ও শল্য…

এতো দেখছি পাথরের মূর্তি!

কিন্তু দেহের বস্ত্র পাথরের নয়। জীর্ণ বস্ত্র পাথরের দেহ থেকে খসে পড়ছে!

পাথরের মূর্তিকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল শল্য…

অশনি!…দেখ — আ-আ-আ!

শল্যের আর্তনাদ শুনে চমকে উঠল অশনি – হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল শল্যের পায়ের দিকে…

শল্য! তোমার পা পাথর হয়ে গেছে!

28

[চলবে]

অপূর্ব চাকি সৌরীন শিকদার

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

ঢাকার সূত্রাপুর মহল্লায় ওদের বাড়ী, অপূর্বর আর সৌরীনের। অপূর্বর বয়স মাত্রই আঠারো, ম্যাট্রিক পাশ। ছেলে মোটামুটি ভালই ছিল লেখাপড়ায়, বাপ-মায়ের একান্ত ইচ্ছে ছিল–অপু কলেজে ভর্তি হোক। অপু তা হয় নি। অজুহাত যা দেখিয়েছিল, তা অযৌক্তিক নয়। "বি এ এম এ পাশ করে হয় কী বলতো? চাকরি মিলবে? লবডংকা। তার চেয়ে নাম সই করার বিদ্যে তো হয়েইছে, দোকানে ঢুকে পড়ি এখন থেকে, ব্যবসাটা শিখে নিই বাবা থাকতে থাকতে।" দোকান আছে ওদের মুদিখানার, চলে ভালই।

সৌরীন কিন্তু রীতিমত ধনীর সন্তান। বয়সও কিছু বেশী, এই বাইশ হলো বুঝি। থার্ড ইয়ারে নাম আছে জগন্নাথ কলেজে, ক্লাসে তাকে দেখা যায় খুব কদাচিৎ। বাবা নেই, বিষয় সম্পত্তির মালিক সে নিজেই। মা আছেন, তা তিনি পুত্রস্নেহে এমন অন্ধ, সৌরীনের কোনো অন্যায় তিনি চোখে দেখতে পান না। কলেজ কামাই দিয়ে ছেলে যদি বৈঠকখানা ঘরে আড্ডা জমায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে ভরদুপুর বেলা, তিনি মনে করেন যে সে ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র কর্তব্য হলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওদের চা যোগানো, এবং বিকেল চারটে নাগাদ ওদের যখন ক্ষিধে পাবে, তখন সেই ক্ষিধের আগুন নেবাবার মতো উপাদেয় কিছু ভূরিভোজের ব্যবস্থায় লেগে যাওয়া। কাজেই সৌরীন নিরংকুশ।

কলেজ-পলাতক সৌরীনের দ্বিপ্রাহরিক মজলিসে অপূর্ব চাকিকেও প্রায়ই হাজির দেখা যায়। ভরদুপুরে দোকানে কেনাবেচা থাকে না বললেই হয়, তাহলেও ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ী চলে যায় কম দোকানদারই। যে কয়েকজন ঝাঁপ বন্ধ করে, তাদের মধ্যে একজন হলো অপূর্ব। সে ঝাঁপ বন্ধ করে, তালা মারে গোটা চারেক, কিন্তু বাড়ী যায় না। বাড়ীর বদলে যায় সৌরীনের বৈঠকখানায়। বিকেল চারটে নাগাদ দোকানে ফিরলেই যথেষ্ট। খদ্দের যারা আসবে, চারটের আগে আসবে না কেউ। আর বাবা অবশ্যই আসবেন, তা সে সেই পাঁচটার পরে। ছেলে দোকানের দায়িত্ব আধাআধি মাথায় তুলে নেবার পর থেকে বাবা–সকাল বিকেল দুই বেলায় মাত্র পাঁচ ছয় ঘণ্টা থাকেন দোকানে, বাকী সময়টা অপূর্বই ইন্‌চার্জ।

সুবিধে হয়ে গিয়েছে অপূর্বর খুবই, বেলা একটা থেকে চারটে আনন্দে কাটে তার। আনন্দে এবং উদ্দীপনায়। কিন্তু কথা এই, মজলিসে কী এমন হয়, যাতে উদ্দীপনা বোধ করবে অপূর্ব?

না, তাস পাশা দাবা নয়। ভূতের গল্পও নয়, রবীন্দ্র কাব্যের গলা-কাঁপানো আবৃত্তিও নয়। ওখানে হয় রক্ত-গরম-করে তোলা রাজনৈতিক আলোচনা। ইংরেজ শাসনে ভারতের দুর্দশা ক্রমশঃ কোন্ স্তরে নেমে এসেছে, তারই বিশদ ব্যাখ্যা, এবং সে-দুর্দশা নিরাকরণের। জগৎসভায় ভারত আবার কেমন করে মর্যাদার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তারই উপায় উদ্ভাবনের জন্য নানাবিধ জল্পনা ও বিতর্ক। ইংরেজ সরকারের সম্পর্কে যেসব মন্তব্য এখানে উচ্চারিত হয় জোর গলায়, তা অনায়াসে সিডিশান আখ্যা পেতে পারে। "সিডিশান করছি"–এই সচেতনতাই হলো মজলিসের এই তরুণ সভ্যদের উদ্দীপনার কারণ।

সৌরীন কাজের লোক। বলা নেই কওয়া নেই, একদিন একটা আনকোরা নতুন পিস্তল বার করে ফেলল তাকিয়ার তলা থেকে। ভানুমতীর খেলওয়ালা যাদুকরেরা যেভাবে দর্শকদের মাথার চুল থেকে চকচকে টাকা বার করে। বিস্মিত বন্ধুবর্গকে আরও বিস্মিত করে দিয়ে সে আশ্বাস দিল, "এই শেষ নয়। আরও আনব। আমরা বারো জন আছি দলে, হাতিয়ারও চাই বারোটা। তারপর হবে কাজের শুরু।"

কী কাজ, তা ব্যাখ্যা সে করে নি কোনদিন, তার পার্শ্বচরেরা কেউ চায়ও নি ব্যাখ্যা। তবে আভাসে ইঙ্গিতে সবাই এটা টের পেয়েছে যে কাজটা হলো ইংরেজ তাড়ানো এবং ভারতবর্ষের মুক্তিবিধান সংক্রান্ত মারাত্মক কোনো কাজই, যার জের হিসাবে ফাঁসীর মঞ্চেও তাদের উঠতে হতে পারে একদিন।

ফাঁসী? তাই বল। ওর চেয়ে উদ্দীপনার জিনিস কী আছে আর? ক্ষুদিরাম ভগৎ সিং চাপেকারদের পদধূলিতে পবিত্র কাষ্ঠমঞ্চ! ঐতো আজ তরুণ ভারতীয়দের লক্ষ্যস্থল! আকাঙ্ক্ষার বস্তু। বিরাট আত্মদান যজ্ঞের আগুন জ্বলছে সারা ভারতে।

পিস্তলটা হাতে হাতে ঘুরল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর পরামর্শ শুরু হলো–পিস্তলের প্র্যাকটিস হবে কোথায়? কেউ বলে ভাওয়ালের জঙ্গল, কেউ বলে বুড়ীগঙ্গার চর। সে-আলোচনা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগেই সেদিন মজলিস ভাঙ্গতে হলো। কারণ দাসীরা খাবারের ট্রে নিয়ে এসে রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। অর্থাৎ বেলা চারটে।

চড়িভাতির নাম করে একদিন বুড়ী গঙ্গার চরেই চলল বারো বন্ধু শেষ পর্যন্ত। রাজসিক আয়োজন। চাকর বা রাঁধুনী নেওয়া চলবে না, কারণ তাতে গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়া অনিবার্য। রান্নাবান্না সব নিজেদেরই করতে হবে, খাওয়া দাওয়ার পরে তখন আসল কাজে ব্রতী হওয়া। নৌকা বোঝাই করে হাঁড়িকুড়ি চাল ডাল মাংস, এমন কি একটা ছোট তাম্বু নিয়ে আসা হয়েছে চরে। তাম্বুটা অবশ্য ভাড়াটে, যাদের তাম্বু, তাদেরই লোক এসে সেটা খাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার আগে তারাই আবার খুলে নিয়ে যাবে। নৌকার সঙ্গেও সেই বন্দোবস্ত, নামিয়ে দিয়ে গেল, আবার নিয়ে যাবে সন্ধ্যার আগে।

তাম্বু ভাড়া করা হয়েছে মস্ত এক ডেকরেটার দোকান থেকে। দোকানের ম্যানেজারটি খুবই অমায়িক লোক, বয়স বছর ত্রিশ হতে পারে বড়জোর। চড়িভাতির নাম শুনে খুব আনন্দ পেয়েছেন। আনন্দের আতিশয্যে

পিস্তলটা হাতে হাতে ঘুরল অনেকক্ষণ ধরে।

নিজেই চলে এসেছেন কুলিদের সঙ্গে, পছন্দমত জায়গায় তাম্বু খাটিয়ে দিয়ে যাবেন।

তাম্বু খাটাতে খাটাতে ছেলেদের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক, হীরালাল চক্রবর্তী নাম তাঁর, যে ওরা একঘন্টার মধ্যে অচেনা মানুষটাকে হীরাদা হীরাদা বলে ডাকতে শুরু করল। তারপর তাম্বু খাটিয়ে দিয়ে যখন তিনি কাঁচুমাচু মুখে বললেন–"তাহলে ভাই, আপনারা সব আনন্দ করুন। আমি বিদায় হই এখনকার মতো।" তখন নাটের গুরু সৌরীনই অগ্রপশ্চাৎ সব ভুলে তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল, "কেন? বিদায় হবেন কেন? চড়িভাতি ব্যাপার। আপনিও মিলে যান না আমাদের সঙ্গে! আমরা তো রান্নায় আনাড়ি সবাই।

মুখের কথা লুফে নিয়ে হীরালাল বলল–"তা যদি বলেন, দেমাক না করেও বলতে পারি, পোলাও মাংস আমি যা রাঁধব, তা দ্বাপরের দ্রৌপদীও রাঁধতে পারেন নি কোনোদিন। কিন্তু সে যেন হলো, আমি ভাই, ভাবছি অন্য কথা, আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে বিপদ হতে

পারে আপনাদের। আগে এটা ভেবে দেখি নি, এতগুলি নিষ্পাপ ছেলের সঙ্গে গায়েপড়া আলাপ জমানো ঠিক হয় নি আমার।"

সবাই দারুণ উৎসুক হয়ে উঠল– ব্যাপার কী? কী বিপদ হতে পারে তাদের, এ-ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশলে? আর বিপদ? বিপদের তোয়াক্কা কে করে? তারা কি জনে জনে ফাঁসী যাবার জন্যেই মনস্থির করে বসে নেই? বিপদের নাম শুনেই ওরা যেন আরও ক্ষেপে উঠল হীরালালকে ধরে রাখবার জন্যে। "থাকুন, থাকুন। বিপদ কী বলছেন? লাটসাহেবকে বোমা মেরেছিলেন নাকি? বা ট্রেন লুঠ করেছিলেন হার্ডিঞ্জ ব্রিজে?"

একটা হাসির অট্টরোল উঠল ছেলেদের মধ্যে।

সহমর্মী এই ছেলেগুলিকে যেন সে আর অবিশ্বাস করতে পারছে না। এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে সে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে বলল–"অমন বৃহৎ কাজ কিছু করতে পারি নি এখনো। কেবল দুই একটা পুলিশ-টুলিশ ঠেঙ্গিয়েছি কখনো সখনো, সেই ময়মনসিংহে থাকতে। তারই ফলে নাম উঠে গিয়েছে ওদের কালো খাতায়। এই যে ময়মনসিংহ ছেড়ে ঢাকায় এসেছি, পুলিশের অনুমতি নিয়ে তবে আসতে পেরেছি। এখন এখানে এসে রোজ সন্ধ্যায় একবার হাজিরা দিতে হয় সূত্রাপুর থানায়।"

দলের ভিতর গুরুপদ একটু বেশী দিলখোলা। সে হাসি-হাসি মুখে প্রশ্ন করল–"ঠেঙ্গিয়েছেন? না, গুলিগালাজ করেছেন? সত্যি বলুন!"

এর উত্তরে হীরাদা একটু মুচকি হেসে এভাবে ভ্রূ কোঁচকাল যে তাতে প্রশ্নকর্তা তার রুচি অনুযায়ী যে কোনো রকম উত্তর অনুমান করে নিতে পারে। কিন্তু সেই হাসিটাই, আর সেই ভ্রূকুঞ্চনটাই হঠাৎ যেন কীরকম বেখাপ্পা লাগল একজনের চোখে। সে হলো দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, আঠারো বছরের অপূর্ব চাকি। হোক না আঠারো বছর, দোকানদারের ছেলে তো! অন্য পাঁচজনের তুলনায় একটু বেশী সন্দিগ্ধ, একটু বেশী হুঁশিয়ার। সে দেখল যে অন্তরঙ্গতার যে ঢল নেমেছে আজ এই শুকনো চরের উপর, তাতে সব সতর্কতা বানের জলে কুটোর মতই ভেসে যাবে এক্ষুণি। সৌরীনের পকেটে যে পিস্তল আছে, তা এক্ষুণি বার করবে সৌরীন নিজেই, নবলব্ধ বন্ধুকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য।

হঠাৎ সে করে বসল এক কাজ।

যেন হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর সত্য সে আবিষ্কার করে বসেছে, এই ভাবে ভূতগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল অপূর্ব–"ও সৌরীদা–"

"এ্যাঁ? কী?"–শুধু সৌরীন নয়, আরও জনাপাঁচেক সমস্বরে প্রশ্ন করল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে চরের চারিধারে ভয়ে ভয়ে চোখ ঘোরাতে লাগল, সবাই ভাবছে, হঠাৎ কোনো পুলিশবোট দেখা দিয়েছে বাঁকের মুখে।

কিন্তু অপূর্ব বলছে–"তোমরা কেউ ঠাহর কর নি, আমরা যে তেরোজন হয়ে গেছি! জানো না সাহেবেরা কখনো একসাথে তেরোজন টেবিলে বসে না!"

হীরাদা ততক্ষণে ডেকচিতে মাংস কষছে প্রাণপণ শক্তিতে, সে তির্যক্‌নেত্রে একবার তাকিয়ে দেখল অপূর্বর পানে। ছোকরা অবশ্যই তাকে সন্দেহ করেছে। নতুবা হঠাৎ সাহেবী কুসংস্কারের দোহাই পাড়ত না। এ-দোহাই যে তাকেই তাড়াবার একটা নিকৃষ্ট জাতীয় কৌশল মাত্র, তাও কি হীরালালের মতো ঘুঘু ছেলের বুঝতে দেরি হয়? হীরালাল মাংস কষা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করল না, খুন্তি নাড়তে নাড়তেই বলল–"টেবিলে বসার তো দেরি আছে। রান্নাটা করে দিই, আমার ভাগের খাবার আমি গামছায় বেঁধে নিয়ে চলে যাব আগেভাগে। দোকান খালি রেখে আর কতক্ষণ থাকতে পারি বল?"

"না, না, তা কী হয়, তা কী হয়"–প্রতিবাদ উঠল দলের ভিতর থেকে। অন্ততঃ পাঁচ ছয়টা কণ্ঠে। কিন্তু সৌরীন নীরব। অপূর্বর ইঙ্গিত সে বুঝেছে।

সত্য সত্যই হীরালাল আর বেশীক্ষণ রইল না তারপর। মাংসটা নামিয়েই সে গাঙ্গের বুক থেকে একখানা জেলেডিঙ্গিকে ডাকল–"পার করে দাও ভাই। বড়্ডো তাড়া। আমাদের নাও আসতে দেরি হবে।"

বেলা সবে দু'টো।"এত তাড়া কিসের?"–বলে সবাই।

কিন্তু হীরালাল দাঁড়ায় না আর। একটা বাটিতে করে গরম গরম মাংস শুধুই সে খেয়ে নিল এক পেট, তার পর পোলাও কী করে রাঁধতে হবে, মুখে তার উপদেশ দিয়ে, জেলে ডিঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল। জেলেদের ঐ একটা মহৎ গুণ, নিজেদের যত অসুবিধাই হোক, কেউ পার করে দেবার অনুরোধ করলে সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে না।

হীরালাল মাংসের ঢেকুর তুলতে তুলতে সোজা গিয়ে হাজির হলো সূত্রাপুর থানায়।

আর তার পরদিনই প্রথমে সৌরীন শিকদার, তারপরে অপূর্ব প্রভৃতি অন্যান্য ছেলেদের ডাক পড়ল থানায়। "তোমরা কাল নদীর চরে কী করতে গিয়েছিলে?"

এ প্রশ্নের জবাব তো পড়েই আছে! "চড়িভাতি করতে গিয়েছিলাম, করেওছি চড়িভাতি, খেয়েদেয়ে সন্ধ্যার আগে যে যার বাড়ী ফিরেছি।"

"তা বেশ করেছ। কিন্তু এখন থেকে তোমরা বারোজন হপ্তায় দুইদিন দেখা দিয়ে যাবে থানায়।" হুকুম হলো গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর সহদেব সান্ডেলের। যে ভাবে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে হাজিরার দিন ফেলা হলো ওদের, তাতে কোনোদিন কোনো সময়ে দুই জনের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রইল না থানায়।

"এই সেই তেরোর ধাক্কা"–বলল অপূর্ব –"ঐ হীরাদাটি স্পাই বোধহয়।"

অসম্ভব কী? লোকটার বেশীদিন হয় নি ঢাকায়, কে জানে ওর পূর্ব ইতিহাস কী ছিল?

একদিন কিন্তু হাতেনাতে প্রমাণ জুটে গেল যে ও স্পাই। গুরুপদ হাজিরা দিতে গিয়ে দেখে–ইনস্পেক্টর সান্ডেল নিজের ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে, সম্মুখে হীরালালকে নিয়ে। হীরালালের মুখে একটা চুরুট, সান্ডেলের মুখে আর একটা। সান্ডেল নিজে দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে হীরালালের চুরুটে।

সান্ডেলের দরোজা সর্বদাই বন্ধ থাকে। হীরালালের ভাগ্যদোষে সেদিন কেমন করে যেন সেটা খুলে গিয়েছিল। গুরুপদ ব্যাপার দেখেই পিছন ফিরে সরে এল সেখান থেকে। সে যে ইনস্পেক্টর-স্পাই-ঘটিত ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে, এটা ওরা বুঝতে পারলে অনর্থ হবে।

যথারীতি হাজিরা দেবার পরে গুরুপদ সৌরীনের বাড়ীতে গেল। এবং কয়েকজনে মিলে একটা পরামর্শ হয়ে গেল সেইখানেই। এ-পাপ আর বাড়তে দেওয়া নয়। রোজ যে নতুন নতুন ছেলেকে সন্দেহভাজন বলে থানার তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে, তার মূলে আছে ঐ পাষণ্ড হীরালাল চক্রবর্তী।

পরদিন কোম্পানীর বাগিচার মোড়ে ওৎ পেতে রইল সৌরীন, অপূর্ব, আরও জনা চারেক। ওরই পাশ দিয়ে হীরালাল থানায় যায়-আসে। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে সে যখন ফিরে যাচ্ছে দোকানে, চার পাঁচজনে মিলে তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ বেঁধে ফেলল, আর বাগিচার ভিতর টেনে নিয়ে ছোরার উপর ছোরা মেরে তাকে শেষ করে ফেলল।

ধরা অবশ্য পড়ল ওরা। বিচারে সৌরীন আর অপূর্বর হলো প্রাণদণ্ডের আদেশ, অন্য সকলের দুই চার বছর করে জেল। হাইকোর্ট কিন্তু ১৯৩৫-এর ১২ই ডিসেম্বর তারিখে প্রাণদণ্ডের আদেশ বাতিল করে দিয়ে নতুন আদেশ দিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের। এ দয়ার হেতু দেখালেন এই যে ওরা দুজনই একান্ত ছেলেমানুষ।

শুকতারার বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ

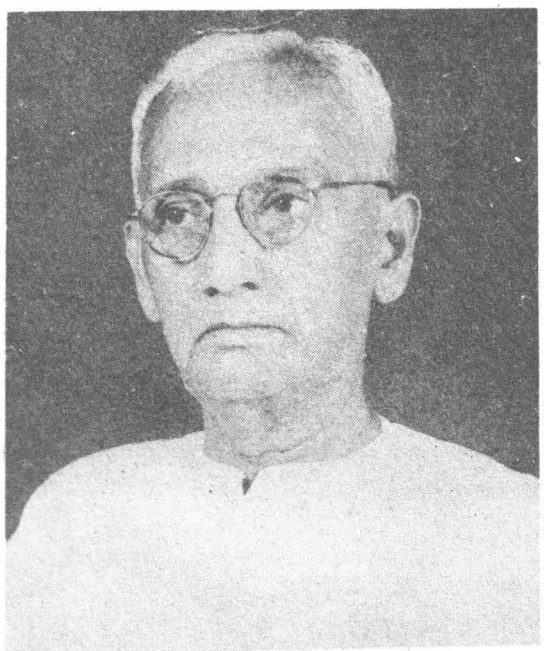

ছোটদের প্রিয় বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ রাহা আর নেই। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ৯০ বছর বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন। শুকতারাকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন শুকতারার পাঠক পাঠিকাদের। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জড়িয়েছিলেন এই পত্রিকাটির সঙ্গে। শুধু তাই নয় তিনি নিজের হাতে তাঁর অনেক অপ্রকাশিত লেখা দিয়ে গেছেন শুকতারার জন্যে। তাঁর সেই সব লেখা শুকতারায় পরে তোমরা পড়বে।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা আগে ছিলেন নাট্যকার। অনেক নাটক লিখেছেন তিনি। কলকাতার বিভিন্ন নাট্যালয়ে সেই সব নাটকের অভিনয় হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে তিনি শুধুমাত্র ছোটদের জন্যে লিখতে শুরু করেন। বিশ্ব সাহিত্যের মণিমুক্তার সঙ্গে বাংলার ছেলে-মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তিনি ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত অনুবাদের কাজ করে গেছেন। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা দুশ। মৃত্যুর ক'য়েক মাস আগে তিনি 'কালিদাস রায় স্মৃতি পুরস্কার' পান।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ আর পটলা

শক্তিপদ রাজগুরু

পটলা ইদানিং প্রচুর শিকারের বই পড়ছে। জিম করবেট-এর শিকারের সব বইগুলো কিনেছে, কিনেছে আরও অনেক বই। আর জীবজন্তুর আচার-ব্যবহার এসব জানার জন্য বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ ই. পি. গীর লেখা বইও হাজির করেছে।

পটলার মাথায় বেশ কিছু বিচিত্র ধরনের পোকা আছে, এক একটা পোকা এক একবার নড়ে ওঠে আর পটলাও তখন সেই বিষয় নিয়ে পড়ে। ঘাড়ে ভূত চাপার মতো সেই বাতিকটা তখন চেপে বসে।

সেবার কবিতা লেখা নিয়ে যা করলো সে এক কান্ড, দেশভ্রমণ করতে গিয়ে এইসা পাল্লায় পড়লো তা আর বলার কথা নয়, ফুটবল খেলোয়াড় হতে গিয়ে হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে পুরো একমাস পড়ে রইল, সেবার পোলট্রিপালক হতে গিয়ে বাড়িতে অগ্নিকান্ডই বাধিয়েছিল। ওর নানা কান্ড।

এবার পড়েছে প্রাণী-ট্রাণীদের নিয়ে।

অবশ্য এর আগেই ঘটনাটা ঘটেছিল। ওর জন্মদিনে পটলার ছোটকাকা ওকে একটা এয়ারগান কিনে দিয়েছিল, দেখতে একেবারে রাইফেলের মতোই। পঞ্চপান্ডব ক্লাবের আমরা সেদিন সকলেই খুশি হয়েছিলাম। পটলা আমাদের কামধেনু, ওকে দোহন করেই ক্লাব বেঁচে আছে। সুতরাং পটলার হাতে এ হেন অস্ত্র আসাতে আমরাও খুশি হয়েছি।

ভোরে দু'একদিন কুলেপাড়ার ওদিকে সুভাষ লেকের ঘন গাছগাছালির মধ্যে গিয়ে ঘুঘু, একটা বোকা কাক আর গোটা কয়েক নিরীহ কাঠবেড়ালীকে পটলার অব্যর্থ লক্ষ্যে ধরাশায়ী হতে দেখে আমরাও সচকিত হই। হোঁৎকা বলে, নাহ ! পটলা তুই এ্যাকখান জন্তুর শিকারী হইছস্। হালায় কলকাতায় দেহি পাতিকাক আর নেড়ি কুত্তা ছাড়া শিকারের কিছু বস্তু নাই। চল সুন্দরবনে, এ্যাকখান রয়েল ব্যাংগল টাইগার-ফাইগার মাইরা আনি তরে লই।

আমি বলি, ওসব খুব বিপদের জায়গা রে। জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ। তার চেয়ে মেদিনীপুর, পুরুলিয়ার জংগলেই চল, বাঘ না হোক হরিণ-টরিণ , বুনো মুর্গী মারতে পারলে ফিস্ট জোর হবে।

হোঁৎকা ঈষৎ ভোজনবিলাসী, আর খিদেটাও ঘনঘন পায়। সাত সকালেই পোয়াটেক কল বেরুনো ছোলা ভোজের ব্যবস্থা থাকে ওর জন্য ক্লাবে, সেটাকে পুরো আজ শেষ করেছে, তবু হরিণের মাংসের কথা শুনে হোঁৎকা ওর মত বদলে বলে, তা মন্দ কোস্ নি ?

ফটিকও বলে, গ্রান্ড হয় কিন্তু।

পটলা বলে, কিন্তু যাবার ব্যবস্থা তো করতে হবে।

সেই কথাই ভাবছি। পটলাও রোজ ভোরে বের হয় লেকের দিকে। বিরাট এলাকা জুড়ে গাছগাছালির জটলা, লোকজনও বিশেষ থাকে না এসময়। পাখিদের কলরব ওঠে। আমরা পাঁচ মূর্তি তখন এদিক ওদিকে ঘুরি পাখির সন্ধানে। অবশ্য পাখিগুলোও চতুর হয়ে উঠেছে। ওরাও ল্যাজ দেখিয়ে ফুরুৎ করে উড়ে যায়। দু'একটা ফিঙে তো সেদিন মাথায় ঠোকর মেরেই চলে গেল। পটলার এয়ারগানের গুলির থেকে আমাদের হাতের ঢিলের ক্ষমতাই বেশি। তাই পাখিরা সতর্ক হয় আমাদের দেখলে।

সেদিন ভোরে গেছি লেকের বাগানে। ফিকে কুয়াশা জমে আছে। শীতকাল ! ঘাসে শিশির জমেছে। হঠাৎ ওই গাছের জটলার দিক থেকে কার আর্ত চিৎকার শুনে চাইলাম। নীরব পরিবেশে চিৎকার ওঠে, হেল্প ! হেল্প ! বাঁচাও–

লেকের নির্জনে দু'একটা খুনখারাপি, ছিনতাই এ সবও হয়েছে। কে জানে সে সব কিছু ঘটছে কিনা। আমরাও এ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ পেয়ে দেখছি কোথায় ঘটছে ব্যাপারটা। পটলাও এবার এয়ারগানে ছররা পুরে এ্যাকসনের জন্য তৈরি হয়েছে।

দেখা যায় ওদিকে একটা বিরাট সাইজের মোষ একটা গাছের নিচে শিং বাগিয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে, গাছের ডালে একটা লাল মতো বিরাট বর্তুলাকার পিপে কোনো মতে ঝুলছে, নড়ছে ডালটা। আর মোষটা সেই বস্তুটির দিকে শিং উঁচিয়ে গর্জাচ্ছে।

মাঠে এমন মোষ গরু ভোরের দিকে এসে পড়ে ঘাসের লোভে, কিন্তু ওই ব্যাটা যমরাজের বাহনের বোধহয় সাতসকালে টুকটুকে লাল রং দেখে মেজাজ চড়ে গেছে।

–হেল্প !

সেই সংগে ইংরাজী ব্যান্ডও বেজে চলেছে সজোরে, আর কোরাস গানের সুর ওঠে–উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল–

কান্ডটা বিচিত্র।

ওই মোষটা আর কিছু পায়নি, তার লাল জামাপরা প্রতিপক্ষের কাঁধের ট্রানজিস্টারের ফিতেটাই শিংএ জড়িয়ে গেছে, ফলে দুই শিংএর মাঝে থেকে বেল্টবাঁধা ট্রানজিস্টার এসে পড়েছে তার গলায়, আর আকাশবাণী থেকে কান ফাটানো বাদ্যি সমেত ওই গান বাজছে পুরোদমে। মোষটা এমন বিচিত্র রসিকতায় ক্ষেপে উঠেছে।

হোঁৎকা বলে, আরে কেতোবাবু যে ঝুলতেছে রে ! হালায় মোষটারে তাড়া–

বিশাল দেহটা ঝুলছে ডালে, সরু পলকা আকাশমণি গাছের ডাল এবার মড়মড় করছে, আর মোষটাও অনড়, ওই বিকট গানের গুঁতোয় সে পাগল হয়ে গেছে। শোধ নেবেই।

এদিকে আমাদের সমবেত চিৎকার, ঢিল পাটকেল-এর গুঁতো, পটলার এয়ারগানের ছররায় বিরক্ত হয়ে মোষটা চার পা তুলে একটা লাফ দিয়ে গাঁক্ করে আওয়াজ ছেড়ে সামনের

লেকের জলেই হড়বড় করে নেমে গেল। এতক্ষণ আকাশবাণীর বাণী শোনা যাচ্ছিল, জলের নিচে বোধহয় তার বাণী পৌঁছয় না, তাই ট্রানজিস্টার নীরব হয়ে গেল। আমরা ছুটে যাই ঝুলন্ত কেতোবাবুকে নামাতে, কিন্তু নামাতে হয় না। ওর ভারি দেহের ভারটা ওই পলকা ডাল এতক্ষণ সহ্য করেছিল, এবার মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়ে ওকে নিয়ে। আর পড়বি তো পড় একেবারে পটলার ঘাড়েই।

ওই আড়াইমণি দেহের চাপে পটলা শিশিরভেজা ঘাসের ওপর ছরকুটে পড়েছে, ছিটকে গেছে বন্দুক, পটলাকে কেতোবাবুর বিশাল লাল টুকটুকে অলেস্টর হনুমান টুপি পরা দেহের নিচে দেখাই যায় না, শুধু দুটো হাত আর দুটো পা বের করে তিড়িং বিড়িং করছে সে, আর একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায় মাত্র, যেন রোড রোলারের নিচে একটা ছাগল চাপা পড়েছে।

কোনোরকমে ডালসমেত কেতোবাবুকে পিপের মতো গড়িয়ে আমরা পটলাকে বের করেছি। পটলা হাঁপাচ্ছে–যেন মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেছে পরোপকার করতে গিয়ে।

কেতোবাবু এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন–সরি বয়েজ। তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে, এখুনি পটলারে কিল করছিলেন–

কেতোবাবু বলে, সরি, ভেরি সরি বয়েজ। আমার বাড়ি চল–একটু চা টা খেয়ে যাবে। খুব সেভ করেছো আমায়,কিন্তু ট্রানজিস্টারটা গেল হে, খাস ফরেন থেকে আনা।

হোঁৎকাও বলে, তা গেছে গিয়া ধরেন।

মোষটাকে দেখা যায় তখন মাঝ লেকে ভাসছে। ট্রানজিস্টার বোধহয় জলের তলে গেছে।

কেতোবাবুকে দূর থেকেই দেখেছি। প্রায় দেখতাম ভোরে লেকের মাঠে আসে, কোনোদিন কাঁধে দূরবীন, ক্যামেরা নিয়ে গাছের ডালে পাখি, লেকের জলে বালিহাঁস, পানকৌড়ি দেখে, ছবি তোলে, কখনও আগাপাশতলা ওভারকোটে ঢেকে মাথায় হনুমান টুপি পরে হন্‌হন্ করে চক্কর দেয় লেকের মাঠে।

বিরাট নাকি বড়লোক, ছেলেরা সব বিলেতে। কেতোবাবু এখানেই থাকে। বিশাল দেহ, তেমনি উদরের পরিধি, ডাক্তার নাকি ভোরে তিন মাইল করে হাঁটতে বলেছে। সেই করতে গিয়ে আজ এই কান্ড বেধেছে।

লেকের ওদিকে সদ্য গড়ে উঠেছে নতুন কিছু বাড়িঘর, পাড়াটা বেশ নিরিবিলি। সেইখানে বেশ সাজানো বাগান ঘেরা বিরাট বাড়িটাই কৃতান্তবাবুর। গেটে মার্বেল পাথরের ফলকও রয়েছে। ক্যাপটেন কৃতান্তকিরণ কর্মকার। নামের শেষে ইংরাজী ক্যাপিটাল লেটারে কি সব লেজুড়ও রয়েছে। কোনো মিলিটারির ক্যাপটেন ছিল টিল বোধহয়।

গ্যারেজে একখানা গাড়ি, ওদিকে ডালিয়ার রংবাহার দেখা যায়। ওপাশে খাঁচায় রং-বেরং-এর পাখি, দুটো বাঁদর, আরও কিসব রয়েছে।

–কাম অন্ বয়েজ, সিট ডাউন! পরিচয়টা হয়ে যাক। দেখি রোজ ভোরে তোমরাও মর্নিং ওয়াক করতে আসো, টার্গেট প্র্যাকটিশ করো। ভেরি গুড। আজকালকার ইয়ংম্যানদের এসব ব্যাপার দেখি না হে। আমাদের সময়–শরীরচর্চা ছিল কমপালসারি। তাই তো মিলিটারিতে গেছলাম, পরে শিকারও করেছি–

দেখলাম দেওয়ালে টাঙানো বাঘের মুখ, বাইসনের শিং সমেত মাথা, হরিণের শিং, চিতাবাঘের চামড়াও রয়েছে।

পটলা উৎসুক কণ্ঠে শুধোয় তার গায়ের ব্যথা ভুলে–এসব আপনি শিকার করেছেন স্যার?

কৃতান্তবাবু একগাল হেসে বলে, অব কোর্স! ওটা মেরেছি উড়িষ্যার ফরেস্টে, এই বাঘটা মেরেছি তরাই-এর ফরেস্টে, এই বাইসনটা দেখেছো? তখন ব্যাঙ্গালোরের ক্যানটনমেন্টে। ওখানের ফরেস্টে মেরেছি,দ্যাট চিতা মেরেছি এ্যাট রুদ্রপ্রয়াগ।

পটলা বলে–জিম করবেট সাহেবও রুদ্রপ্রয়াগে চিতা মেরেছিলেন।

হেসে ওঠে ক্যাপটেন কৃতান্ত। বলে–আরে জিম-এর কথা বলছো? ও তো আমার সঙ্গে মিলিটারিতে ছিল। কত রাতে ওকে নিয়ে গেছি শিকার করতে। হ্যাঁ, ছোকরা খুবই সাহসী ছিল।

পটলা এবার একেবারে বডি থ্রো করে। বলে সে, আমাকেও শিকার শেখাবেন স্যার!

কথাটা যেন হেসেই উড়িয়ে দেয় ক্যাপটেন কৃতান্ত। বলে সে, শিকার করতে গেলে আগে পড়াশোনা করতে হবে। এনিম্যাল লাইফ, তাদের বিহেভিয়ার, তাদের হ্যাবিটস্, ঠিক আছে, তুমি এসো মাঝে মাঝে। নাও, চা খাও।

চা-এর সঙ্গে এসেছে গরম কাটলেটও। হোঁৎকা বেশ রসিয়ে কাটলেটটা খেয়ে বলে, খাসা হইছে স্যার!

চা-পর্ব সারার পর উঠবো, কৃতান্তবাবু বলে, আমার প্রিয় জিনিসটাই দেয়নি দেখছি। আবদুল–

বেয়ারা আসতে কৃতান্ত বলে, এদের চকোলেট দিস নি? আন–

চকোলেটও এসেছে একস্লেট ভর্তি, কৃতান্তবাবু কয়েকটা চকোলেট মুখে পুরে বলে–আই লাইক ইট ভেরি মাচ। নাও।

চকোলেট হাতিয়ে বের হলাম!

হোঁৎকা বলে বাইরে এসে, শেষখান মন্দ লাগলো না রে। কাটলেট, চকোলেট, চা মন্দ হয়নি। বোঝছস্ পটলা, আসবি এহানে, তর লগে লগে আমরাও আইবো।

কিন্তু তারপর থেকেই ওই ব্যাপার ঘটেছে। পটলা এখন প্রাণীজগৎ নিয়ে হামলে পড়েছে। আমরাও প্রাণীজগতের অন্যতম সৃষ্টি তা যেন ও মানতেই চায় না। এদিকে ওর বিহনে পঞ্চপান্ডব ক্লাবে মাছি উড়তে শুরু করেছে।

পটলা মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো এসে পড়ে জ্ঞান দেয়–বুঝলি মাংসাশী আর নিরামিষভোজী প্রাণীদের স্বভাব

একেবারে ডিফারেন্ট, এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে আর মাংসাশী প্রাণীরা–

এতক্ষণ চুপ করে ছিল হোঁৎকা। শীতের হাওয়া ফুরিয়ে আসছে। অন্যবার ক্লাব থেকে শীতকালীন ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়, এবার পটলা এসব নিয়ে ভাবেনি। ভাববার সময়ও তার নেই। তাই আমাদের বেড়ানোও হয়নি, কুলেপাড়া ক্লাব সেদিন ব্যান্ড পার্টি তাসা পার্টি নিয়ে দীঘায় পিকনিক করে এল।

তবুও চুপ করে ছিল হোঁৎকা। এবার সে গর্জে ওঠে, থামবি পটলা? আর জ্বান দিস না। খুব দেহি জ্বানদা হইছস্। তর ওই কেতোবাবুর ওহানেই যা গিয়া, পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব থনে আজই রেজিকনেশন দিমু!

হোঁৎকা কথাটা প্রায়ই বলে। ক্লাবের ও অলিখিত সেক্রেটারি, রেজিগনেশন লেটার যেন হরবখত পকেটে নিয়েই ঘুরছে। তবে এবার আমরাও তৈরি। বলি, আমিও চলে যাবো।

ফটিকও শোনায়–আম্মো গীতিমালিকা ক্লাবের মেম্বার হবো–

পটলার এবার টনক নড়ে। বলে সে, কী ব্যাপার বল তো, একটা সুন্দর ট্যুর-এর ব্যবস্থা করছি আর এই ভর্তি গাজনে তোরা ঢ-ঢোল ফাঁসাবি!

অবাক হই কথাটা শুনে, এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। শুধোই, ট্যুর! ট্যুর কোথায় রে?

হোঁৎকা একটু দেরিতে বোঝে ব্যাপারটা। ওই ইংরাজি কথাটা তার পুঁজিতে নেই। তাই শুধোয় সে, ট্যুর! সেডা আবার কি?

আমি জানাই–ভ্রমণ করা আর কি?

পটলা বলে, বেশ ভালোই হবে ভ্রমণটা, পুরুলিয়া শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে অযোধ্যা পাহাড়ের উপর একটা বাংলো ঠিক করেছি। কাকীমার দাদা ওখানের বনবিভাগের কর্তা। গভীর বন চারিদিকে। হরিণ, হাতি, ভালুক, বাঘও আছে। ময়ূর, রকমারি পাখিও আছে প্রচুর। দিনকতক বনে গিয়ে কাছ থেকে ওদের দেখা যাবে। সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি, আর ত-তোরা বলছিস ক্লাব ত-তুলে দিবি!

এমন একটা বেড়ানোর কথায় এবার হোঁৎকার কঠিন মনও ভিজেছে। বলে সে, ঠিক আছে। গোবরা–কালী কেবিন থনে টোস্ট মামলেট লই আয়, কথাটা ভাইবা দেখি।

পরিকল্পনা ভালোই বোধহয়। পটলার টোস্ট অমলেট খেয়ে হোঁৎকা এবারের মতো রেজিগনেশন তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বেড়ানোর প্রোগ্রাম করছে।

পটলা বলে, ক্যাপটেনও যাবে আমাদের সঙ্গে!

হোঁৎকা একটু চাইল। ফটিক বলে, ওই ভালুকটাকে সঙ্গে নিবি?

পটলা বলে–খুব বিদ্বান লোক রে। সঙ্গে থাকলে প্রাণী

শিকার করতে গেলে আগে পড়াশোনা করতে হবে।

ট্রাণীদের ক্যারেকটার বোঝা যাবে। আর মস্ত শিকারী। ওসব বনে জঙ্গলে বাঘ-ভালুক, হাতিও আছে।

হোঁৎকা বলে–তয় ওই হাতিডারে লই যাবি?

পটলা শোনায়–খুব ভালো লোক রে! তাহলে ওই কথাই রইল, ত-তোরা ফর্দমত জিনিসপত্র কিনে নে। কাল সন্ধ্যার ট্রেনে যেতে হবে। আমি ক্যাপটেনকে বলে আসি। টাকাটা রাখ।

পটলা শ'খানেক টাকা দিয়ে গেল। হোঁৎকা অবশ্য এর থেকেও কিছু বাঁচাবে ক্লাব-ফাণ্ডের জন্য।

আমরা যাবার কথা ভাবছি। হোঁৎকা বলে, পটলা গুড বয় রে। তয় ওর ঘাড়ে ওই ক্যাপটেন এহন চাপছে, ওডারে নামাতি

হইব। আর পটলাও একখান্ হইছে, মানুষের ক্যারেকটার এহন বুঝা দায়, কয় কিনা এ্যানিম্যাল ক্যারাকটার বুঝবো। চিন্তার কারণ হইছে।

ক্যাপটেন কর্মকার ট্রেনে উঠে বলে, একি ট্রেন হে? বাজে লোকের ভিড়। আমি বাপু ফার্স্ট ক্লাশ ছাড়া যেতে অভ্যস্ত নই!

থ্রি টায়ার ব্যর্থ। লোকজনের ভিড়ও রয়েছে। নামে নামে ব্যর্থ, কিন্তু কিছু লোক এর মধ্যে কনডাকটার গার্ডকে ধরে করে এদিক ওদিকের ফাঁকা জায়গায়, পথে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদিকের ব্যাংক কয়েকজন মোটকা মাড়োয়ারী পরিবার বেশ জম্পেশ হয়ে বসে ইয়া গাবদা টিফিন কেরিয়ার খুলে জুতোর শুকতলার মতো আলুপরঠা, ভাজি আর আচার বের করে গিলছে।

ক্যাপটেন কর্মকার নিচের বাংকে তখন মৈনাক পাহাড়ের মতো পড়েছে র‍্যাগ মুড়ি দিয়ে আর পাইপ থেকে চিমনির মত ভস্‌ভস্ করে ধোঁয়া ছাড়ছে আর গজগজ করে–হরিবল জার্নি!

হোঁৎকা দেখছে ওই আলুপরঠা, কোম্পানিকে। ওরা তখন খাওয়া শেষ করে এবার বাজারের ভাউ নিয়ে পড়েছে। হোঁৎকার খিদেও লেগেছে, সন্ধ্যার মুখে বাড়ি থেকে খেয়ে বের হয়েছিল, এখন তা হজম হয়ে গেছে।

গাড়ি চলছে, রাত ঘনিয়ে আসে। হোঁৎকা রয়েছে উপরের বাংকে। ওর কাছেই একটা ব্যাগে রয়েছে কালকের সকালের খাওয়ার জন্য পাউরুটি, কলা, সন্দেশের বাক্স। হোঁৎকার খিদে (সেটা ওর ঘনঘনই পায়) পেলে আর জ্ঞান থাকে না, ওর অজান্তেই হাতটা ব্যাগে চলে গেছে, পাউরুটি কলা দু একটা করে বের করে চলেছে আর চালান করছে মুখে।

রাতের গাড়ি। লোকজন শ্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ খেয়াল হয় হোঁৎকার, পাউরুটি আর নেই, কলাও সাফ। তবে সকালে নেমে ওরা তার মাথাই চিবোবে। হঠাৎ নজরে পড়ে বাংকের ওদিকে রাখা সেই আলুপরঠা পার্টির গাবদা টিফিন বাক্সটা, নীচের বাংকে ওরা সবাই র‍্যাগ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে, হোঁৎকা নিজের পিঠ বাঁচাবার জন্য এবার পথ দেখছে।

পটলা, আমি, ফটিক, গোবরা এদিকের সারবন্দী তাকে শুয়েছি, কিন্তু আমার ঘুম আসে না। সারা কামরায় যেন ব্যান্ড, ব্যাগপাইপ, জগঝম্প, কাড়া-নাকাড়ার ঐকতান চলেছে। এ গর্জায়, ওর নাক থেকে জবাব আসে তৎক্ষণাৎ।

ক্যাপটেন কর্মকার তো নন–ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ! এ নিদ্রা যেন কস্মিনকালেও ভাঙবে না, আর তেমনি জোরালো নাকের

কে বলে, শেষ করে দাও বদমাশকে।

বাদ্য, কখনও ব্যান্ড, কখনও ব্যাগপাইপের মতো করুণ সুর ওঠে, মাঝে মাঝে নাকের ফুটো যেন রুদ্ধ হয়ে জগঝম্পের মতো বিকট শব্দ ওঠে।

রাতভোর হোঁৎকা জেগেছিল। বলে সে, জ্বালাই মারছে তগোর বীরপুরুষ!

পটলা চুপ করে থাকে। কাকে কী বলবে? নাকের তো কান নেই যে শুনতে পাবে। সুতরাং বিনা বাধায় নাকের বাদ্যি সমানে চলছে।

ভোর হয়ে আসে, ট্রেনটা ঢুকছে বাঁকুড়া স্টেশনে। ওদিকের বাঙ্ক-এর সেই আলুপরঠা পার্টি এখানেই নামবে, ওরা হৈ চৈ করছে, মাঝের বাঙ্কে শুয়েছে সেই পরিবারের মোটকা বয়স্কা মহিলা। শোবার সময় কোনোরকমে শুয়েছিল, ওঠার সময় পাশ ফিরতে গিয়ে মুড়ির বিশাল বস্তার মতো দেহটা সরু বাঙ্কের মধ্যে আটকে গেছে। ওঠার উপায় তো নেই, নড়াচড়া করার পথও বন্ধ, কাৎ হয়ে কাতরাচ্ছে–উতার দো উতার দো, ফাঁস গিয়া।

এদিকে ট্রেন ছেড়ে দেবে, ওকে সাঁটিয়ে রেখেই পার্টিকে নেমে যেতে হয়। কিন্তু তা হয় না। গিন্নিকে ফেলে শেঠজীও যাবে না। টানছে কিন্তু দেহ অনড়। টাইট হয়ে গেছে বাঙ্কের সঙ্গে।

শেষ অবধি হোঁৎকা আমিও ওদের ব্যাকুল আর্তনাদে গিয়ে হাত লাগিয়েছি, টেনেটুনে কম্বল জড়ানো বিশাল বপুকে নামিয়ে ওদের সাতাশটা পুঁটলি, দু তিনটে বাক্স, ছটা বিছানা, দুটো জলের কুঁজো, এক পেটি সুতো, তিন পেটি শাল কুলো প্রায় আটচল্লিশটা লগেজ, আর সেই সাড়ে তিন মণি চলন্ত লগেজ শেঠিয়ানকে ভলেনটিয়ারি করে প্ল্যাটফর্মে নামাবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমরা গলদঘর্ম হয়ে এই শীতের রাতে গাড়িতে ফিরে এলাম, তখনও ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙেনি। নাকের বাদ্যি তখনও বেজে চলেছে।

ভোর হচ্ছে, ট্রেনটা চলেছে পুরুলিয়ার দিকে।

আমাদের নামতে হবে। বলি, পটলা, তোর ক্যাপটেনকে ডাক, নাহলে ধড়মড় করে উঠতে গেলে ওই শেঠানীর মতো আবার আটকে না যায়।

হোঁৎকা বলে–ও ঘুমাতি ঘুমাতি চক্রধরপুর চলি যাউক। ওরে ডাকিস না। আমরাই নাইমা পড়ি।

পটলা বলে ওঠে–স্-স কি রে! তারপরই সে ডাকতে থাকে কাতর স্বরে–স্-স্-স্যার! ওঠেন–স-স্–

হঠাৎ দেখি পটলা আর এদিকে নেই, স্যার বিকট একটা আওয়াজ করে পাশ ফিরছে আর কলাগাছের মতো ঠ্যাং-এর ঈষৎ আঘাতে রোগাপটকা পটলচন্দ্র ছিটকে গিয়ে ওপাশের ব্যাঙ্কে নিদ্রারত এক যাত্রীর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। তারপরই কাণ্ডটা বেধে যায়।

–ডাকাত, ডাকাত–লুট লিয়া! মার ডালা–লোকটা কম্বল দিয়ে পটলাকে টিপে ধরে দুমদাম পিটছে আর চিৎকার করছে।

নিমেষের মধ্যে সারা কামরার লোকের ঘুম ভেঙে যায়। ট্রেনে ডাকাতি এখন নিত্যকার ঘটনা, আর সেই ডাকাতদের একজনকে পেড়ে ফেলেছে, সুতরাং উৎসাহী মারদেনেবালাদেরও অভাব হয় না।

কে বলে–শেষ করে দাও বদমাশকে।

অন্যজন ঘুষিও ঝেড়েছে, তার মধ্যে আমরা গিয়ে পড়ে ওদের কোনোরকমে থামিয়ে কম্বলের চাপা থেকে পটলাকে উদ্ধার করে। ততক্ষণে পটলার বাঁ দিকের রগে একটা আব জমে গেছে, নাকটা ফাটতে ফাটতে রয়ে গেছে, হাঁপাচ্ছে পটলা।

হোঁৎকা বলে, ওই স্যারের জন্যি হেদিন লেকে চাপা পড়ি মরতিস, আজ আবার ঠ্যাঙানি খাইছস। ওই স্যারের জন্যি তুই শ্যাষ হই যাবি কইলাম!

পটলা জবাব দিল না। অস্ফুটস্বরে আওয়াজ দেয়, জল!

ওকে জলটল খাইয়ে সুস্থ করছি, এমন সময় ফাটা হাঁড়ির মধ্যে থেকে আওয়াজ ওঠে, হোয়াট হ্যাপেনড্? কী হয়েছে?

ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙেছে।

পটলা মিনমিন করে, নাথিং স্যার।

ক্যাপটেন হুংকার ছাড়ে, বেড-টি, চা কই?

হোঁৎকা বলে, ট্রেন থামলি দেখা যাইব। এহন ওঠেন–নামতি হইব।

–দ্যাট আই নো মাই বয়! অল ইন্ডিয়া আমি মিলিটারির দল নিয়ে ঘুরেছি, বাইরেও বার্মা ফ্রন্টে সেবার ফিল্ড মার্শাল মন্টি–তোমাদের মন্টগোমারি–

ওর বড় বড় কথা শুরু হয়েছে। জানাই, ট্রেন স্টেশনে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। নেমে গিয়ে ওসব শুনবো। উঠুন।

মুখ ব্যাজার করে প্ল্যাটফর্মে নেমেছে সাহেব। মালপত্র আমরাই নামালাম। ওর একটা বাক্সে ঠোকা লাগতে ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ গর্জে ওঠে–আস্তে! ওতে কি আছে জানো? আমার এক্সপ্রেস রাইফেল, লন্ডন থেকে কেনা। কত দাম জানো? টেন থাউজেন্ড রুপিস্! দশ হাজার টাকা। ঠোকা লাগাবে না। হ্যাঁ–টি ফার্স্ট! চা-এর দরকার।

পটলার কাকীমার ভাই কিরণবাবু এখানের ডি. এফ. ও., তিনিও এসেছেন। আমরা ওঁর জিপে চলে যাবো তিরিশ মাইল দূরের বন বাংলোয়।

কিরণবাবু বলেন, আমার বাসায় চা-টা খেয়ে যাবেন।

হোঁৎকা বলে–ওটা ফেরার সময় হইব। এহন পাহাড়বনের বাংলোতেই যামু মামাবাবু।

পটলাও সায় দেয়, না হলে দেরি হয়ে যাবে। আপনার জিপটাকেও ফেরৎ পাঠাতে হবে।

ক্যাপটেন কর্মকার জিপের সামনের পুরো সিটটা দখল করে বসেছে। জিপ চলেছে শহর ছাড়িয়ে, সামনে দেখা যায় কাঁসাই নদীর বালুচর, জলরেখা, দূরে আকাশকোলে সকালের আলোয় দেখা যায় অযোধ্যা পাহাড় রেঞ্জের সীমানা।

সকালে স্টেশনে চা খেয়ে ক্যাপটেন সাহেবের যুৎ হয়নি। নদীর ধারে একটু বসতি, চার রাস্তার মোড়। একটা পুরানো বটগাছও রয়েছে, চায়ের দোকানও দেখা যায়।

–হল্ট! ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ হুকুম দেয় মিলিটারি ভঙ্গিতে।

জিপটা থেমে গেছে।

ক্যাপটেন বলে, এখানেই ব্রেকফাস্ট, চা খেতে হবে। সকালেই আমার হেভি ব্রেকফাস্ট দরকার।

হোঁৎকাও বলে, তা যা কইছেন! নাম পটলা।

হোঁৎকার প্রাতঃকৃত্যের বেগ এসেছে রাতভোর কলা পাউরুটি খেয়ে।

বলে সে, আমি আইত্যাছি। তরা চায়ের অর্ডার দে। বলেই সে ছুটলে শালবনের আড়ালে।

রুটি-কলা-মাখন-ডিমসেদ্ধ-সন্দেশ সবই আনা হয়েছে কলকাতা থেকে এমনি নিরিবিলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্রেকফাস্ট করার জন্যে।

পটলা খাবারের ব্যাগটা বের করেই চমকে ওঠে। জিবটা আলটাকরায় আটকে যায় উত্তেজনার বশে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে,–স-সব ফি-ফিনিশ! কি-কি কিলিয়ার! কিছুই তো নাই র‍্যা!

ব্যাগে পড়ে আছে কয়েক টুকরো রুটি, চ্যাপটানো ক'টা কলা, আর সন্দেশের বাক্সও খালি। গুঁড়োগুলো পড়ে আছে।

ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ গর্জে ওঠে–হোয়াট,নাথিং ইজ লেফ্ট?

–এ সব শেষ করেছে হোঁৎকা। ফটিক শাসায়–আমিও রেজিগনেশন দিয়ে চলে যাবো! খাবার নাই–পত্তর নাই।

গর্জে ওঠে ক্যাপটেন–হোয়ার ইজ হোঁৎকা?

হোঁৎকা তখন বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে নদীর জলে হাত মুখ ধুচ্ছে। সেও ব্যাপারটা বুঝে সাড়া দেয়, আইত্যাছি। এত চেল্লান ক্যান?

শুধোই, এত খাবার গেল কোথায়?

পটলাও চটে ওঠে। গোবরা বলে, একা তুই সব সাবাড় করেছিস?

হোঁৎকা নীরবে ওদিকের পেটমোটা কিড ব্যাগ থেকে কলাপাতায় মোড়া দিস্তা আড়াই খাঁটি গব্যঘৃতের আলুপরঠা, এক তাল আলু-সবজি, বেশ কিছুটা আচার তৎসহ কেজি দুয়েক সরেস কাঁলাকাদের মোড়ক বের করে বলে পাউরুটি কলার চেয়ে এই খাবার আরও উৎকৃষ্ট। খাই ল!

কাল রাতে সে সেই মাড়োয়ারী পার্টির পুরো খাবার ম্যানেজ করেছে!

ক্যাপটেন এবার খুশি হয়ে বলে, হ্যাঁ।রিয়েলি গুড ফুড! কলাপাতা থেকেই গাবদা হাতে একসঙ্গে এক একটা ইয়া সাইজের পরটা উইথ ভাজি আর কালাকাঁদ বিশাল মুখে পুরে চলেছে, যেন জি-পি-ও লেটার বক্সে চিঠির প্যাকেট ফেলছে, ফেলছে তো ফেলছেই। বেমালুম কোথায় গায়েব হচ্ছে ওসব দ্রব্য তা কে জানে।

হোঁৎকারও খিদে পেয়েছে পেট খালি করে, হোঁৎকা সিকিখানা পোরে তো ক্যাপটেন তখন পুরো পুরোটা গায়েব করে দুসরা ধরেছে, আমরা এক আধখান পেয়েছি কি না পেয়েছি ততক্ষণে আড়াই দিস্তা পরোটা উইথ ভাজি, কালাকাঁদ ভ্যানিস হয়ে গেছে। হোঁৎকা ক্ষুধার্ত ভাবে কলাপাতা চাটছে। মাল আগেই সাফ হয়ে গেছে। ক্যাপটেন এবার কুম্ভকর্ণের আহার সেরে হাঁক পাড়ে, চা কই হে ? ডবল কাপই দিও।

আর কিছু খাবার নেই, দোকানে আছে শুকনো হাড়ের মতো বিস্বাদ লেড়ো বিস্কুট। তাই দুটো করে চিবিয়ে চা খেয়ে উঠলাম।

ক্যাপটেন বলে, নাও, চকোলেট খাও, ভেরি গুড চকোলেট। একটা করে সরু চকোলেট ধরিয়ে যেন রসিকতা করছে। হোঁৎকা রেগে গেলে গুম হয়ে যায়। চুপ করে জিপে বসেছি। জিপ চলেছে পাহাড়ের দিকে। পিছনের সিটে ঢুকছে রাজ্যের ধুলো, আর ঝাঁকানিতে শূন্য উদরের নাড়িভুঁড়ি পাক খাচ্ছে।

হোঁৎকা হাতের চকোলেটটা ছুঁড়ে ফেলে বলে, পটলা, ওই কুম্ভকর্ণেরে স্নামলাও, ওর জন্যি তুই মরবি, নালি আমিই তরে মার্ডার করুম।

ক্যাপটেন তখন সামনের সিট জুড়ে দখল গেড়ে ভরপেট খাওয়ার আমেজে তন্দ্রা দিচ্ছে আর গাড়ির হর্নের দরকার হয় না। অনবরত হর্ন বাজছে।

খালি পেটে আমরা কজন জিপের পিছনে রাস্তার ধুলো আর ঝাঁকুনি খাচ্ছি। পটলা কেমন মিইয়ে গেছে, গোবরা যেন প্রকাশ্যে এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। হোঁৎকা বলে. ওটারে এবার টাইট করুম, তর ওই ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণরে।

পাহাড়ের উপর জিপ উঠছে, দুদিকে গভীর লাল আসাল পিয়ালাল-এর জঙ্গল, পাহাড়ের উপরে একটি অধিত্যকায় দূরে দেখা যায় ফরেস্ট বাংলো। চারিপাশে নেমে গেছে পাহাড়ের গায়ে গভীর বনরাজ্য। বাংলোটায় এসে পৌছালাম, দূরে দু-একটা ছোট আদিবাসী বস্তি, আর চারিদিকে গভীর অরণ্য। বাংলোর চারিদিকে বনবিভাগ পাইন গাছ লাগিয়েছে, ফুলও রয়েছে প্রচুর।

চৌকিদার এগিয়ে আসে, মালপত্র নামালাম। ক্যাপটেনের ঘুম ভেঙেছে, বিশাল দেহে সকাল থেকে তেমনি বিরাট একটা কালো ওভারকোট চাপিয়েছে। সেইটা গায়ে জড়িয়ে বাংলো-বাগান সার্ভে করছে। বিশাল একটা জানোয়ারের মতো থপ্

ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের আশপাশে কতো ভালুক আসতো।

থপ্ করে পা ফেলে চলছে, পট্‌কামারা সিট্‌কে পটলাও রয়েছে ওর পিছু পিছু।

ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ পটলাকে জ্ঞান দিচ্ছে–ফাইন! পাখিও এখানে প্রচুর দেখছি। গ্রীন পিজিয়ন, হিল ডাভ, ময়ূর, প্যারট, হিল ময়না–

বাংলোর চৌকিদার বলে, বাঘ, হাতি, হরিণও আছে। তবে স্যার এখন কুল পাকার সময়। এরপর মহুয়া ফুটবে, তাই ভালুকও আসে এখানে। অনেক ভালুক।

ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ এখন চা খাচ্ছেন, বিস্কুটের প্যাক কলকাতা থেকে আনা হয়েছিল, তার একটা থেকে ডজন খানেক বিস্কুট এক থাবায় মুখে তুলে মুড়ির মতো মড়মড়িয়ে খেতে খেতে বলে অবজ্ঞা ভরে–ভালুক! আরো ছোঃ ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামের আশপাশে কত ভালুক আসতো। গরু বাঁধা গোঁজ জানো?

আমাদের দিকে অবহেলা ভরে চাইল, অর্থাৎ এসব খবর আমাদের রাখারও এলেম নেই। ক্যাপটেন বলে, সেই গোঁজ একটানা পট্ করে তুলে, তাই দিয়ে পিটিয়ে ভালুক মেরেছি কতো দিন।

পরক্ষণেই তাড়া দেয় ক্যাপটেন, কই হে হোঁৎকা না কোঁৎকা, লাঞ্চ-এর ব্যবস্থা করো, দ্যাখো মুর্গী টুর্গী যেন থাকে। আর চৌকিদার, ডিমও এখানে সস্তা। ডজন চার পাঁচ ডিম যা পাও আনো। কুইক! খেয়ে দেয়ে একটু রেস্ট নিতে হবে। কাল রাতে ওই থার্ড ক্লাশ ট্রেনে ঘুমই হয় নি।

হুকুম করে বলে ক্যাপটেন, পটল, চলো ওই ঝর্ণার দিকটা একটু দেখে আসি!

চৌকিদার বলে, হুঁশিয়ার হয়ে যাবেন স্যার, দুপুরে ওদিকে চিতেবাঘ জল খেতে আসে।

ক্যাপটেন তার রাইফেলটা তুলে মুখে কপ্ কপ্ করে দু তিনটে চকোলেট পুরে বলে, নেভার মাইন্ড। চলো পটল, তোমাকেও শিকারের চান্স পেলে কেমন করে শিকার করতে হয় দেখিয়ে দেব। আমি তরাই-এর বনে এইভাবে ট্রেনিং দিয়ে জিমি, তোমাদের জিম করবেটকে শিকারী করেছিলাম।

পটলা রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে জিম করবেট হবার স্বপ্নে তখন মশগুল হয়ে বের হয়ে গেল।

গোবরা বলে, পটলা এক্কেবারে বদলে গেছে রে। কী বানাবে ওকে ক্যাপটেন?

হোঁৎকা বলে, আর তগোর ক্যাপটেনেরে আমি কিমা বানাইমু। দেখস্।

খাওয়া-দাওয়াটা মন্দ হয় নি। কপি, আলু, টম্যাটোর তরকারী, আর মুরগীর মাংস। কিন্তু যা বাজেট ছিল, একা ক্যাপটেনের খোরাক আমাদের তিন গুণ পড়ছে, আমাদের ছ'জনের জন্য ছোটবড় চারটে মুরগী ছিল, কিন্তু ক্যাপটেন টেনেছে অর্ধেকেরও বেশি। আমরা টুকরো-টাকরা পেয়েছি। হোঁৎকা বেশ রেগে উঠেছে। কিন্তু পটলা তখন ক্যাপটেনের শিকার নিয়ে আলোচনায় মত্ত।

পটলা বলে, সন্ধ্যার পরও বের হবো।

হোঁৎকা বলে, বেশি ক্যাদ্দানি দেখাবি না পটলা, বন-জঙ্গলেরে বিশ্বাস নাই।

পটলা বলে, রাইফেল সঙ্গে আছে রে। আর ক্যাপটেন রয়েছে। ও তো খালি হাতে বাঘ মেরেছে, ভালুক মেরেছে।

আমি শোনাই, এবার তোকেও মারবেন উনি, আমাদেরও। এসব বীরত্ব দেখাতে যাস না।

ক্যাপটেন আমাদের কথা শুনে হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, কাওয়ার্ডস! এই তোমাদের সাহস ইয়ং বয়েজ? দেশের ভবিষ্যৎ তোমরা? পুঃ–এ দেশ তাই অধঃপাতে না যায় কোনোদিন। ব্রি ব্রেভ, লাইক পটলা!

আমরা চুপ করে থাকি। এমন সুন্দর বেড়ানোর মেজাজটাও খিঁচড়ে যায়। পটলা ক্যাপটেনের সঙ্গে ওই ঘরে রয়েছে আমরা রয়েছি এদিকের ঘরে।

পটলা এখন ক্যাপটেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, গ–গ্রেট শিকারী রে! ওয়াইল্ড লাইফ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তেমনি। অনেক কিছু শিখেছি।

হোঁৎকা বলে, তর শিখনের এহনও ঢের বাকি আছে পটলা। ওটা আমিই তগোর শিখামু। হালায় আনছিস একখ্যান্ জিনিস, সব খাইত্যাছে। আধা প্যাটা খাই আছি। আর তুই মজা করছস! যা গিয়া–

পটলা বলে, খ-খাওয়াটাই সব?

রাত হয়েছে। চাঁদনী রাত। জানলা দিয়ে দেখা যায় বাগান, তারপর বনসীমা, পাহাড় রাজ্য। পটলার ঘুম ভেঙে গেছে, দেখে ক্যাপটেন সাহেব বিছানায় নেই। পটলার মনে হয় ক্যাপটেন এমনি রাতে বোধহয় বাইরে গেছে। জানলা দিয়ে দেখা যায় বাইরে গাছের ছায়ায় ক্যাপটেন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে বনের দিকে চেয়ে আছে। পটলাও এমনি রাত গহনে নির্জনে ক্যাপটেনের সঙ্গে বনের সৌন্দর্য দেখতে চায়, অরণ্য সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান থেকে কিছু ভাগ নিতে চায়। পটলাও গায়ে চাদরটা জড়িয়ে বের হয়ে আসে চুপেচুপে, ধ্যানমগ্ন ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণের পিছনে গিয়ে চুপিচুপি ডাকে, স-স্যার!

কোনো সাড়া নেই। পটলা আর একটু গলা তুলে ওর ধ্যানভঙ্গ করার চেষ্টা করে–স-স্যার। ধাক্কাও দেয়। আর তখনই স্যার ফিরে চেয়েছে। দেখেই পটলা বিকট আর্তনাদ করে ওঠে। স্যার কোথায়! একটা বিরাট ভালুক তন্ময় হয়ে কুল খাচ্ছিল, ওর ডাকে ফিরে চাইতেই পটলা ওই বিশাল ভালুকটাকে দেখে চিৎকার করে ওর গায়ের চাদরটা ভালুকের দিকে ছুঁড়ে সেটাকে আগাপাশতলা চাপা দিয়ে বাংলোর দিকে দৌড়তে থাকে।

ওর বিকট চিৎকারে হোঁৎকা, আমি, গোবরা, ফটিকও বের হয়েছি। চাঁদের আলোয় দেখা যায় ওদিকে শাল জড়ানো বিরাট

ফ্যারেক্স® প্রথম পছন্দের!

কারণ, নতুন উন্নত ফ্যারেক্স-এ, বাচ্চাকে তার প্রথম ধাপের শক্ত-আহার ধরানোয় সাহায্য করার জন্যে থাকে, অত্যাবশ্যক সব উপাদানের সঠিক সম্মেলন।

প্রোটিন ও ফ্যাটের সঠিক মিশ্রণ

ফ্যারেক্স,প্রোটিনে ভরপুর হয়. যা বাচ্চাকে দৃঢ় ও সুস্থভাবে বাড়বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফ্যারেক্স-এ থাকে, বাচ্চার কোমল হজম-ক্রিয়ার উপযুক্ত, বিশেষভাবে ফর্মুলেট করা একেবারে সঠিক পরিমাণে ফ্যাট।

বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে থাকে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন

বাচ্চার ৪ মাসের সময়, তার মজুত রাখা সমস্ত আয়রন নিঃশেষ হয়ে যায়। ফ্যারেক্স-এ যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন থাকে যা, বাচ্চার রক্ত সুস্থ রাখতে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের আদর্শ অনুপাত

বিশেষভাবে ফর্মুলেট করা ফ্যারেক্স-এ থাকে, ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের ২:১ আদর্শ অনুপাত যা, দিনের পর দিন ধরে, বাচ্চার দাঁত ও হাড়, শক্ত ও সুস্থভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আর, পুষ্টিকর এই ফ্যারেক্স-এর প্রতিটি আহার এখন আরো বেশী সুস্বাদু করা হয়েছে — আর, এটি মেশানোও অতি সহজ।

সস্নেহ উপহার এনেছে গ্ল্যাক্সো!

নতুন উন্নত ফ্যারেক্স®

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।
এ শুধু জল দিয়ে মেলান, আর খাওয়ান।

CLARION/B/GX/10/244 BEN

দেব সাহিত্য কুটীরের নবতম উপহার

ক্রাইম সিরিজ

রহস্য, রোমাঞ্চ, সন্ত্রাস, গুপ্তচর আর গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস। প্রতি মাসে একটি করে বেরুচ্ছে। প্রত্যেকটি বইয়ের দাম মাত্র সাত টাকা। লিখছেন ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী

১৫ই এপ্রিল বেরিয়েছে

নিয়ত বিপন্ন মৃত্যু

সন্ধ্যের পর ময়দানে লেকে জগাররা আর দৌড়তে পারছে না, উন্মাদ এক খুনী তাদের খুন করে ফেলছে! কে এই খুনী–যার ভয়ে সারা শহর আতংকিত?

১৫ই মার্চ বেরিয়েছে

রুপোলি বিছের কামড়

বিশ্ব ব্যাঙ্কের তিনশ কোটি টাকা সরিয়ে ফেলার মতলব এঁটেছে এক মেয়ে ডাকাত আর এক ভাড়াটে সৈন্যাধ্যক্ষ। ভয়ঙ্কর রক্তপাত আর খুনের মধ্যে সদ্য স্বাধীন এক আফ্রিকান রাষ্ট্র, গোলা বারুদে আচ্ছন্ন বোগাণ্ডোয় হাজির হলেন এক ভারতীয় এজেন্ট তারপর...

১৫ই ফেব্রুয়ারী বেরিয়েছে

নরহত্যা

তিনজন ডাকাত দিনের বেলা বারো লাখ টাকা লুঠ করে, দুটো খুন করে পালিয়ে গেল..... কিন্তু কোথায় তারা গা ঢাকা দিলো? পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজে দিশাহারা... ঠিক তখনই...

এর আগে বেরিয়েছে

বুলেটের শিস্, উজ্জ্বল নীল মৃত্যু, উড়ন্ত বাজ, জ্বলন্ত আগুন, অদৃশ্য কালো হাত, মৃত্যুদূতের শেষ প্রহর, প্রবাল দ্বীপের বিভীষিকা, শকুনেরা ওৎ পেতে, গুপ্তহত্যা রাত্রির কালো দূত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ)লিঃ, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলি৯

ভালুকটাকে, পটলা আর্তনাদ করছে এদিকে।

দৌড়ে গিয়ে ক্যাপটেনের ঘর থেকে বন্দুকটা তুলে এনেছি, হাতে কার্তুজের বাক্স। হোঁৎকা ভীত আতঙ্কিত পটলাকে ধরে চিৎকার করে–গুলি কর সমী, ভালুকটার দিকে গুলি কর–

বন্দুকে টোটা পুরতে গিয়ে দেখি– বাক্সে গুলি নেই, রয়েছে ক্যাপটেনের প্রিয় খাদ্য চকোলেট। গুলি একটাও নেই।

ভালুকটা ওদিকে শাল চাপা পড়ে ওটা থেকে মুক্ত হবার জন্য পটলার দামী কাশ্মীরী শালটাকে নখ দাঁত দিয়ে নিবিষ্ট মনে ফালা ফালা করে চলেছে আর বারান্দায় আমাদের সমবেত চিৎকারে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

–হোয়াটস আপ্–বের হয়ে এসেছে বাথরুম থেকে ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ। অত্যধিক খাওয়ার ফলে রাতদুপুরে বাথরুমে গিয়েছিল, আর ওকে বিছানায় না দেখে পটলাও বাইরের ভালুকটাকে পিছন থেকে দেখে তাঁকে ভেবেই বের হয়ে এসে এই কান্ড বাধিয়েছে। এবার আমাদের গোলমাল শুনে ওভারকোট চাপিয়ে বাইরে বীরদর্পে বের হয়ে এসেছে, চাঁদের আলোয় ওই ভালুকটাকে দেখে হঠাৎ বিকট আর্তনাদ করে ওঠে ক্যাপটেন কুম্ভকর্ণ, মাই গড। ভা-লুক! ওরে বাব্বা গো–বাঁচাও, বাঁচাও–হেল্প–

বিকট চিৎকার করে টাউরি খেয়ে আছড়ে পড়ে পিপের মতো গড়াতে গড়াতে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের বাইরে ফেলে রেখেই দরজা বন্ধ করে বন্ধ ঘরের মধ্যে বিকট চিৎকার করতে থাকে মাতৃভাষায়, খেয়ে ফেললোরে–বাঁচাও–অয় বাবা গো–

...বিকট কন্ঠস্বর, ওই আর্ত চিৎকারে চৌকিদার, রেঞ্জার, ফরেস্ট গার্ডরাও ছুটে আসে।

ভালুক বাবাজী এ হেন বীরত্বে ঈষৎ ঘাবড়ে গিয়ে কুলভক্ষণপর্ব ত্যাগ করে হেলতে দুলতে আবার বনে ঢুকে গেছে। পড়ে আছে পটলার দামী কাশ্মীরী শালখানা। তার শাল আর নেই–ওটা কয়েক খন্ড মাফলারে পরিণত হয়েছে।

পরদিন সকালেই ক্যাপটেন কর্মকার বলে, কলকাতায় আর্জেন্ট কাজ আছে পটল, ফিরতেই হবে। জিপ যাচ্ছে শহরে ওদের গাড়িতে গিয়ে ট্রেন ধরবো। সাবধানে থেকো–

হোঁৎকা বলে, ঠিক আছে। আপনি তাহলি যান–আর এই যন্তরখান লই যান। বন্দুক আনছেন গুলি নাই।

ক্যাপটেন বলে, আমি এখন অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী। অনেক যুদ্ধ করে–

হোঁৎকা বলে, ধর্মাশোক হইছেন। আহেন– নমসকার।

ফরেস্ট-বাংলোয় এবার আমাদের মুক্ত মেলা বসে। গোবরা হাঁক পাড়ে–চৌকিদার, মুড়ি আর আলুভাজা লাগাও উইথ চা।

রোদপিঠ করে বাগানে বসেছি। পটলা বলে, ক্যাপটেন তাহলে কী শেখালো রে?

হোঁৎকা বলে, যা শিখছস্ সব ভুইল্লা যা, তরে কইনি ওটা ক্যাপটেন কর্মকার নয়, ক্যাপটেন কুম্ভকর্ন, শুধু খাতি পারে আর ঘুমাতি পারে। যত্তো সব!

এক গ্রামে কয়েক ঘর কৃষকের বাস। সবাই গরিব। তবু এদের মধ্যে ডোনাল্ড নামে কৃষকটির একটু সম্পন্ন অবস্থা। তার জমিজিরেত চাষবাস দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ডোনাল্ডের সংসার বলতে সে আর তার বুড়ি ঠাকুমা। বুড়ি হলে কী হবে, ক্ষমতা আছে। আছে মানে ছিল। এখন ঠাকুমার বয়স একশ।দশ বছর আগেও উঠোনে বসে এক টাল গম ঝেড়েছে। এখন আর পারে না। এখন অথর্ব। বিছানায় শোয়া। এখন তখন অবস্থা তার। ডোনাল্ড সাধ্যমত ঠাকুমার সেবা করে আর তার আশীর্বাদে ডোনাল্ডের দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ডোনাল্ডের ঘরের বাঁ দিকে আর ডান দিকে দুই প্রতিবেশীর ঘর। তাদের নাম হুডন,ডুডন। নাম শুনলে মনে হবে দুই ভাই। তা কিন্তু নয়। ডোনাল্ডের শ্রীবৃদ্ধি দেখে হিংসেয় হুডন ডুডন ফেটে যায়। কেবল মতলব ভাঁজে কী করে ডোনাল্ডকে দাবিয়ে দেওয়া যায়। কী করে তার ক্ষতি করা যায়। একবারও ভাবে না যে ডোনাল্ডের ক্ষতি করে তাদের কী লাভ হবে! ব্যাপারটা ডোনাল্ডের জানা ছিল। তাই হুডন ডুডনের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলত না ডোনাল্ড। একদিন হুডন ডুডন ফন্দি করল যে তারা দুজনে মিলে ডোনাল্ডের লাঙল চষা ষাঁড়টাকে মেরে ফেলবে। তা হলে তার চাষবাসের ক্ষতি হবে।

যেমন মতলব তেমন কাজ।

একদিন সকালে ডোনাল্ড ঘুম থেকে উঠে দেখে যে তার ষাঁড়টা মরে পড়ে আছে। ডোনাল্ড বুঝতে পারল যে এটা হুডন আর ডুডনের কাজ। মুখে তাদের কিছু বলল না ডোনাল্ড। মরা ষাঁড়টার দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে দুপুরের পর সেই চামড়া বিক্রি করার জন্য ডোনাল্ড শহরে রওনা হলো।

হুডন ডুডন বলল, মরা ষাঁড়ের চামড়া বেচে কি আর নতুন ষাঁড় পাওয়া যাবে বাছাধন!

গ্রামের রাস্তা ধরে কাঁধে ষাঁড়ের চামড়া নিয়ে ডোনাল্ড যখন যাচ্ছে তখন তার মাথার ওপর দিয়ে একটা কথা বলা পাখি বারবার উড়ে উড়ে চামড়াটাতে বসবার ধান্দা করছে। ডোনাল্ড ভাবল, বেশ মজা হবে, পাখিটাকে ফাঁদে ফেলে ধরা যাক। শহরে বিক্রি করলে ভাল পয়সা পাওয়া যাবে।

পাখিটা একবার বসে আর একবার ওড়ে। ধরতে গেলে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। এমনি করতে করতে একবার ডোনাল্ড তার বাঁ কাঁধে বসা পাখিটাকে ডান হাত ঘুরিয়ে খপাৎ করে ধরে ফেলল। পাখিটা পরিষ্কার কথা বলে উঠল, লাগছে গো, আমায় ছেড়ে দাও।

ডোনাল্ড বলল, ধরেছি যখন আর কি তোমায় ছাড়ছি সোনা! ছাড়ব তোমায় পরের হাতে, শহরে গিয়ে। তখন থেকে জ্বালাচ্ছ মাথার ওপর চক্কর দিয়ে।

বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যে হয় হয় সেই সময় ডোনাল্ড পৌঁছে গেল শহরে। শহরে ঢুকে খুঁজে পেতে একটা দোকান পেল জীবজন্তুর চামড়ার। সেখানে ভাল পয়সার বিনিময়ে ষাঁড়ের চামড়াটা বিক্রি করল ডোনাল্ড। এদিকে

খুব খিদে পেয়েছে তার, খুব ক্লান্ত। ভাল দাম পেল না বলে পাখিটা সেই দোকানে বিক্রি করল না। পাখিটা হাতে নিয়ে সে একটা খাবারের দোকানে ঢুকল। খাবার দাবার খেয়ে ডোনাল্ড যখন দোকানীকে পয়সা দিতে গেল তখন পাখিটা ডেকে উঠল। দোকানী ডোনাল্ডকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কিছু বললে?

ডোনাল্ড বলল, আজ্ঞে না, আমি না। আমার পাখিটা বলল।

–এটা কি কথা বলা পাখি?

–শুধু কথা বলা পাখি নয়, আমার এই পাখি সব বুঝতে পারে। সব রকম জারিজুরি ধরতে পারে।

–কী রকম?

ডোনাল্ড চটপট জবাব দেয়–এইমাত্র পাখিটা কী বলল জানেন?

–কী বলল? ঠিক শুনতে পাইনি।

ডোনাল্ড বলল–আমি খাবারের দাম দিচ্ছি দেখে পাখিটা বলল যে বাসি খাবারের জন্য এত পয়সা দিচ্ছি কেন!

ডোনাল্ড কথাটা সম্পূর্ণ বানিয়ে বলেছিল। আসলে বেশি দাম দিয়ে পাখিটা গছিয়ে দেবার ধান্দা।

ডোনাল্ডের কথা শুনে দোকানের মালিকের মুখ যেন চুপসে গেল। তার মানে সত্যি সে বাসি খাবার দিয়েছে, এবং পাখির কেরামতি দেখে দোকানীর চোখ চকচক করে উঠল। বলল, তুমি তোমার পাখিটা বিক্রি করবে?

–তেমন দাম পেলে করব বৈকি।

–কত দিতে হবে বল।

ডোনাল্ড মনে মনে একটা ষাঁড়ের দামের হিসেব করল। চামড়া বিক্রির টাকা কিছু আছে। বাকি টাকা তার চাই। সেই হিসেব মতোই ডোনাল্ড দাম হাঁকল পাখিটার। এ তো আর সাধারণ কথা বলা পাখি নয়!

দোকানী রাজী হয়ে গেল। আর সেই টাকা পেয়ে ডোনাল্ড পরের দিন একটা ষাঁড় কিনে বাড়ি ফিরল। ষাঁড় কিনেও তার কাছে টাকা রয়ে গেল। গ্রামে ফিরে ডোনাল্ড হুডন ডুডনকে বলল, তার ষাঁড়টাকে মেরে তারা ভালই করেছে। সে শহরে গিয়ে অনেক টাকা পেয়েছে। কথা বলা পাখির কথা সে তাদের কিন্তু বলল না।

ডোনাল্ডের কথা শুনে হুডন ডুডনের খুব হিংসে হলো। তারাও তাদের ষাঁড় মেরে চামড়া ছাড়িয়ে শহরে গেল বিক্রি করতে। কিন্তু যৎসামান্য টাকা পেয়ে রাগে গজরাতে গজরাতে তারা ফিরে এল।

ডোনাল্ড বুঝতে পেরেছিল যে ঐ হিংসুক প্রতিবেশীরা তাকে ছাড়বে না। হয়তো তাকে মেরে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যাবে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি এসে সে দেখল তার বুড়ি ঠাকুমার শেষ অবস্থা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডোনাল্ডের ঠাকুমা মারা গেল। ডোনাল্ড সেই রাতে কাউকে কিছু বলল না। শুধু নিজের ঘরের বিছানায় ঠাকুমাকে চাদর চাপা দিয়ে শুইয়ে রেখে ডোনাল্ড ঠাকুমার বিছানায় শুয়ে রইল। মাঝরাতে হুডন ডুডন এসে ডোনাল্ডের ঘরে ঢুকে ডোনাল্ড মনে করে তার মরা ঠাকুমার গলা চেপে ধরল। ডোনাল্ড পাশের ঘর থেকে গলার আওয়াজ দিতেই হুডন ডুডন পালিয়ে গেল। তারা

ডোনাল্ডকে একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে বেঁধে নিয়ে দুজনে চলল নদীর দিকে।

কিন্তু এটা জেনে গেল যে ডোনাল্ডের ঠাকুমাকে তারা গলা টিপে মেরেছে।

পরদিন হুডন আর ডুডন দেখল যে ডোনাল্ড তার মরা ঠাকুমাকে পিঠে করে নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে।

শহরের কাছাকাছি গিয়ে ডোনাল্ড একটা খাবারের দোকানের সামনে একটা কুয়া দেখতে পেল। সেই কুয়ার পাড়ে মরা ঠাকুমাকে এমন ভাবে ঠিকঠাক করে রাখল যেন বুড়ি কুয়ার জল দেখছে। ডোনাল্ড তারপর দোকানে ঢুকে বলল যে তারা খুব তৃষ্ণার্ত এবং ক্লান্ত। কিছু খাদ্য ও পানীয় চাই। খাবারের দোকানের মালিক একজন মহিলা। তাকে ডোনাল্ড বলল যে সে এইখানে বসছে, মহিলা যেন দয়া করে কুয়ার ধারে বসা তার বুড়ি ঠাকুমাকে ডেকে আনে। একথাও বলে দিল যে তার ঠাকুমা কানে শুনতে পায় না। কাছে গিয়ে ঠেলা মেরে বলতে হবে।

ডোনাল্ডের কথামতো সেই মহিলা ডোনাল্ডের ঠাকুমাকে আনবার জন্য তার গায়ে একটু ঠেলা দিল আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমার মরা দেহখানা কুয়ার মধ্যে পড়ে গেল। মহিলা হায় হায় করে উঠল। ডোনাল্ড ছুটে গেল। গ্রামের লোকজন দৌড়ে এল। ঠাকুমার মরা দেহখানা কুয়া থেকে তোলা হলো। ডোনাল্ড শোকের অভিনয় করে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।দোকানী-মহিলা সত্যিকারের শোকসন্তপ্ত হয়ে উঠল। নিজেকে সে দোষী মনে করে কপাল চাপড়াতে লাগল। গ্রামের লোকজন বলল যে এমন একটা বিশ্রী কান্ড গ্রামে ঘটল যে গ্রামের নিন্দে হবে। সুতরাং নিন্দের হাত থেকে বাঁচবার জন্য গ্রামের লোকজন চাঁদা তুলে প্রচুর টাকা দিল এবং ডোনাল্ডের ঠাকুমার যথাযথ সৎকারের ব্যবস্থা করল।

টাকার থলি নিয়ে ডোনাল্ড যখন গ্রামে ফিরে এল, তাই দেখে হুডন ডুডনের চোখ কপালে আটকে রইল কিছুক্ষণ।

ডোনাল্ড বলল–ভাই তোমরা আমাকে মারতে গিয়ে ঠাকুমাকে মেরে আমার ভালই করেছ। বুড়ি কষ্টও খুব পাচ্ছিল। আর তাছাড়া আমার মরা ঠাকুমাকে শহরে বেচে এই দেখ কত টাকা পেয়েছি।

ডোনাল্ডের কথা শুনে হুডন ডুডনের মাথার ঠিক থাকল না। মরা ঠাকুমা বেচে এত টাকা! বাপরে বাপ! ওরা দুজনে একদিন রাত্রিবেলায় তাদের বুড়ি ঠাকুমাদের মেরে ফেলল। তারপর শবদেহ নিয়ে শহরে গেল বিক্রি করতে। শহরের লোকজন তাদের প্রস্তাব শুনে তাদের বেদম প্রহার দিল।

হুডন ডুডন এবার ডোনাল্ডের ওপর আরও রেগে

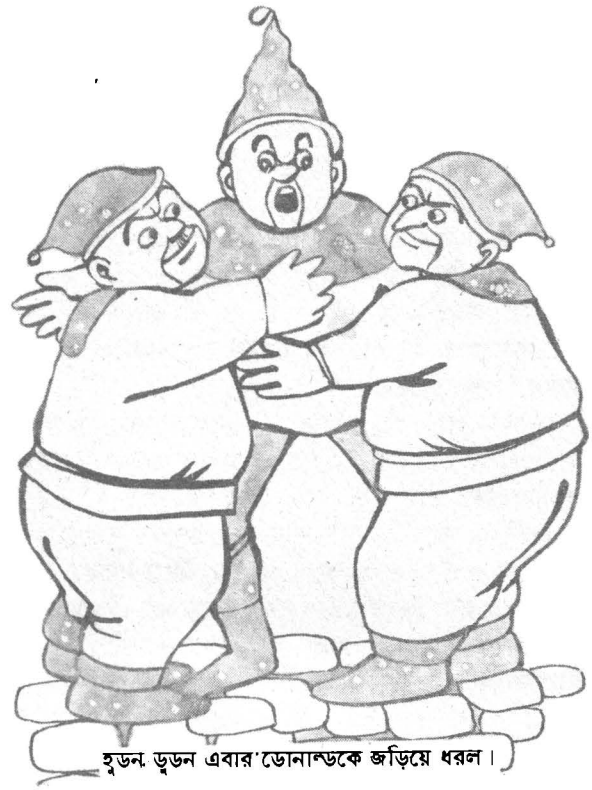

হুডন ডুডন এবার ডোনাল্ডকে জড়িয়ে ধরল।

উঠল। ডোনাল্ডকে তারা শেষ করবেই।

পরদিন সকালবেলায় ঘরের বারান্দায় বসে ডোনাল্ড যখন জলখাবার খাচ্ছে, হুডন আর ডুডন পেছন থেকে চুপি চুপি এসে ডোনাল্ডকে চেপে ধরে একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে বেঁধে নিয়ে দুজনে চলল নদীর জলে তাকে ফেলে দেবে বলে।

পথে যেতে যেতে হুডন ডুডন দেখল পাশের জঙ্গল থেকে একটা লাল রঙের খরগোশ বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে। খরগোশটাকে দেখে তাদের লোভ হলো। তারা বস্তাবন্দী ডোনাল্ডকে পথের পাশে রেখে খরগোশটার পেছনে ছুটল।

এদিকে ঐ পথ দিয়ে তখন আসছিল একজন সুদখোর মহাজন। ডোনাল্ড তখন বস্তার মধ্যে বন্দী অবস্থাতেই গুনগুন করে গান গাইছে আর মতলব ভাঁজছে। লোকটা তো ঐ দৃশ্য দেখে অবাক। সে তখন জিজ্ঞেস করল–তুমি এই মুখবন্ধ বস্তার মধ্যে বসে গান গাইছ কেন?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ডোনাল্ড জবাব দিল–গান গাইছি আনন্দে ভাই।

–আনন্দে! কীসের আনন্দে হে?

–আমি যে সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছি!

–এ্যাঁ! সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় নাকি?

ডোনাল্ড বুদ্ধি খেলিয়ে বললে–কেন যাবে না ভাই। পরীদের দেওয়া এই বস্তার মধ্যে ঢুকলেই হলো। ব্যাস্।

সুদখোর মহাজন বলল, তা ভাই তুমি যা চাও তাই দেব, আমাকে তোমার জায়গাটা দাও না। আমি স্বর্গে যেতে চাই। পৃথিবী আমার আর ভাল লাগছে না। আহা সশরীরে স্বর্গে গিয়ে বাস করার যে কী আনন্দ!

ডোনাল্ড বলল, কী দেবে আমায় যে তোমাকে আমার জায়গাটা ছেড়ে দেব!

লোকটা বলল, এই দেখ আমার কাছে সহস্র মুদ্রা রয়েছে আর ঐ যে পাশের মাঠে বিশটা গরু চরছে ওগুলো আমার। সব তুমি নিয়ে নাও।

এই কথা শুনে ডোনাল্ড বলল, দাও তবে থলির মুখ খুলে দাও। তাড়াতাড়ি কর। পরীরা এসে যাবে।

এরপর থলি থেকে ডোনাল্ড বেরিয়ে এল। লোকটার হাত থেকে সহস্র মুদ্রা নিল। গরুগুলোকে ডেকে নিল। আর লোকটাকে বস্তার মধ্যে আটকে সেখান থেকে চলে গেল।

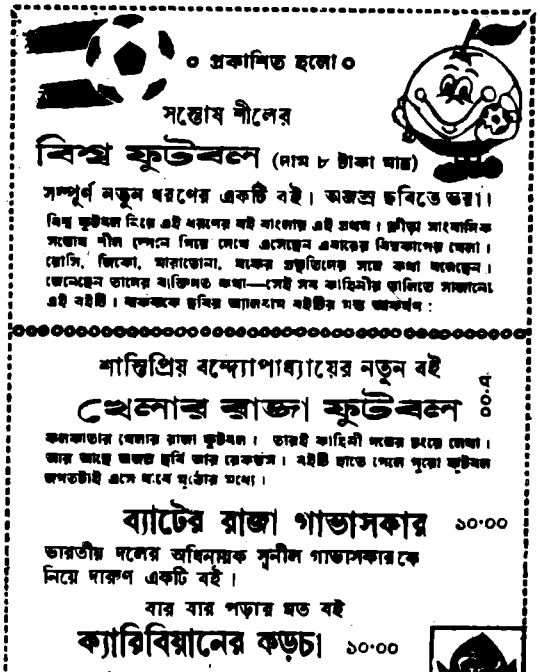

একটু পরেই হুডন ডুডন লাল খরগোশ হাতে নিয়ে ফিরে এসে সেই মুখবন্ধ বস্তাভর্তি লোকটাকে নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ফেলে দিল।

হুডন ডুডন মনের আনন্দে তালি বাজাতে বাজাতে আর গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরে এল। পরদিন সকালবেলায় ডোনাল্ডকে দেখে তারা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এ কী করে সম্ভব। শুধু ডোনাল্ড নয়, ডোনাল্ডের বাড়িতে বিশটি দুধেলো গাভী এল কোথা থেকে।

ডোনাল্ড এক গাল হেসে ঘরের বাইরে এসে বলল, তোমরা আমাকে নদীর জলে যেখানে ফেলে দিয়েছিলে তার একটু দূরে আমি হাজার হাজার মুদ্রা পেয়েছি। আরও কত হাজার মুদ্রা যে ওখানে জলের তলায় পড়ে আছে তা আর কী বলব। আমি অনেক মুদ্রার বিনিময়ে এই গরুগুলো কিনেছি আর বাকি মুদ্রা এই দেখ আমার থলিতে।

হুডন ডুডন এবার ডোনাল্ডকে জড়িয়ে ধরল। বলল, ভাই তোমাকে আমরা অনেক কষ্ট দিয়েছি। এবার থেকে আমরা তোমার সত্যিকারের প্রতিবেশী এবং বন্ধু হলাম। আমাদের একবারটি নদীর জলে সেই জায়গাটা দেখিয়ে দাও। আমরাও জলে পড়ব তোমার মতো।

ডোনাল্ড বলল, এ আর এমন কথা কী! বেশতো, আজ রাতেই হবে। না, রাতে তোমাদের অসুবিধে হবে, কাল সকালেই হবে। দুটো বস্তা আর দড়ি নিয়ে আমার সঙ্গে সেই নদীর ধারে যাবে। আমি তোমাদের এক এক করে ফেলে দেব নদীর জলে ঠিক সেই জায়গাতে। তারপর তোমরা বস্তা থেকে বেরিয়ে পড়ে মুদ্রা তুলতে শুরু করবে।

তাই হলো শেষ পর্যন্ত। এক বস্তাতে হুডন এবং অন্য বস্তাতে ডুডনকে ভরে ডোনাল্ড বলল, নাও এবার তৈরি হও।

হুডন বলল, বস্তার মুখটা আলগা করে বেঁধেছ তো!

ডুডন বলল, আমারটা ভাই একদম আলগা রেখো।

ডোনাল্ড বলল, হ্যাঁ ভাই, সব ঠিক আছে!

বলে বস্তার মুখ দুটো আরও জোরসে বেঁধে দিল সে।

হুডন ডুডন ডোনাল্ডকে বলল–তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই। নাও আমরা তৈরি। ঠিক জায়গায় ফেল।

ডোনাল্ড আর দেরি করল না। এক এক করে বস্তা-সুদ্ধ ওদের নদীর জলে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা যে কোথায় তলিয়ে গেল কেউ জানল না। ডোনাল্ডও এবার নিশ্চিন্ত মনে বাড়িতে ফিরে এল।

* আয়ারল্যাণ্ডের লোকগাথা অবলম্বনে

মা-লক্ষ্মীর বাহন

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের বাড়িটা পাকা, একতলা, কিন্তু বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে জল পড়ে। মা বালতি টেনে নিয়ে এসে নিচে পেতে দেয়। তাতে ছাদের জল পড়ে টুপটাপ শব্দ হয়। বর্ষা পড়লেই আমার গা গরম হয়ে জ্বর হয়, সেই জ্বরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ঐ টুপটাপ শব্দ শুনতে আমার বেশ লাগে। কিন্তু মা ভয়-ভয়-চোখে ছাদের দিকে তাকায়, কী ভাবে কে জানে, আমার সামনে চট করে কিছু প্রকাশ করে না। অথচ ছোট বোনটা মায়ের আতঙ্কের কথা টের পায়, এসে বলে—এই দাদা, ছাদের দিকে চোখ রাখিস, ভেঙে না পড়ে! আমি মার সঙ্গে কলতলায় যাচ্ছি, বাসন মাজতে।

—এই বৃষ্টিতে?

—মাথায় গামছা দিয়ে নিচ্ছি, কিচ্ছু হবে না।

সত্যিই কিছু হয় না। দশ বছর বয়স, লিকলিকে শরীর, কিন্তু আমার মতো হুট করে জ্বর-জারি ওর কখনো হয় না। ও-কেন, দিদিরও হতো না। আমি জ্ঞান হয়ে অবধি দিদি অসুখে পড়ে বিছানা নিয়েছে, এটা কখনো দেখি নি। আজ এক বছর হয়ে গেল দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর একবার মাত্র এসেছিল জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে, তার পরে আর আসে নি। অন্য সময় দিদির কথা মনে পড়ে না, কিন্তু জ্বর হয়ে শুয়ে থাকলে দিদির কথা বড্ড মনে পড়ে। আমাদের দু-কাঠা জমির ওপর ছোট্ট বাড়িটার তিনদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পিছনে দশ ফুট জায়গা ছাড় আছে, তার একদিকে কলতলা, অন্যদিকে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। সেখানে এক্কা-দোক্কা খেলতে খেলতেই দিদি বড়ো হয়েছিল, এখন সেখানে ছোটবোন খেলে, আমিও আগে খেলতুম, কিন্তু পৈতে হয়ে যাবার পর কেমন যেন লায়েক হয়ে গেছি, আর খেলি না।

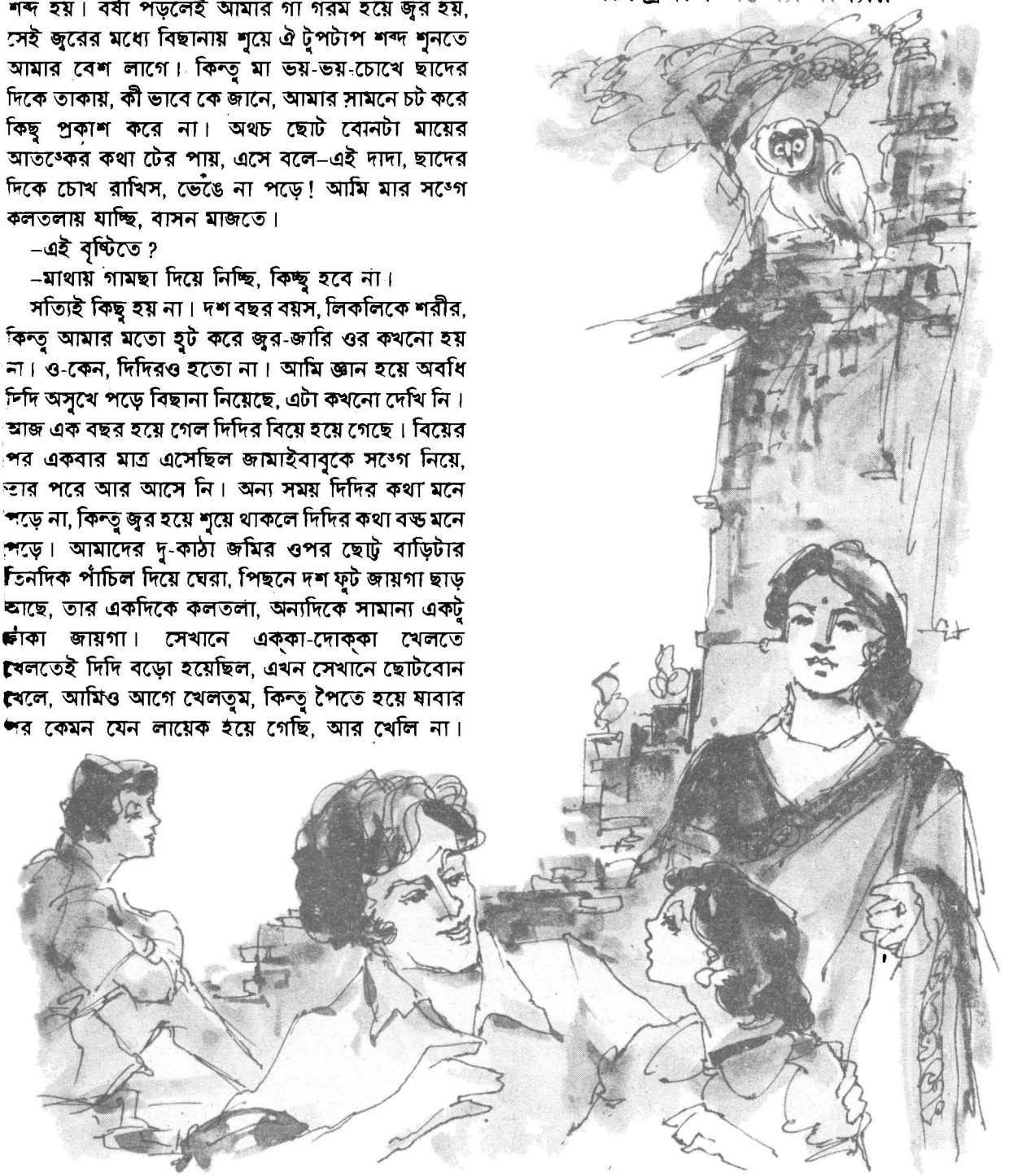

তাছাড়া, উঠেছি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে, কতো পড়ার চাপ, এখন কি এক্কা-দোক্কা খেললে আমাকে মানায় ?

আমার বাবা একটা কারখানায় কাজ করতেন। ভোরে বেরিয়ে সন্ধের পর ফিরতেন। এখনও তেমনি বেরিয়ে যান, তেমনি ফিরে আসেন, এমন কি একটু রাত করেই ফেরেন অথচ বাবার চাকরি নেই। কারণ, কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেছে, মালিকরা নাকি 'লেলাজার' ঘোষণা করে দিয়েছে। এ অবস্থায় মা যে কী করে সব-কিছু সামলাচ্ছে তা আমি 'লায়েক হয়েছি' মনে করেও সঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। মাছ আসে না বাড়িতে, অনেকদিনই ডাল আর আলুভাতে দিয়ে ভাত খেতে হয়। তাই নিয়ে ছোট বোনটা এক এক সময় ঘ্যানঘ্যান করলেও আমি করি না, আমি যে 'লায়েক হয়েছি'! লায়েক হয়েছি বলে জানতে পেরেছি, দিদির বিয়ে দিতে গিয়ে এ-বাড়ি আমাদের বাঁধা পড়েছে। পুরনো এক-তলা বাড়ি, বাইরের বালি বহু জায়গাতে খসে পড়েছে, উঠেছে অশথের চারা, ছাদ ফেটে গিয়ে জল চুঁয়ে পড়েছে, সারাবার ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন সময় বাড়িতে হঠাৎ একজন অতিথি এসে হাজির। বেলা প্রায় তখন বারোটা– দরজার কড়া নড়ে উঠলো। যেদিনকার ঘটনা বলছি, সেদিন আমার জ্বর ছিল না। আমিই গিয়ে দরজা খুললুম। বুড়ো মতন একটি লোক, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে পুঁটলি, গায়ে আধময়লা সাদা হাফসার্ট, পরনের ধুতিটাও আধময়লা, পায়ে সস্তা হাওয়াই চটি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কাঁচায়-পাকায় মেশানো। বললেন, রতন আছে ? রতন মুখোজ্যে ?

রতন আমার বাবার নাম। আমার মুখে 'বাড়ি নেই' শুনে দমলেন না, ছাতা মুড়ে ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকতে ঢুকতে বললেন,–তা হোক, তোমরা তো তার ছেলেমেয়ে ? মুখের আদল দেখেই বোঝা যায়। তা আমার বৌমা কোথায় ? তোমার মা ? বলো গিয়ে, আমি তোমাদের জ্যেঠা হই, গ্রাম থেকে এসেছি।

আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মার হয় নি। মা সেই ভাত জ্যেঠাকে বেড়ে দিলো দেখলাম। ডাল, আলুভাজা আর ট্যাঁড়শের তরকারি। জ্যেঠামশাই খুব তৃপ্তি করেই খেলেন। কিন্তু মা যে উপোসী রইলো সেটা তিনি জানতেও পারলেন না। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বাইরের ঘরের তক্তপোশের ওপর মেলে-দেওয়া ছেঁড়া শতরঞ্জিটার ওপর শুয়ে পাশের ঘরে দরজার-আড়ালে-থাকা আমার মায়ের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, বুঝলে বৌমা, গ্রাম-সুবাদে রতনের আমি দাদা হই। একটা মামলার ব্যাপারে হাওড়া কোর্টে এসেছিলুম, তা বললে, তিনটের পর আসবেন, তার আগে আর কাজ হবে না। তাই কী করি ? তোমাদের কথা মনে পড়লো, তাই চলে এলুম, একটু পরেই চলে যাব। রতন কখন আসবে ? কারখানা থেকে ?

মা দরজার আড়াল থেকেই বললে, রাত হয়ে যাবে আসতে।

উনি বললেন –ঈস ! দেখাটা হবে না ! এতদূর থেকে এলুম বাসের মাথায় চড়ে, তা-ও গুড়ের নাগরির মতো মাথা ঠোকাঠুকি করতে করতে !

মা বললে –কোনো বিশেষ দরকার আছে ?

–না না দরকার কিছু নেই ! এমনি জিজ্ঞেস করছিলুম ভালো আছে তো ?

মা কিছু বললো না, কিন্তু আমি আর থাকতে পারলুম না, বলে উঠলুম –বাবার চাকরি নেই !

–কী বললে ! ভদ্রলোক হুড়মুড় করে একেবারে উঠে বসলেন –চাকরি নেই তাহলে চলছে কী করে ?

ছোট বোনটা মার কাছে ছিল, তাই সে কোনো সাড় দিলো না, কাছে থাকলে ওঁর কথায় কী যে বলে বসতো কে জানে ! হয়ত বলে বসতো –মা নিজের ভাত আপনাকে বেড়ে দিয়ে উপোস করে রইলো, তা জানেন ?

কিন্তু আমি 'লায়েক হয়েছি' কিনা তাই ও-কথাটা মনে এলেও মুখে বলতে পারলুম না ! 'চাকরি নেই' এই কথাটাই একটু বেশি বলে ফেলেছি, মা হয়তো পরে এ জন্য আমাকে ধমকাবে !

ভদ্রলোক চুপ করে বসে কী যেন ভাবছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলে বললেন –সেই কবে এসেছিলুম ! তখন রতনের বিয়েও হয় নি। আচ্ছা, তোমাদের বাড়ির পিছনে একটা কদম্ব-গাছ ছিল না ?

মা দরজার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মা কথা না বলায় উত্তর দিলুম আমি –গত বছর গাছটাকে কেটে ফেলেছে !

–কেটে ফেলেছে !

–হ্যাঁ–খন্ড খন্ড করে কাঠগুলো বিক্রি করে দিয়েছে ওরা !

–ঈস ! দারুণ ছিল গাছটা ! এখনো মনে পড়ে ! কতো পাখী আসতো, তাই না ?

বললাম –পাখী ? লেখাজোখা নেই ! জানেন, বুকা টকটকে লাল এমন পাখীও আমি দেখেছি ! আমি নাম দিয়েছিলাম–'রবিন রেডব্রেস্ট' ! আমাদের বইয়ে রবিন রেডব্রেস্টের কথা আছে কিনা !

–আর কদম্ব ফুল ?

বললাম –বর্ষা আসতে না আসতেই সারা গাছটা ফুলে ছেয়ে যেতো ! জানেন, ফুলের কতো রেণু এসে আমাদের বাড়িতে পড়তো ! কেমন একটা গন্ধ পেতাম আমরা সারা বাড়ি জুড়ে !

–ফুল পাড়তে না ?

–না, আমরা পাড়তুম না ! যাদের বাড়ি তাদের ছেলেরা পাড়তে উঠলে কিছু ফুল আমাদের দিয়ে যেতো।

–আহা ! কদম্ব ফুল বড়ো সুন্দর ! দেখলে মনে হয় সারা গাছ জুড়ে তারা হাসছে !

বলে উঠলাম –ঠিক বলেছেন ! ও বোধহয় জানতে পেরেছিল, ওরা ওকে কাটবে, তাই গত বছর প্রথম বর্ষায় এতো ফুল ফুটেছিল যে কী বলবো ! প্রায় প্রত্যেক ছোট ডালে আর পাতার আড়ালে নিজেকে অর্ধেক লুকিয়ে যেন মিটিমিটি হাসছে ! সেই ওর শেষ হাসি, জানেন ?

ভদ্রলোক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপরে উঠলেন, পুঁটলি আর ছাতাটি নিলেন, একটু উঁচু গলায় মার উদ্দেশ্যে বললেন,–যাই বউমা, শিবপুর থেকে হাওড়া কোর্ট কম দূর নয় ! সারাটা রাস্তাই পায়দলে যেতে হবে !

এই বলে দরজার বাইরে গিয়ে আমাকে ডাকলেন, বললেন –বাবাকে বোলো। গ্রাম থেকে বিশ্বেশ্বর জ্যেঠা এসেছিল, বললেই সে বুঝবে। আর এই নাও, এই টাকাটা রাখো, মার হাতে তুলে দিয়ো, কেমন ?

আমি নেবো না, তবু জোর করে উনি আমার হাতে গুঁজে দিলেন এক টাকার একটা নোট। বললেন, এ আর কী ! তপ্ত বালিতে এক ফোঁটা জল ! কিন্তু বাবা, তোমাকে একটা কথা বলে যাই। এ-দুঃখের দিন তোমাদের কাটলো বলে ! আমি গাঁয়ে গঞ্জে পুজো আচ্চা করে বেড়াই, বামুনের ছেলে, খুব বড়ো বামুনই বটে, আমার বাপ ছিলেন তখনকার দিনের ডাকসাইটে পূজুরী–তারপরে কোষ্ঠী বলো, হাত-দেখা বলো –সব তাতেই সিদ্ধ হস্ত, যাকে যা গলার জোর দিয়ে বলতেন, ঠিক মিলে যেতো ! আমি তাঁর অধম সন্তান, এক কানাকড়িও পাই নি, কিন্তু তবু আমি বলে যাচ্ছি, তোমাদের বাড়িতে শীগগিরই কেউ আসবে, আর সেদিন থেকে তোমাদের অবস্থা ফিরতে আরম্ভ করবে ! তুমি দেখে নিয়ো !

বলে, তিনি ছাতাটা খুলে বড়ো-বড়ো পা ফেলে রাস্তায় পড়ে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন !

সেদিন অনেক রাত্রে বাবা ফিরেছিলেন। আমি ও সব কথা বললাম না, কারণ, বাবা বিশ্বাস করবেন না, ঐসব পুজো-আচ্চা-কোষ্ঠী-হাত-দেখা, এসবে বাবার বিশ্বাস নেই ! কিন্তু মা যখন বিশ্বেশ্বর জ্যেঠার কথা তুললে, তখন চিনতে পারলেন বাবা, বললেন –সেটা এসেছিল কী করতে ! সাতকুলে কেউ নেই, এখন বুজরুকি টুজরুগি করে এর-ওর-তার কাছে হাত পেতে দিন চালায় ! মা বললে –খোকার হাতে এক টাকা দিয়ে গেছে !

বাবা একটু অবাক হলেন, বললেন –সে কী ! ওর হাত দিয়ে যে জলের ফোঁটাটুকুও গলে না ! যাই হোক, আর আসবে না মনে হয়, এলে কোনোরকম পাত্তা দিয়ো না !

মা লক্ষ্মী এসেছো যখন থাকো, আমার ছেলেমেয়েরা যেন একটু সুখের মুখ দেখে।

বাবা কোথাও থেকে কিছু চাল আর কিছু টাকা এনেছিলেন, তাই দিন চার পাঁচ কোনরকমে কাটলো। কিন্তু আমার মনে ঐ একটাই ধুনি রীণ্ রীণ্ করে বাজছিল –তোমাদের বাড়িতে শীগগিরই কেউ আসবে, আর সেদিন থেকে তোমাদের অবস্থা ফিরতে আরম্ভ করবে!

কথাটা মাকে বলি নি, কী জানি মা-ও যদি বাবার মতো কথাটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়! আমি বলেছিলুম আমার ছোট বোনকে। সে কথাটা তেমন বোঝে নি, বা গায়েও মাখে নি, নইলে মার কানে ঠিক গুজগুজ করে লাগিয়ে দিতো! আমার অবস্থা হয়েছিল কিন্তু অন্যরকম। বাড়ি ছেড়ে বড়ো একটা বেরুতে ইচ্ছে করতো না। নেহাৎ স্কুলে না গেলেই নয়, তাই যেতুম, আর বাড়ি ফিরেই খোঁজ নিতুম বোনের কাছে –কেউ এসেছিল রে!

ও একা একা তখন এক্কা-দোক্কা খেলায় ব্যস্ত, খেলতে খেলতেই বললে –কে আবার আসবে! কেউ না!

দিন যায়, সত্যিই কেউ আসে না। আমাদের অবস্থা তখন আরও খারাপের দিকে, বাবা ধার-ধোর করে যা-কিছু আনতেন, তা-ও আনতে পারছেন না! মা আমাকেও লুকিয়ে থালা-বাটি, এইসব কাপড়ের আড়াল দিয়ে নিয়ে চলে যায়, বিক্রি করে চাল-ডাল নিয়ে আসে, তাই দিয়ে কোনরকমে আমাদের পেট চলে। ওসব দেখে আমার এখন মনে হয়, ঐ বিশ্বেশ্বর জ্যেঠা বাজে কথা বলে গিয়েছিল, বাবা যা বলে তা ঠিকই–সবই তাঁর বুজরুকি! এইবার যদি কখনো আসেন, তাহলে মুখের ওপর বলে দেবো, মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পান নি! বুজরুক কোথাকার!

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরেছি, খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে, তবু কিছু বলছি না, যদি মা বলে, ঘরে কিছু নেই? কিন্তু না, রান্নাঘরের কোণে জল-দেওয়া ভাত রেখে দিয়েছিল মা, খানিকটা খেয়েছিল বোন খানিকটা ছিল আমার জন্য। বাড়িতে একটা পাতিলেবু গাছ ছিল, তাতে লেবু হয় না, কিন্তু তার পাতা জল-ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে আমাদের ভালো লাগে! বোনকে বললাম –এই যা তো ছিঁড়ে নিয়ে আয় তো দুটো লেবু পাতা!

'এই যাচ্ছি,' বলে বোন যেমন অনেক সময় নাচতে নাচতে দৌড়য়, তেমনি করে দৌড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসে বললো –এই দাদা শীগ্‌গির আয়! লেবু গাছের নিচে একটা বক এসে বসে আছে!

–বক!

–হ্যাঁ রে–ধবধবে সাদা–দেখবি আয়?

ততক্ষণে ভাতের গ্রাস দুটো-একটা পেটে পড়েছিল, সেই অবস্থায় এঁটো হাতে ছুটে গেলাম লেবুতলায়! তাকিয়ে দেখি মিথ্যে বলে নি বোনটা, ধবধবে একটা বক এসে বসে আছে লেবু গাছটির গোড়ায়, ওখানটা ছায়া-ছায়া ঠান্ডা। আমরা দুজনে উঁকি-ঝুঁকি মারছি, বকটা কিন্তু উড়ে যাচ্ছে না, চুপ করে শিকড় ঘেঁষে বসে আছে! আমাদের উত্তেজনা আর দৌড়োদৌড়ি দেখে মারও মনে কী যেন হলো, বললো –কী রে? কী হয়েছে?

ছোট বোন বললো –ওমা! দেখো না এসে! কী সুন্দর একটা বক!

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো আঁচলে হাত মুছতে মুছতে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে-দেখতে বললে –ওমা! কোথা যাবো গো! এ-তো বক নয়!

–তবে?

–এ যে প্যাঁচা! লক্ষ্মীপ্যাঁচা! চেঁচামেচি শুনে প্যাঁচাটা আমাদের দিকে মুখ ফেরালো। সে দাঁড়িয়েছিল পাশ ফিরে, তার মুখখানা আমরা আগে দেখতে পাই নি। এবারে স্পষ্ট দেখলুম। কপালে লাল-লাল ছাপ। রক্ত পড়ছে নাকি? মা একটু এগিয়ে গেল। প্যাঁচাটা শিকড়ের অন্য ধারে যাবার চেষ্টা করলো। জায়গাটা একটু ছায়া-ছায়া বটে, কিন্তু তখনো-রীতিমতো রয়েছে দিনের আলো। আমি জানতুম, দিনের বেলা ওরা দেখতে পায় না! বেলা আরও গড়িয়ে সন্ধ্যা আসুক, প্যাঁচা ঠিক উড়ে চলে যাবে! কিন্তু মাথায় চক-চকে ওটা কী? রক্ত?

মা ভালো করে দেখে নিয়ে বললে –না রে রক্ত নয়, কারা ধ্যাবড়া করে খানিক সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে!

ছোট বোন টুনকি বললে –কারা মা?

মা বললে –বোধহয় কেউ পুষে ছিল! পালিয়ে এসেছে।

বলে উঠলাম –ধরবো মা?

মা বললে –ওরে না–ধরতে যাস না–কামড়ে দিতে পারে! দাঁড়া, আমি কটা চাল নিয়ে আসি। হয়ত খেতে পারে।

টুনকি বললে –পুষবে মা?

মা বললেন –পোষ মানে, তবে তো?

বলে মা ছুটলো রান্নাঘরের দিকে। আমার মনে পড়ছিল বিশ্বেশ্বর জ্যেঠার কথা। কেউ একজন আসবে তোমাদের বাড়িতে, অবস্থাও ফিরতে আরম্ভ করবে! এই তো এসেছে লক্ষ্মীপ্যাঁচা! লক্ষ্মীপ্যাঁচা আসা তো ভালো! কোথায় কার কাছে কথাগুলো শুনেছিলাম মনে নেই, যে বুড়ি-ঠাকুমা বছর দুই আগে মারা গেল, সেই

ঠাকুমাই কথাটা বলেছিল কী! ঠিক মনে করতে পারছি না। কিন্তু যে-ই বলে থাকুক, জ্যেঠার কথা তো আর মিথ্যে হলো না! ঠিক এসে উপস্থিত হলো একজন! কিন্তু এলো বটে, যদি চলে যায়? সন্ধ্যা হবার মুখেই যদি ডানা মেলে উড়ে চলে যায়? তাহলে আমাদের অবস্থা ফিরবে কী করে?

মা এক মুঠো চাল এনে ওর কাছে ছড়িয়ে দিলো, ওর অত কাছে মাকে দেখে একটু সরে বসলো। মা ফিরে এলো সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু প্যাঁচাটা চালে একটুও মুখ দিলে না। মা আমাকে বললো—হ্যাঁ রে, ওরা চাল খায় তো?

—কে জানে!

টুনকি বললে—মা, বাড়িতে প্যাঁচা এলে কী হয়?

মা উত্তর দিলে—যা-তা প্যাঁচা নয়, লক্ষ্মীপ্যাঁচা আসা চাই! তাহলে লক্ষ্মী নিজে আসেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তোর বাবাকে এসব কথা বলার জো নেই। সে অন্য ধাতের মানুষ। এ-সব কথায় বিশ্বাস করবে না।

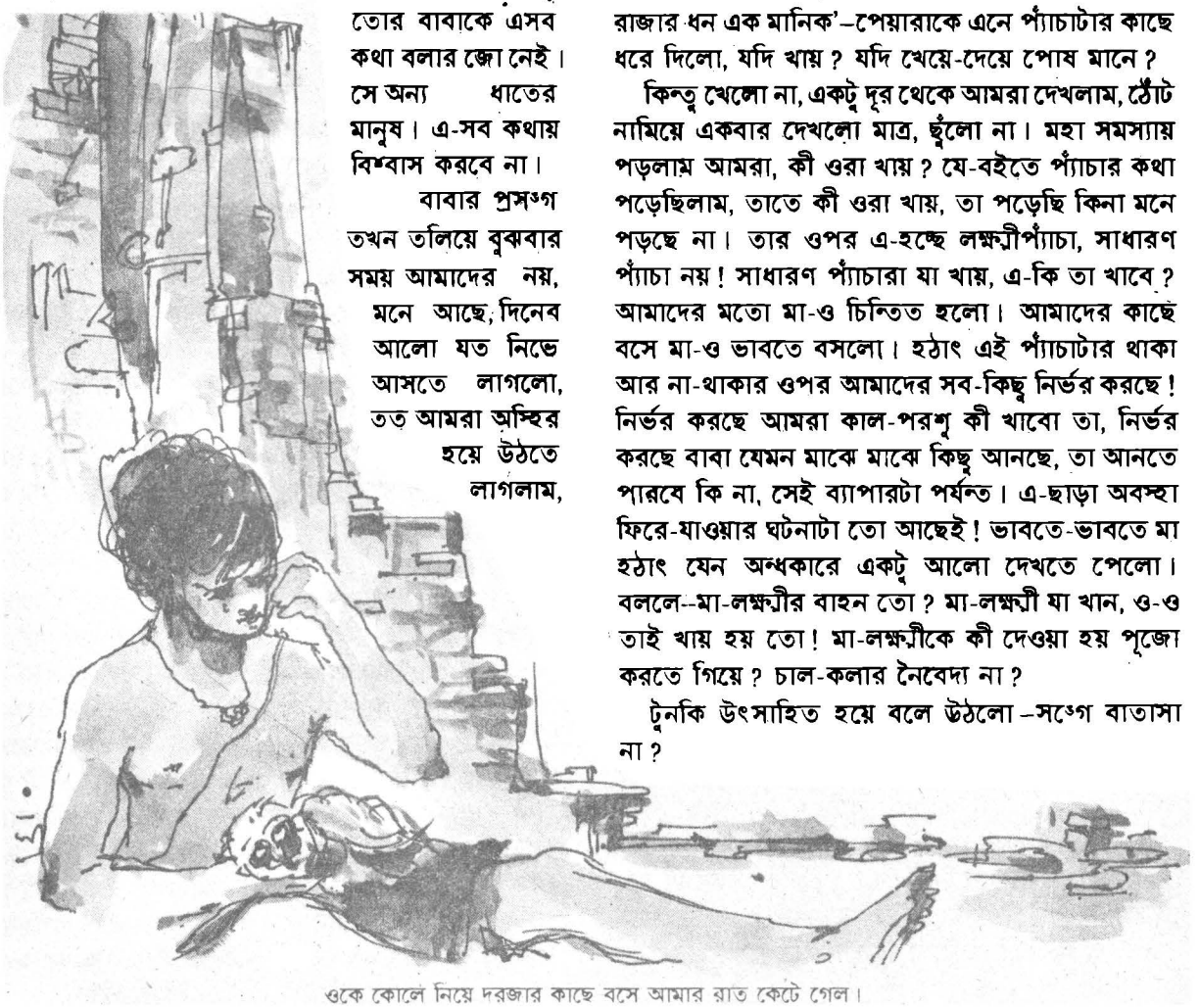

ওকে কোলে নিয়ে দরজার কাছে বসে আমার রাত কেটে গেল।

বাবার প্রসঙ্গ তখন তলিয়ে বুঝবার সময় আমাদের নয়, মনে আছে, দিনের আলো যত নিভে আসতে লাগলো, তত আমরা অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম, এইবার যদি ডানা মেলে উড়ে চলে যায়! ওরা দিনের বেলা প্রখর আলোয় দেখতে পায় না, এটা যেন কোন এক বইতে পড়েছিলাম, কিন্তু রাত্রি হলে? তখন তো ওরা সব দেখতে পায়! তখন নির্ঘাৎ উড়ে চলে যাবে, আমাদের বাড়ি আর থাকবে না! আর, যদি না থাকে, তাহলে আমাদের অবস্থা ফিরবে কী করে? বেশি কিছু চাই না, বাবার যখন চাকরি ছিল, তখনকার মতো খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড় থাকলেই আমরা খুশি! আর মাকে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করতে ছুটতে না হয়, আমাদের মুখে দু-মুঠো ভাত জুগিয়ে দেবার জন্য! আমরা দু-ভাই বোনে কাছেই ঠায় বসে আছি! টুনকি একটা পেয়ারা পেয়েছিল কার কাছ থেকে যেন, সেটি তার অতি যত্নের জিনিস, লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল নিজে খাবে বলে, আমাকেও জানায় নি, যদি ভাগ বসাই? সেই তার 'সাত রাজার ধন এক মানিক'—পেয়ারাকে এনে প্যাঁচাটার কাছে ধরে দিলো, যদি খায়? যদি খেয়ে-দেয়ে পোষ মানে?

কিন্তু খেলো না, একটু দূর থেকে আমরা দেখলাম, ঠোঁট নামিয়ে একবার দেখলো মাত্র, ছুঁলো না। মহা সমস্যায় পড়লাম আমরা, কী ওরা খায়? যে-বইতে প্যাঁচার কথা পড়েছিলাম, তাতে কী ওরা খায়, তা পড়েছি কিনা মনে পড়ছে না। তার ওপর এ-হচ্ছে লক্ষ্মীপ্যাঁচা, সাধারণ প্যাঁচা নয়! সাধারণ প্যাঁচারা যা খায়, এ-কি তা খাবে? আমাদের মতো মা-ও চিন্তিত হলো। আমাদের কাছে বসে মা-ও ভাবতে বসলো। হঠাৎ এই প্যাঁচাটার থাকা আর না-থাকার ওপর আমাদের সব-কিছু নির্ভর করছে! নির্ভর করছে আমরা কাল-পরশু কী খাবো তা, নির্ভর করছে বাবা যেমন মাঝে মাঝে কিছু আনছে, তা আনতে পারবে কি না, সেই ব্যাপারটা পর্যন্ত। এ-ছাড়া অবস্থা ফিরে-যাওয়ার ঘটনাটা তো আছেই! ভাবতে-ভাবতে মা হঠাৎ যেন অন্ধকারে একটু আলো দেখতে পেলো। বললে—মা-লক্ষ্মীর বাহন তো? মা-লক্ষ্মী যা খান, ও-ও তাই খায় হয় তো! মা-লক্ষ্মীকে কী দেওয়া হয় পূজো করতে গিয়ে? চাল-কলার নৈবেদ্য না?

টুনকি উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো—সঙ্গে বাতাসা না?

–ঠিক–মা বললে–দৌড়ে দোকানে যা কুড়ি পয়সা আছে আমার কাছে, কুড়ি পয়সায় যা বাতাসা দেয়, তাই নিয়ে আয়!

সঙ্গে সঙ্গে টুনকি ছুটলো। আমি বললাম–কলা যদি থাকতো তো, বেশ হতো, না?

–তা তো হতো, কিন্তু পাবো কোথায়?

যাই হোক, টুনকি ছুটে গিয়ে ছুটে ফিরে এলো, কিন্তু মা-লক্ষ্মীর বাহন বাতাসাও ছুঁলেন না। আমি বললাম–মা, ওর পেট বোধহয় ভর্তি, তাই এখন কিছু খাচ্ছে না। পরে খাবে'খন।

মা আর কিছু বললো না। ওদিকে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এলো। এইবার তো ও ভালো দেখতে পাবে, এইবার যদি ও উড়ে পালায়? তাই, মা ভিতরে চলে যাবার পরই মাথায় মতলবটা এলো। যে-করেই হোক, ওকে ধরতে হবে। যদি নোখ বা ঠোঁট দিয়ে একটু আঁচড়ে-টাঁচড়ে দেয় তো, দিক। এই ভেবে হঠাৎ ছুটে গিয়ে ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, ওর পালকে আমার হাত লাগলো বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওটা ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে যে কোনদিকে উড়ে পালিয়ে গেলো, বুঝতে পারলাম না। টুনকি গিয়ে মাকে খবরটা দিতেই মা বেরিয়ে এসে ওকে না দেখতে পেয়ে হায়-হায় করে উঠলো, বললে–দিলি তো? দিলি তো উড়িয়ে? এখন কী হবে? এরপর খাবি কী? যদি বা একটু ভরসা হয়েছিল, তাও গেল।

আমি তখন নিজেকে সত্যিই অপরাধী ভাবছিলাম। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। টুনকি বললে,–মা, পাশের বাড়িতে দেখবো? যদি পাঁচিলের ওপারে গিয়ে পড়ে থাকে?

মা বললে, থাকলে কি আর ওরা কাউকে বলবে? ঠিক ধরে নিয়ে ভেতরে পুরেছে! লক্ষ্মীর বাহন মানে একরকম দেবতাই। মনে কর আমরা দেবতাই পেয়েছিলাম, এ-পাওয়ার কথা কাউকে বলতে নেই। আর পেয়ে যে হারালাম, একথাও কাউকে বলার দরকার নেই। লোকে টিট্‌কারি দিয়ে হাসবে!

মা ভিতরে গেল, টুনকিও গেল সঙ্গে সঙ্গে। আমি ওদের অলক্ষ্যে চট্‌ করে একবার বাইরে গিয়ে আমাদের পাঁচিলের ওপারে পাশের বাড়ির চৌহদ্দির দিকে তাকালাম, গলিতে কেউ নেই, একদম ফাঁকা! ওরা যদি পেয়ে থাকে, ভিতরে নিয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, ভিতরে নিয়ে যাওয়া অমনি সোজা? ধরতে গেলে ডানা ঝটপট করে পালিয়ে যাবে না? যেমন আমার হাতে পালিয়ে গেল! এইবার মনে হলো, উড়ে কোথাও চলে গেছে। আচ্ছা, ছাদে যায় নি তো? পরক্ষণেই ছুটে ছাদে গেলাম, না, কোনো হদিশই নেই মা-লক্ষ্মীর বাহনটির! পাশের বাড়ির ছোট ছেলেটা এরই মধ্যে পড়তে বসেছে, প্রথম দিকে ও খানিকক্ষণ চেঁচিয়ে পড়ে, তারপর চুপ হয়ে যায়! ওদের বাড়ি প্যাঁচা গেলে ছেলেটি কি অমন নিশ্চিন্তে এখুনি পড়তে বসতে পারতো? তাহলে বোঝা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ওদের বাড়ি যায় নি। গেছে অন্য দিকে। সন্ধ্যের পর চোখে যখন দেখতে পেয়েছে, তখন যে-কোনো দিকে উড়ে যেতে পারে! আমাদের পিছন দিকে যে কদম গাছটা ছিল, সেটা থাকলে তাতে গিয়ে ঠিক আশ্রয় নিতো! নিলে, অন্ততঃ এই দুটি চোখে ওকে দেখতে পেতাম! না, কাছাকাছি কোথাও নেই, ঐ দূরে একটি ঝাঁকড়া গাছ দেখা যাচ্ছে, হয়ত ঐখানে গিয়ে হাজির হয়েছে! কিন্তু ওখানে কাকেদের বাসা, তারা 'কা-কা' করে উঠতো না, নতুন কোনো ভিন্‌ জাতের আগন্তুককে দেখলে? অবশ্য রাত হয়ে গেছে, এখন আবার বোধহয় কাকেরাও দেখতে পাবে না।

মন খুব খারাপ করে শুয়ে রইলাম। মা আর বোন কেউ কোনো কথা বলছে না, এ-জন্য আরও খারাপ লাগছে। খাওয়ার সময় নীরবেই কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম, অনেক রাত্রে বাবা ফিরে এলেন টের পেলাম, কিন্তু মা যে তাঁকে প্যাঁচার কথা বলে নি, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। পরদিন সকালেও বাবাকে মা কিছু বললো না, বাবা চা খেয়ে যেমন বেরিয়ে যান, তেমনি বেরিয়ে গেলেন। আমি বই নিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু পড়ায় মন ছিল না, এমন সময় হঠাৎ টুনকির কথায় চকিত হয়ে উঠলাম। টুনকি গিয়ে রান্নাঘরে মাকে খবর দিলো–কোথাও সে যায় নি, দেখবে এসো, শোবার ঘরে? খাটের নিচে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে!

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম আমরা। খাটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, গুঁড়ি মেরে একটু এগিয়ে গেলেই ওকে ধরা যায়। কিন্তু মার প্রচন্ড ধমক–খবরদার! ওকে ধরতে যাবি না!

বলতে বলতে মা গড় হয়ে প্রণাম করলো মেঝেতে–মা-লক্ষ্মী, এসেছো যখন থাকো, আমার ছেলেমেয়েরা যেন একটু সুখের মুখ দেখে।

বলতে-বলতে মায়ের গলা ধরে এলো, চোখে এলো জল। চোখ মুছে মা বললো–ওকে আর ঘাঁটাস নি, তোরা ভাত খেয়ে ইস্কুলে যা। ওকে আমি দেখবো।

কিন্তু ইস্কুলে কি মন বসে? তবে, আমাদের বাড়ির 'গোপন কথা' কাউকে বলি নি, বাড়ি এসে শুনলাম, টুনকিও

বলে নি। বিকেল শেষ হয়ে যখন সন্ধ্যের মুখোমুখি, তখন একটা ব্যাপার দেখে আমরা চমকে উঠলাম। প্যাঁচাটা ঘর থেকে কখন বেরিয়ে এসেছে, তা জানি না, দেখি গলির মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকালো, কিন্তু পালালো না। আমরা একটু সরে গিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ও আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো। এইবার চোখে পড়লো, ওর একটা পা ভাঙা। কেউ হয়ত ঢিল-মেরে ভেঙে দিয়েছে! অতি কষ্টে ও হাঁটছে, দেখে আমাদের মন কেমন করে উঠলো। মা বললে—আহা! কে এমন করেছে গো! দেবতাকে এমন হেনস্থা? ধর্মে সইবে?

কিন্তু কোথায় ও যেতে চায়? দেখলাম, আস্তে আস্তে কোনক্রমে ও হেঁটে আমাদের বাথরুমের জল যে ঝাঁঝরিতে পড়ে, সেখানে একটি খাড়া-করা ইঁটের ওপর দাঁড়ালো। মুখ নিচু করে দেখতে লাগলো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, সব-কিছু প্রায় ঝাপসা, আমরা কিন্তু তখনো ওকে দেখছি। একসময় দেখলাম, হঠাৎ মুখ নিচু করে কী যেন ও ধরলো। মুখ তুলতেই স্পষ্ট দেখলাম, ওর ঠোঁটে একটি আরশোলা!

মা বললে—ইস্!

টুনকি ফিসফিস করে বললো—এ মা! আরশোলা খায়! বললাম—তা খাক। আমাদের আর হ্যাংগামা রইলো না—আরশোলা ধরবে আর খাবে। বুঝলে মা, খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তাই খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে!

আমরা ওকে ঝাঁঝরির কাছে রেখে চলে এলাম। রাত্রে টর্চ নিয়ে একবার বেরিয়ে ছিলাম। আমাদের বাড়ির আরেক দিকে চৌহদ্দির ভিতরে যে চার ফুট গলি আছে, তার এক পাশে আমাদের বাড়ির সিঁড়ির দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটি নক্সা মতন করা ছিল খাঁজ কেটে। ওখানে টুনকি খেলতো মাঝে মাঝে পুতুল নিয়ে। টুনকি একটা আলগা ইঁট দিয়ে ঐ খাঁজে একটি ঘর বা খুপরি মতন করেছিল। খুপরি—কিন্তু ছাদ নেই—গিয়ে দেখি মা-লক্ষ্মীর বাহন সেখানে গিয়ে আস্তানা নিয়েছে। টর্চের আলো আচমকা ওর মুখে-চোখে পড়তে ওর চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল! ভাবলাম, এই সেরেছে! আবার বুঝি পালায়! এবার পালালে মা আর আমাকে আস্ত রাখবে না! লক্ষ্মীর ছবির সামনে মা যে আজ কতোবার গড় হয়ে প্রণাম করেছে তার ঠিক নেই! বলেছে—এসেছো যখন আর যেয়ো না, অচঞ্চলা হয়ে থাকো। এ-কষ্ট যে আর সইতে পারছি না!

বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল মা।

যাই হোক, খুব ভোরে—রাত থাকতে—উঠে দেখি, সে তার কোটরে নেই। গেল কোথায়? খুঁজতে গিয়ে দেখি সেই ঝাঁঝরির কাছে বসে আছে আরশোলার আশায়। গোল মুখখানা ফিরিয়ে আমায় দেখলো, কিন্তু দেখে ভয় পেয়ে ঝটপট করলো না বসেই রইলো। আমি চলে এলাম। অনেক পরে, বাবা বেরিয়ে যাবার পরে, গিয়ে দেখি ঝাঁঝরিতে সে নেই, ফিরে এসেছে কোটরে! চুপ করে বসে আছে। আমি আর দাঁড়ালাম না, ঘরে গিয়ে পড়তে বসলাম। যথাসময়ে ইস্কুলে গেলাম, যাবার সময়ও দেখা পেলাম, সে তার জায়গায় ঠিক বসে আছে! সেদিন কিজন্য যেন স্কুলে দু-পিরিয়ডের পর ছুটি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। দেখি, মুখ নিচু করে ঠায় বসে আছে সে। কী মনে হলো, কাছে গিয়ে আস্তে ওর গায়ে হাত রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো, ঠোঁট বাগিয়ে কামড়াতে এলো না, বা পা তুলে নোখ বসালো না। দুটি চোখ মেলে আমাকে শুধু দেখলো। ঠিক মনে হলো, একেবারে বাচ্চাদের মতো চোখ! টুনকি যখন ছোট ছিল, মার কোলে শুয়ে থাকতো, তখন ওর চোখ ছিল ঠিক এই রকম! কিন্তু এর চোখে যা দেখলাম, তাতে বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠলো। দুটি চোখে ভর্তি বেদনার ছাপ! কতো ব্যথা যেন রয়েছে ঐ-পাখীটার বুকে, সেই ব্যথাই ফুটে উঠলো দুটি চোখে! আজ তার কাহিনী বলতে গিয়ে একটুও মিথ্যে কথা বলছি না, বা এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলছি না, যা বলছি সব আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে! ওই ব্যথাতুর চোখের দৃষ্টি যদি মা দেখতে পেতো, তাহলে বোধহয় কেঁদে ভাসিয়ে দিতো!

আমি সরে এলাম। টুনকি তখনো ইস্কুল থেকে আসে নি, মাকে কিছু বললাম না, আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে আবার গেলাম। তেমনি মুখ নিচু করে বসে আছে, কিন্তু রোদ্দুর এসে পড়েছে ওর গায়ে। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে! আস্তে আস্তে আবার হাত দিলাম। কিন্তু সুন্দর তুলোর মতো নরম ওর পাখনা! ও মুখ তুলে আবার আমার দিকে তাকালো। সেই স্বচ্ছ ছোট্ট দুটি চোখে প্রচন্ড একটা কষ্টের ছাপ! গভীর ওর দুঃখ, কিন্তু ও বলতে পারছে না। শুধু এটুকু বুঝেছে, আমরা ওর বন্ধু, আমরা ওর কোনো ক্ষতি করবো না। প্রথম দিন হক্‌চকিয়ে গিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে ঘরে ঢুকে খাটের তলায় আশ্রয় নিলেও এখন তাই আর পালাতে চেষ্টা করছে না! অবশ্যি মা বা টুনকি ওর গায়ে হাত দেয় না, গায়ে হাত দিচ্ছি আমিই শুধু!

আমার এবার মনে হলো, রোদ্দুরে ওর কষ্ট হচ্ছে। ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে আবার খাটের নিচে রাখলে কেমন হয়? কিন্তু খাটের নিচে আমাদের রাজ্যের জিনিস থাকে, মা বা টুনকি অনবরত ওখানে গিয়ে কখনো চাল নিচ্ছে, কখনো ডাল নিচ্ছে (অবশ্য যখন থাকে), কখনো বা চায়ের গুঁড়ো নিচ্ছে—এসব হতে থাকলে ও অস্বস্তি বোধ করতে পারে। এইখানে একটা কথাও বলা দরকার, আমাদের বাড়িতে বেড়াল না থাকলেও আশপাশের বাড়ির বেড়ালেরা আমাদের দেওয়াল দিয়ে যাতায়াত করে, রাত্রে আমাদের রান্নাঘরেও হানা দেয়, কখনো-কখনো দেওয়ালে বা গলিতে দুই বেড়ালে মুখোমুখি হয়ে দারুণ ঝগড়া করে, তারা নিশ্চয়ই যাতায়াত করেছে যথারীতি, কিন্তু প্যাঁচাটিকে ব্যতিব্যস্ত বোধহয় করতে যায় নি। তাহলে আমরা কেউ না কেউ টের পেতাম। আমি খুঁজে-পেতে একটা ভাঙা টালি নিয়ে এলাম, সেটা ওর খুপরীর ওপরে ছাদের মতো করে সাজিয়ে দিলাম। মনে হলো, ওর একটু আরাম হলো, আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো, আবার মুখ নিচু করে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়লো।

সেদিন সন্ধ্যার পর ওর খোঁজে বেরিয়েছি, ঠিক দেখি, ঝাঁঝরির ওপর বসে আছে, কাছে যেতেই মুখ ফিরিয়ে তাকালো। সেই ব্যথার একটা ছাপ। কী মনে হলো, ওর নরম পালকের ডানার ওপর হাত দিলাম। ধবধবে সাদা ডানা। ও কিছু বললো না। আমার ভরসা আরও বেড়ে গেল, ঠিক যেমন করে লোকে পায়রা ধরে, ঠিক তেমনি করে ওকে দু-হাতে তুলে নিলাম। ও কিছু বললো না, সামনের দিকে কপালে, ঠোঁটের গোড়ায় সিঁদুর মাখামাখি। পা-দুটিতে বড়ো-বড়ো নোখ, এখুনি আমাকে আঁচড়ে দিতে পারে, কিন্তু তা করলো না। আমি সাহস পেয়ে ওর পায়ে হাত দিলাম,একটা পা ভাঙা। শেষের অংশটা যেন কোন রকমে ঝুলে আছে। ওখানে ব্যান্ডেজ করে দিলে কেমন হয়? কাল ও কাজটা করা যাবে, এখন থাক। এই সব করতে গিয়ে আমার একটা হাত আলগা হয়েছিল, সেই ফাঁকে ওর ডানদিককার ডানাটা একটু মেলে ধরবার চেষ্টা করলো। মনে হলো, এখানেও কোনো মারাত্মক আঘাত ও পেয়ে থাকবে। আমাকে ও বোধহয় সেই আঘাতটা দেখাতে চাইছে। আমি ওর নরম গায়ে একটু হাত বুলিয়ে ঝাঁঝরিতে বসিয়ে দিলাম। এর মধ্যে ঝাঁঝরি থেকে একটা আরশোলা উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল, আমি ধাওয়া করে ধরে ওটা ওর মুখের সামনে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও ঠোঁট এগিয়ে দিয়ে খপ করে ওটা মুখে পুরে দিলো, তারপরে তাকালো আবার আমার দিকে, অর্থাৎ যেন বলতে চাইলো—আরও আছে?

কিন্তু সেদিন এদিক-ওদিক ঘুরে এক ব্যাটা আরশোলাকেও ধরতে পারলাম না। সকালে উঠে দেখি, মা ওর সামনে—একটু দূরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে—মা-লক্ষ্মী দয়া করো, আর যে সইতে পারি না মা!

আমি অলক্ষ্যে এ-দৃশ্য দেখলাম, মা চলে গেলে ওকে দু-হাতে তুলে নিলাম। ভালো করে দেখলাম, ডানারও মাঝখানে ডানাটা ভাঙা, বোধহয় ইঁট-পাটকেলই কেউ ছুঁড়ে মেরে থাকবে। আমি মাকে বলে চুন-হলুদ নিয়ে এসে ডানায় লাগালাম, ওর ভাঙা পায়ে মাখিয়ে একটা ছোট্ট ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম। মা বা টুনকি অবাক হয়ে আমার কান্ড দেখছিল। ওকে যখন কোটরে রাখলাম, তখন মা একেবারে হেসে-কেঁদে অস্থির—ওরে এ যে পোষ মেনে গেছে রে!

টুনকি বললে—আমি একটু গায়ে হাত দেবো, দাদা?

—না। আমি দেবো। আমাকে ও কিছু বলবে না। বন্ধুত্ব হয়ে গেছে কিনা! তোকে যদি আঁচড়ে দেয় বড়ো-বড়ো নোখ দিয়ে?

টুনকি ভয় পেয়ে বললে—না বাবা দরকার নেই!

—হুঁ—ওকে আমার ওপর ছেড়ে দে!

তা ওরা ছেড়ে দিলে কী হবে? পরদিন পায়রার মতো ওকে হাতে নিয়ে দেখি ব্যান্ডেজ খুলে গেছে, পা-টা যেমন নড়নড় করছিল তেমনি করছে, ডানার ভাঙা-জায়গাটা ঠিক তেমনিই আছে। আমি ব্যান্ডেজটা ওর পা থেকে খুলে ফেলে দিলাম। এটুকু বুঝলাম, পাড়ার ছেলেদের কান্ড! কারা ধরে মাথায় সিঁদুর দিয়েছিল, তারপরে যখন ও পালাচ্ছিল, তখন ঢিল মেরে মেরে ওকে শেষ করেছে! আমাদের বাড়িতে এসে যে ঠাঁই নিয়েছে, সেটা বোধহয় ওরা টের পায়নি, নইলে কেউ-না-কেউ এসে ঠিক হামলা করতো।

পরদিনও ঐ অবস্থা। আস্তে আস্তে এসে ও ঝাঁঝরিতে বসে, কটা আরশোলা পায়, তা-ও জানি না, তাতে ওর পেট ভরে কিনা তা-ও জানি না। তবে আমি ওকে দু-হাতের মধ্যে নিয়ে আদর করি, গায়ে হাত বুলাই, বড়ো কোমল দুটি চোখ মেলে আমায় দেখে, কিন্তু চোখ থেকে সেই ব্যথার ছাপ এখনো মুছে গেল না!

সেদিন রাত আটটায় একটা ঘটনা ঘটলো। এক ভারিক্কী চেহারার ভদ্রলোক এসে বাড়ির কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে দিলাম আমিই। বললেন—রতনবাবু আছেন?

—না।

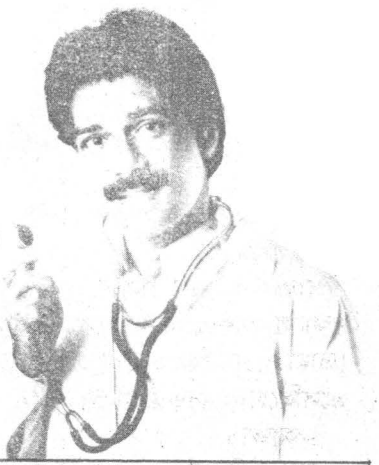

ভিটামিন

আমাদের
সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে
এদের প্রয়োজন
সবচেয়ে বেশি।

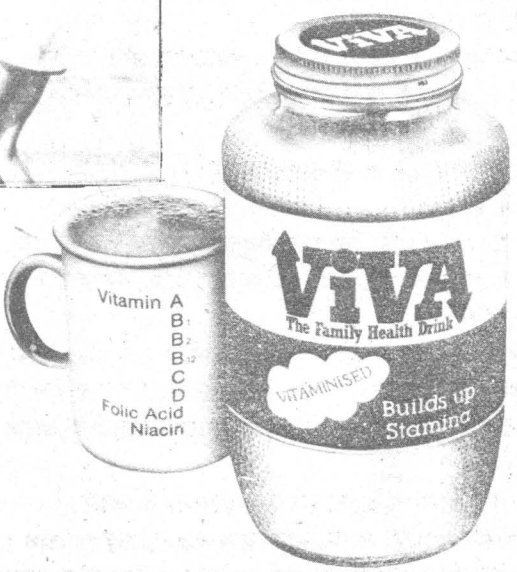

ভিভা ! আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিনে ভরপুর। গম, বার্লির মল্ট ও ক্রীমযুক্ত দুধে তৈরী। ভিভা নিমেষে গুলে যায় এবং সহজে হজম হয়। আর এই সমস্তর যোগফল....

স্ট্যামিনা—যা আপনাকে তরতাজা রাখে।

তাইতো লক্ষ লক্ষ পরিবারের পরম প্রিয় ভিভা। শক্তি ও স্ট্যামিনা যোগায়....সবসময়।

**"স্ট্যামিনা বজায় রাখো সদা
তোমার তুলনা নেই ভিভা !"**

JiL জগৎজিত ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেড

ASP/JIL-1/84 BENB

–এখনো ফেরেন নি ?

–ফিরতে রাত হয়।

–তুমি বুঝি তাঁর ছেলে ?

–হ্যাঁ।

–সরো, ঘরে একটু বসি। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও দেখি।

জল-টল খেয়ে তিনি চলে গেলেন, বললেন –কাল সকালে আবার আমি আসবো। আমি যতক্ষণ না আসি তোমার বাবা যেন না বেরোন! বলবে, সুভাষবাবু এসেছিলেন। সুভাষ মাইতি।

–আচ্ছা।

বাবার ফিরতে রাত হয়। সেদিন রাত হলো অনেক বেশি। মা বললে, কিছু পেয়েছো ?

বাবার মুখখানা বিমর্ষ। বললেন –নাঃ! আজ কিছুই পাই নি!

মা বললো –সর্বনাশ! দুটি চাল ছাড়া আর কিছু নেই– বড়োজোর ছেলেমেয়েদের হতে পারে!

বাবা চুপ করে রইলেন। মা হঠাৎ চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে উঠলো –মা-লক্ষ্মী, এ আমার কী করলে! তোমাকে কাছে পেলাম, তোমাকে এতো করে গড় করলাম!

বাবা ধমকে উঠলেন, খবরদার! ওসব মা-লক্ষ্মী-টক্ষ্মির নাম আমার কাছে করবে না! ও সব বুজরুকি!

মা শিউরে উঠলো কথাটা শুনে, হাতের কাছে টুনকিকে পেয়ে তার মাথাটা টেনে নিলো কোলের মধ্যে, বলে উঠলো –বালাই! ষাট্!

এই সময় আমি কথাটা বললাম, সুভাষ মাইতির কথাটা। শুনে বাবা যেন লাফিয়ে উঠলেন, বললেন,– বলিস কী রে ?

–কাল সকালে আসবেন বলেছেন!

–সে কী!

বাবা যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মা আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলো –কে ভদ্রলোক ?

বাবা বলে উঠলেন–উরে বাবা! বিরাট নেতা আমাদের লীডার–দিল্লী গিয়েছিলেন কাজে। তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন –কী যেন বললি ? সকালে আসবেন ?

–হ্যাঁ। থাকতে বলেছেন, যতক্ষণ না আসেন।

পরদিন সকালে আমি আমার বন্ধুর খোঁজে গেলাম। কোটরের মধ্যে যেমন মুখ নিচু করে বসে থাকে, তেমনি বসে আছে! হাতে নিয়ে আদর করলাম, তেমনি স্বচ্ছ দুটি চোখ মেলে তাকালো, সে চোখে তখনো ব্যথার ছাপ! ও কথা বলতে পারে না, পারলে নিশ্চয়ই আমাকে বলতো ওর দুঃখের কথা–নির্যাতনের কথা!

সকাল আটটার মধ্যে সেই বড়ো নেতা– সুভাষবাবু এলেন। কী-সব কথাবার্তা হতে লাগলো জানি না, ঘণ্টা খানেক পরে ওঁরা বেরুলেন। বাবা মার হাতে দশটা টাকা দিয়ে গেলেন,বললেন,রেখে দাও। আমি আসছি।

সেদিন সন্ধ্যার পরই বাবা এলেন। অত্যন্ত হাসিখুশি। বললেন,–সুভাষদা জিন্দাবাদ! বুঝলে ?

বলে মার উদ্দেশে বললেন –কারখানার 'ক্লোজার' তুলে নেওয়া হলো, মিটমাট হয়ে গেছে ? কারখানার চাকা আবার চলবে! কাল থেকেই কাজে বেরুচ্ছি। মা দু-হাত কপালে ঠেকালো– ঠাকুর-ঠাকুর-মা-লক্ষ্মী!

বাবা সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন –আবার বুজরুকি! ধন্যবাদ যদি দিতে হয়, দাও সুভাষদাকে! এ আমাদের যে কতোখানি জয়, তা তুমি বুঝবে না!

না বুঝলেও সেদিন মা বোধহয় শান্তিতে ঘুমোতে পারলো। আমি শুয়ে শুয়ে অনেক-কিছু ভাবতে লাগলাম। সেই যে জ্যেঠামশাই এসেছিল ? বলেছিল, কেউ একজন আসবে, তারপরে আমাদের অবস্থা ফিরবে। সেই একজন সত্যিসত্যি তাহলে কে ? আমার বন্ধু, না, ঐ সুভাষ মাইতি ?

কিন্তু সকালে উঠে আমার আর ও-সব চিন্তা রইলো না, ছুটে গেলাম বন্ধুর কাছে। সেই কোটরে মুখ গুঁজে বসে থাকা! আজ যেন মনে হলো, নেতিয়ে আছে! হাতে তুলে নিলাম, চোখ তুলে তাকালো –সেই বেদনার ছাপ! এই বেদনার ছায়া কি মুছে যাবে না ?

বাবা কাজে চলে গেছেন, বোধহয় আরও কিছু কাজ পেয়ে ছিলেন বাবা। মা টুনকিকে নিয়ে নিজে গিয়ে বাজার করে আনলো, ছোট-ছোট রুই মাছ এলো বাড়িতে। খাওয়ার খুব জুৎ হলো সন্দেহ নেই, কিন্তু মা আর আমার বন্ধুর কথা কিছু বলে না, বা তার সামনে গড় হয়ে প্রণাম করতেও যায় না। আমিও কি যাই ? অভ্যাস বশে সকালে উঠে একবার তাকে হাতে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আসি। এইভাবেই দিন দুই কেটে গেল। তারপরের দিনটা আমার ভালো যাচ্ছিলো না। ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারের বকুনি খেয়ে মনটা ভালো ছিল না। রাত্রে শুয়ে শুয়েও বকুনির জ্বালাটা ভুলতে পারছিলাম না। আমি যেখানে শুই, তার খুব কাছেই আমাদের বাড়ির পিছনের দিকটা ফাঁকা জায়গায় যাবার দরজাটা। তখন রাত্রি গভীর। মনে হলো– ঐ দরজায় কে যেন ঠকঠক করে আওয়াজ করছে!

প্রথমে মনে হলো আমারই মনের ভুল। পরে মনে হলো, পাশের বাড়ি বোধহয়। কিন্তু আবার সেই ঠকঠক শব্দ! এবার বুঝলাম, আমাদেরই পিছনের দরজাটায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে! বাবা-মা-টুনকি অঘোরে ঘুমুচ্ছে, আমি আস্তে আস্তে উঠলাম। দরজায় আবার ঠকঠক শব্দ হলো। মৃদু ঠকঠক শব্দ! চোর-টোর নয়তো? বাবাকে ডাকবো না কি? কিন্তু চোর ডাকাত কি এভাবে মৃদু আওয়াজ করবে? তাছাড়া চোর-ডাকাত যে আসবে, আমাদের কী এমন আছে যে নেবে? সাত পাঁচ ভেবে দরজাটি খুলে ফেললাম। ফেলতেই যা দেখলাম, তা এক অভাবনীয় দৃশ্য! দুটি পাখা বিস্তার করে ঠোঁট দিয়ে দরজায় ঠকঠক করছিল আমার বন্ধু। আমি দরজা খুলতেই সে উপুড় হয়ে নেতিয়ে পড়লো! তাড়াতাড়ি তাকে দু-হাতে তুলে নিলাম, চোখ তুলে তাকালো, সেই স্বচ্ছ দুটি চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে। (আমি দরজা খোলবার আগে সুইচ টিপে বাইরের আলো জ্বেলে দিয়েছিলাম)। আমার দিকে যখন তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তখন মায়া বলো, স্নেহই বলো সব যেন ঝরে পড়ছে! ঘোলাটে দৃষ্টি সত্ত্বেও আমি যেন তা বুঝতে পারলাম! পরক্ষণে তার ঘাড়টা নেতিয়ে পড়লো। আমি ঘাড়টা সোজা করে দিতে চেষ্টা করলাম, তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল, সে যেন ঠোঁট নেড়ে কী যেন আমাকে বলতে চাইছে! আমি যেন বুঝতে পারছিলাম, ও চলে যাচ্ছে! কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুরে-ঘুরে ঠিক দরজার কাছে এসে ঠোঁট দিয়ে ঠকঠক করে আমাকে জানাতে চাইলো –বন্ধু, আমি যাবো। যাবার আগে তুমি একবার এসো, তোমাকে আমি দেখে যেতে চাই! আমার চোখে জল এসে পড়লো, পশু-পক্ষীর প্রীতির কথা আমরা কতো কম জানি! আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, যা সত্যিই ঘটেছিল, তাই বলছি। তার কম্পমান ঠোঁট দুটিতে আমি কয়েক ফোঁটা জল দিলাম, সে ঠোঁট নাড়িয়ে তার পিপাসা হয়ত কিছুটা শান্ত করলো, তারপরে আমার দিকে তাকাতে গিয়ে চিরকালের মতো ঘাড় গুঁজে পড়লো।

ওকে কোলে নিয়ে দরজার কাছে বসে আমার রাত কেটে গেল। ভোরে সবার আগে উঠেছিল আমার বাবা। আমাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন, সব দেখে শুনে বললেন –একটা মরা প্যাঁচা নিয়ে কী করছিস! দে–শীগগির ওটা টান মেরে ফেলে দে!

ফেলে দিতে গিয়ে মনে হলো, বন্ধুর দুটি চোখভরা ব্যথা বুঝি আমার চোখে এসে আশ্রয় করেছে! ঝাপসা হচ্ছে চোখ, বারবার মুছছি, তবু সামলাতে পারছি না।

ছবি : সুশান্ত বিশ্বাস

"বাজনার ধাঁধা"

কমল লাহিড়ী

সেদিন হঠাৎ সকালবেলা
বলল রামকানাই,
বল্ তো দেখি কেমন করে
বাজায় তারসানাই?

ডুগি তবলায় মারলে চাঁটি
শব্দ কেন হয়–
সেতার বীণার সংগে কেন
তারের লাঠি রয়!

বেহালাতে শুধুই কেন
কান্নার সুর আসে–
খোল করতাল মৃদংগতে
ভক্তির ভাব ভাসে।

সুর তোলে না হারমোনিয়াম
হাত না দিলে গায়–
পিয়ানোটা চালাক বেশি
হাত পা দুটোই চায়।

তানপুরাতে কান মুচড়ে
খেয়াল কেন সাধে–
সানাই কেন সুরের আগে
এক নাগাড়ে কাঁদে!

একতারাতে বৈরাগী গান
কেন শুধুই বাজে–
জলতরংগ জল না পেলে
পড়ে ভীষণ লাজে!

বাজনা সুরের এ সব কথা
শিখতে যদি চাও,
কামিয়ে মাথা সিদ্ধিবাবার
শিষ্য হয়ে যাও।

ছবি– কাজী

স্টার ট্রেক

রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মনে আছে ক'বছর আগে সুলু উরা আর তোমাকে একটা দস্যু-জাহাজের সংগে লড়তে হয়েছিলো-----এই জাহাজটাও তো সেই রকম হতে পারে।
মনে আছে, ক্যাপটেন।
কিজিনটি এগিয়ে আসছে।
তখন কিজিনটি যুদ্ধ জাহাজে
ক্যাপটেন, তুমি এখন কি করতে চাও?
তখন এন্টারপ্রাইসে
কিজিনটি কিজিনটি ফেডারেশন নক্ষত্রযান এন্টারপ্রাইস থেকে বলছি।...
সাবধান, সাবধান আমাদের কাছে ওয়াটার পিস্তল আছে।
ওয়াটার পিস্তল সেটা আবার কি জিনিস ক্যাপটেন?
কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। টেলিপ্যাথকে খবর দাও। শীগগির ওকে আসতে বলো!
সেই মুহূর্তে এন্টারপ্রাইসে---
ক্যাপটেন, কিজিনটি জাহাজ আমাদের সিগনালের জবাব দিচ্ছে না। স্টারফিল্ট থেকেও এখনো কোনো খবর এলো না কিন্তু
All Rights Reserved Dist. by L.A. Times Synd © 1982 Paramount Pictures Corp.
কিজিনটিরা তো জানিয়েই দিয়েছিলো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোনো জাহাজ তারা মহাশূন্যে পাঠায় নি। যদি ঐ রকম কোনো জাহাজ পাওয়া যায় তাহ'লে সেটি নির্ঘাৎ
দস্যু-জাহাজ----এক্ষুনি ধ্বংস করে দেওয়া উচিত।
DIST. BY ASIA FEATURES
এখন কিজিনটি জাহাজে---
টেলিপ্যাথ এক্ষুণি এখানে আসছে ক্যাপটেন!

[চলবে]

পান্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

করুণাবাবু লোকটি মন্দ নন। বেশ মজারও। তাঁর বাড়িটা বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনের একেবারে শেষ মাথায়। বহুদিনের পুরনো শ্যাওলার ছোপধরা প্লাস্টার হীন বাড়ি। বাড়িটা একতলা। পিছন দিকে নর্দমার ধারে একটা লাইট পোস্ট আছে। যেটা ধরে অনায়াসে বাড়ির ছাদে ওঠা যায়। কয়েকটি বড় বড় গাছের ডাল ঝুঁকে আছে ছাদের একদিকে। পিছন দিকে পোড়ো বাগান। বাড়ির একটা অংশ ভেঙে গেছে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির পাশে যে ঘরটা তার একদিকের ছাদ নেই। একটি ঘর ওরই মধ্যে পদে আছে। করুণাবাবু পঁচিশ টাকা ভাড়ায় সেই ঘরেই থাকেন।

বিলু বললো–এই রকম বাড়িতে আপনি থাকেন কি করে?

–পঁচিশ টাকা ভাড়ায় কি এখন ঘর পাওয়া যায়? শুধু বর্ষার দিনে যা একটু কষ্ট। ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে।

ভোম্বল বললো–কিন্তু আপনার ঘরের পিছন দিকের দরজায় তো একটা পাল্লা নেই দেখছি। লাইট পোস্ট বেয়ে যে কোনো লোক তো ছাদে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরে ঢুকে চুরি করতে পারে।

করুণাবাবু হেসে বললেন--করে দেখুক না। তবে তো শিক্ষা হবে। আমার ঘরে যে চোর একবার চুরি করতে ঢুকবে সে জীবনে আর কখনো কোথাও চুরি করতে যাবে না।

বিলু বললো–কেন?

–আরে আমি একা মানুষ। চাকরি বাকরি করি না। আমার ঘরে আছে কি যে চুরি করবে? সামান্য দু'দশ টাকা যা থাকে তা আমার কাছে কাছেই থাকে। শুধু মেকাপ নেবার মতো সামান্য একটু সাজ-সরঞ্জাম যা ঘরে আছে। তাও যাত্রাদলের রিজেক্ট মাল।

যাই হোক। বিলুরা করুণাবাবুর বাড়ি দেখে বললো–ঠিক আছে। আমরা নজর রাখব।

করুণাবাবু বললেন–এলে তোমরা দিনের বেলায় এসো না। রাত্রিবেলা এসো, কেমন?

ভোম্বল বললো–এখনই তো সন্ধ্যে হয়ে এলো।

–ওরা আমার কাছে রাত নটা দশটার সময় আসে। তোমরা ঐ সময়েই এসো। আর পারো তো কুকুরটাকেও নিয়ে এসো। বিপদে ও তোমাদের সাহায্য করতে পারবে। কেমন?

বিলু আর ভোম্বল ঘর থেকে বেরোতেই তক্তপোশের তলা থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসে বললো–সাব্বাস গুরু।

লোক দুটোকে দেখেই করুণাবাবুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। কাগজের মতো সাদা মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন–আরে, তোমরা কখন এর ভেতরে এসে লুকিয়েছিলে?

–যখন থেকে তুমি থানায় গেছ চুকলি করতে তখন থেকে।

করুণাবাবু বললেন–থানায় চুকলি করতে যাবো কেন? পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এই চাল আমি চেলেছিলাম। এখন রাত্রিবেলা ছেলেগুলো এলে তোমরা ওদের সহজেই ধরে ফেলতে পারবে।

–আমরা ছেলেগুলোকে ধরবো, না ওরা আমাদের ধরবে? ওদের সঙ্গে থাকবে একটা সাংঘাতিক কুকুর আর পিছনে নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী পুলিশ।

–না–মানে তোমরা বিশ্বাস করো।

–বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমাদের নির্দেশ না নিয়েই যারা নিজের থেকে আমাদের ভালো কিছু করবার জন্যে চেষ্টা করে তাদের আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের কাগজপত্তর যা কিছু আছে দিয়ে দাও।

–কিন্তু এখনো তো অনেক কাজ বাকি।

–তোমার কাজ শেষ। এবার তোমার ছুটি। বলেই একজন একটি ধারালো ছোরা করুণাবাবুর পেটে ঠেকিয়ে ধরল আর একজন হাতড়াতে লাগল ঘরময়।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কাগজপত্তরগুলো বের করলো ওরা, তারপর যাবার জন্য তৈরি হলো।

করুণাবাবু বললেন–তোমরা এই রকম শয়তান জানলে অনেক আগেই আমি পুলিশকে সব জানাতাম।

যে লোকটা করুণাবাবুর পেটে ছুরি ধরেছিল সে বললো–তাতেও কোনো লাভ হতো না চাঁদু। আমরা দুজন ধরা পড়লে আর দুজন এসে তোমার ভুঁড়িটা ঠিক এমনি–এমনি করে ফাঁসিয়ে দিত। বলেই.....

চাপা একটা আর্তনাদ করে রক্তাক্ত কলেবরে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন করুণাবাবু।

বিলু আর ভোম্বল এতক্ষণ ভাঙা ছাদের ওপর থেকে সব কিছু দেখছিলো। এখন এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে

একটি ধারালো ছোরা করুণাবাবুর পেটে ঠেকিয়ে ধরল

শিউরে উঠলো ওরা। আসলে পঙ্গু না থাকায় এবং ওরা নিরস্ত্র হওয়ায় প্রতিরোধ করতে পারে নি। ভাগ্যে ওরা পিছন দিক দিয়ে ছাদে এসে উঠেছিলো, তাই তো সব কিছু দেখতে শুনতে পেলো। ওরা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই 'সাবাস গুরু' কথাটা কানে এসেছিলো ওদের। আর তখনই মনের ভেতর সন্দেহ নিয়ে বাড়ির পিছনের লাইট পোস্ট বেয়ে ছাদে এসে উঠেছিলো। ভাগ্যে বুদ্ধি করে এসেছিলো, নাহলে সবই রহস্যে ঢাকা থাকতো।

এই সব দেখেশুনে বিলু ভোম্বলকে বললো–তুই এক কাজ কর ভোম্বল, চুপি চুপি থানায় চলে যা। পুলিশকে খবরটা দে। আমি ওদের পিছু নিই। ভাগ্যে থাকলে বাবলু উদ্ধার আজই হবে।

ভোম্বল বললো–তুই বরং থানায় যা বিলু। আমি ওদের পিছু নিই। খালি গা হয়ে হাফ প্যান্ট পরে এমনভাবে রাস্তা দিয়ে যাবো যে ওরা আমাকে পেটমোটা মাথামোটা একটা বোগাস বলে মনে করবে।

বিলু হঠাৎ হি স্ স্ করে উঠল।

ভোম্বল চোখ দুটো বড় বড় করে বললো–সর্বনাশ! ওরা যে এদিকেই আসছে।

–লুকিয়ে পড়। শীগগির।

–কিন্তু লুকবো কোথায়? ন্যাড়া ছাদ।

–তাহলে চুপ করে শুয়ে পড় একপাশে।

ওরা তাই করলো। যে সব গাছের ডালগুলো ছাদের

ওপর নুয়ে ছিল তারই ফাঁকে লুকিয়ে পড়লো ওরা। কিন্তু কেন যে লোক দুটো এদিকে এলো! সামনের দরজাটা খুলেও যেতে পারত। আসলে ওরা বোধ হয় দরজায় খিল দিয়ে পেছন দিক দিয়ে পালাতে চায়। যাতে পচে গন্ধ না ওঠা পর্যন্ত করুণাবাবুর মৃত্যুর খবরটা কেউ না পায়। কি শয়তান।

যাই হোক, লোক দুটি তখন ধীরে ধীরে চুপিসাড়ে উঠে এসেছে ওপরে। আবছা অন্ধকারে এখন আর ওদের মুখ চেনা যাচ্ছে না। একজন লাইট পোস্ট ধরে নেমে যেতেই

আর একজন নামতে গেলো। যেই না পিছন ফিরে নামবার চেষ্টা করা অমনি ভোম্বল করল কি বিলুকে না জানিয়েই মারল তাকে এক লাথি। লাথির ঘায়ে লোকটা ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ড্রেনের ভেতর।

যে লোকটা আগে নেমেছিল সে বললো–কী হলো রে বোতল! পড়লি কি করে?

বোতলের মুখ দিয়ে 'রা' সরলো না। তবু অতিকষ্টে বললো–জানি না। মনে হলো কে যেন পিছন দিক থেকে লা-লা-লাথি মারলো।

–তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখানে কে আছে যে লাথি মারবে তোকে?

–তুই বিশ্বাস কর শিশি। সত্যিই লাথি মেরেছে।

শিশি বলল–হুঁ, তোকে তাহলে ভূতে লাথি মেরেছে।

বিলু আর ভোম্বল ছাদের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে মজা দেখছিল তখন। ওরা এবার আরো মজা করবার জন্য নাকি সুরে বললো–হ্যাঁ, ওঁ ঠিক কথাই বলেছে। এ বাড়িতে ভূঁত আছে।

শিশি লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে বললো–কে? কে তোমরা!

–আমরা ভূঁত। দেখবি আমরা আছি কিনা? এই দেখ।

দেখল একটা পুলিশের গাড়ি ঢুকছে

বলেই একটা আধলা ইট ছাদের ওপর থেকে টুপ করে ফেলে দিল লোকটার মাথার ওপর।

চোখে সর্ষেফুল দেখে মাথায় হাত দিয়ে 'বাবারে' বলে বসে পড়লো শিশি।

বিলু আর ভোম্বল চটপট লাইট পোস্টটা ধরে নিচে নেমে পড়ে বললো–তোরাই বলতে পারবি আমাদের বাবলুর খবর। বল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস তাকে?

যে লোকটাকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ বোতল একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। তার ডান পায়ের হাড়টা ভেঙে চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

শিশির মাথায় ইট পড়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর সারা শরীর। সেও কথা বলতে পারছে না ভালোভাবে। কে জানে ইট পড়ার দরুন লোকটার ভেতরে ভেতরে ইন্টারন্যাল হেমারেজ হয়ে গেছে কিনা। তবু সে অতিকষ্টে বললো–বলছি। আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো?

ভোম্বল বললো–আগে বল বাবলু কোথায়, তারপর অন্য কথা।

শিশি কি যেন বলতে গেল। কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে না পেরে জ্ঞান হারালো।

বোতল বললো–তোমাদের বাবলুকে আমরাই নিয়ে গেছি ভাই।

–কোথায়? সদরবক্সী লেনে?

–না না। ওখানে কেন? ওখানে আমাদের কোনো কিছু নেই।

–কিন্তু তোমাদের একজন লোক তো সকালবেলা আমাদের ঐখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

–ও ভোঁদড়া বুঝি? ওখানে ওর এক ভাই থাকে।

ভোম্বল বললো–বেশ। তাহলে বলেই ফেলো বাবলু কোথায়?

–বাবলুকে পেতে হলে তোমরা চলে যাও মৌড়িগ্রামে। পাঁচ তারা বাড়ি।

–ঠিক তো? যদি মিথ্যে হয়?

বোতল আর কথা বলতে পারলো না। সেও যেন নেতিয়ে পড়তে লাগলো ক্রমশ।

বিলু আর ভোম্বল তখন ওদের দুজনের পকেট হাতড়ে কাগজপত্তর যা কিছু ছিল সব বার করে নিলো, পকেট হাতড়ে একটি রিভলভার ও একটি ছোরাও পেলো। সব কিছু নিয়ে বিলু বললো–তারপর বাছাধনরা, এবার শান্তিতে একটু বিশ্রাম করো তোমরা। করুণাবাবুর হত্যাকারী এবং ভোঁদড় হত্যার জন্য তোমাদের দুজনেরই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এখুনি। আগে গিয়ে পুলিশে খবর দিই।

বোতল আতঙ্কিত গলায় বললো–পু-পু-পুলিশ।

ভোম্বল বললো–হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ। পুলিশ।

বোতলও জ্ঞান হারালো।

বিলু ভোম্বল সেই অন্ধকারের খোঁজ থেকে বেরিয়ে গলিতে এসে পড়লো। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো বড় রাস্তার দিকে। চারিদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। উঃ। কি লোড শেডিং রে বাবা।

ওরা গলির মুখ থেকে যেই না বেরোতে যাবে অমনি দেখল একটা পুলিশের গাড়ি সেখানে ঢুকছে। আর সেই গাড়ির ভেতর থেকেই শোনা যাচ্ছে পঞ্চুর গলা। অর্থাৎ পঞ্চু দেখতে পেয়েছে ওদের।

গাড়ি থামতেই বাচ্চু বিচ্ছু আর পঞ্চু নেমে এলো গাড়ি থেকে।

দারোগাবাবুও নামলেন। বললেন–কি ব্যাপার তোমাদের? সেই যে বিকেলবেলা লোকটার সঙ্গে তোমরা গেলে তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

–তা ভয় পাবার মতো ঘটনাই হয়ে গিয়েছিল স্যার। দারুণ অঘটন ঘটে গেছে এদিকে।

–কি রকম!

বিলু ভোম্বল সব কথা খুলে বললো। শুধু চেপে গেল মৌড়িগ্রামের কথা। আর ওদের কাছ থেকে উদ্ধার করা কাগজপত্তরগুলোর কথা। শুধু ছোরা আর রিভলবার দারোগাবাবুর হাতে জমা দিয়ে ওরা সকলকে নিয়ে গেলো করুণাবাবুর বাড়িতে। সেখানে করুণাবাবুর রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা পড়েছিল। বাড়ির পিছন দিক থেকে আহত শিশি বোতলকেও উদ্ধার করে গ্রেফতার করা হলো।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু ও পঞ্চু পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো এবার। গলি থেকে রাজপথে এসেই দুটো রিক্সা করে নিল ওরা। একবার বাড়ি যেতে হবে। তারপর দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে চলে যাবে মৌড়িগ্রাম। দেখাই যাক পাঁচ তারা বাড়ি থেকে বাবলুকে উদ্ধার করা যায় কিনা।

[চলবে]

ছবি : দিলীপ দাস

সীবা

গৌতম মুখোপাধ্যায়

স্কুলের নাম ফাদার ফনটেন'স স্কুল।

মোট চোদ্দজন শিক্ষার্থী নিয়মিত পড়াশুনা করে এই স্কুলে। না, ঠিক চোদ্দজন নয়। নির্ভুলভাবে বলতে গেলে পনের জনই বলা উচিত। যদিও ঐ পনের নম্বর সদস্যটি কোনো মানুষ নয়, তাহলেও সে স্কুলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাম তার সীবা–একটা পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড!

স্কুলের খাতায় নাম না থাকলেও সীবাকে ঐ অঞ্চলের সবাই চেনে। ফাদার ফনটেনের পোষা লেপার্ডকে প্রথম প্রথম স্কুলের বাচ্চারা ভয় পেলেও, এখন তারা নির্ভয়ে খেলা করে তার সঙ্গে। ব্যাপারটা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এইভাবেই নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিল ফাদার ফনটেন আর তাঁর ছাত্রছাত্রীরা।

বিশাল হিমালয় পর্বতমালার একটা নিভৃত অংশে গড়ে উঠেছিল ছোট একটা কলোনী। তখনও স্বাধীন হয়নি আমাদের দেশ। বিপ্লবের আগুন তখন সবে জ্বলে উঠেছে দেশের কোণায় কোণায়। দুটো পাহাড়ের মাঝে এই অসমতল জায়গাটায় সপরিবারে বাস করত কিছু অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার। চাষবাস আর হাঁস-মুরগীর ছোটখাট ব্যবসা করেই নির্বিঘ্নে দিন কেটে যাচ্ছিল তাদের। কিন্তু গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটল ফাদার ফনটেন আসার পরে।

বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, লম্বা দোহারা চেহারা, চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কালো আলখাল্লা পরা ফাদারকে প্রথম থেকেই ভালো চোখে দেখত না ঐ অঞ্চলের লোকেরা। তার কারণও ছিল। ফাদার ফনটেনের সঙ্গে একই বাংলোতে বাস করত তাঁর

পোষা লেপার্ড–সীবা। যে মানুষ হিংস্র জীবজন্তুর সংগে বাস করে, তার সংস্পর্শে না যাওয়াই ভালো। সুতরাং সবাই সযত্নে এড়িয়ে চলত ফাদারকে।

স্থানীয় জংগলের ইন্সপেক্টর কর্নেল ওব্রায়েন ঐ অঞ্চলেই বাস করতেন তাঁর স্ত্রী, মেয়ে আর সাত বছরের নাতি সীনকে নিয়ে। সীনের বাবা মারা যান সাপের কামড়ে। খুব আদর আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাসনের ফলে ছেলেটা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত অবাধ্য আর বদমেজাজী। তাই পরিবারের সবাই খুব চিন্তিত হয়ে উঠেছিল সীনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অনেক চেষ্টা করেও যখন সীনকে শোধরানো গেল না, তখন তাঁর ফাদার কনটেনের অনুরোধে পনের দিনের জন্য তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন সীনকে।

শুধু ওব্রায়েন পরিবারই নয়, সব পাড়া প্রতিবেশীরাও অবাক হয়ে গেল সীনের পরিবর্তন দেখে। মাত্র পনের দিনের মধ্যেই একদম বদলে গেছে ছেলেটা। শান্ত আর ভদ্র সীনকে দেখে এখন বোঝার উপায় নেই যে, কয়েকদিন আগেও পাড়ার সবাই বিরক্ত হতো তার ব্যবহারে! সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছেন ফাদার কনটেন।

কর্নেল ওব্রায়েন ফাদারকে অনুরোধ জানালেন সীনের শিক্ষকতা করার জন্য। শুনে ফাদার হেসে বললেন, আসলে আমি এই জাতীয় শিশুদের জন্য একটা স্কুল খোলার কথা ভাবছি। সকলের সাহায্য পেলে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারব কাজটা। এই ধরনের শিশুদের ওপর ঠিকমত নজর দেওয়া হয় না সাধারণ স্কুলে। ছোট ছোট জানোয়ারের মতো এরাও ভীষণ অবুঝ হয়। ঠিকমতো দেখাশুনা না করলে এরা ধ্বংস করে ফেলে নিজেদেরই।

এক বছরের মধ্যেই স্কুল শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। ছাত্রছাত্রী আর সীবাকে নিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কেটে যাচ্ছিল ফাদারের। কিন্তু অনিবার্য ভাবেই ঘটল সেই অঘটন, আর আতংকে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

স্কুলের শেষ ঘন্টা পড়ে গেছে তখন। সন্ধ্যা হয় হয়। গাছের মাথাগুলো লাল হয়ে আছে। চারদিকে ভ্যাপসা গরম। সীবা হেঁটে আসছিল মাঠের ওপর দিয়ে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে। পরক্ষণেই তার ডান থাবা আছড়ে পড়ল কোনো কিছুর ওপর। জিনিসটা কিছুই নয়, একটা বড় আকারের শেয়াল।

থাবার আঘাতে ছিটকে পড়ল শেয়ালটা, তারপরেই হিংস্রভাবে গর্জন করে তেড়ে এল সে সীবার দিকে। এক পলকের জন্য দেখা গেল শেয়ালের গায়ের বাদামী চামড়া, পরমুহূর্তেই উড়ন্ত ধুলোয় ঢেকে গেল তাদের দেহ। শোনা যেতে লাগল শুধু ঝটাপটির শব্দ!....

সীবাকে শান্ত করতে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন ফাদার। রক্ত লেগে আছে তার সারা মুখে। একমনে রক্ত চেটে পরিষ্কার করছে সে। জীবনে প্রথম গরম রক্তের স্বাদ পেল সীবা।

হিংস্র প্রাণীরা ততদিনই পোষ মানে, যতদিন তারা গরম রক্তের স্বাদ না পায়। সীবা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াত সর্বত্র। রক্তের স্বাদ পাওয়া তার পক্ষে বিচিত্র নয়। ফাদার ফনটেনের মতো অভিজ্ঞ লোকের জানা উচিত ছিল, আগে হোক বা পরে হোক সীবা রক্তের স্বাদ পাবেই একদিন।

সেদিন সীবাকে শান্ত করে ঘরে নিয়ে যেতে বেশ সময় লেগেছিল। হলঘরের উজ্জ্বল আলোয় সীবাকে দেখা গেল পরিষ্কার। সারা গায়ে তার রক্তাক্ত দংশনের চিহ্ন। ভীষণভাবে আহত হয়েছে সীবা।

ফাদার ইশারায় ছাত্রদের ঘর থেকে চলে যেতে বললেন। বেশ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। সীবার ক্ষতস্থানগুলোতে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিজের বিছানার তলাতেই সেই রাতের মতো তার শোবার ব্যবস্থা করলেন।

পরদিন সকালে সীবাকে তালাবন্ধ করে রাখা হলো ঐ বাড়িরই আউটহাউসে। প্রত্যেককে বারবার করে সাবধান করে দিলেন ফাদার, কেউ যেন কোনো কারণেই আউটহাউসের কাছে না যায়। দীর্ঘ একুশ দিন তালাবন্ধ রইল আহত সীবা। কৌতূহলী ছাত্রেরা উঁকিঝুঁকি মারা শুরু করল আউটহাউসে। তারা খুবই ভালবাসত সীবাকে। দীর্ঘদিন সীবাকে আটকে রাখার জন্য মন খারাপ লাগছিল তাদের। তাদের মধ্যে দুজন সাহসী ছেলে ঠিক করল যে, তারা মুক্ত করে দেবে সীবাকে।

রাত তখন প্রায় সোয়া একটা। গুর্খা দারোয়ান তার ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছাত্র দুজন এগিয়ে চলল চুপিসাড়ে। আউট হাউসের গায়ে লাগানো লম্বা গাছটা বেয়ে অনায়াসে তারা উঠে যেতে পারবে ছাদে, তারপর হাতের শাবলটা দিয়ে দরজার তালাটা ভেঙে ফেলা খুবই সহজ।

হঠাৎ প্রচন্ড গন্ডগোলে ঘুম ভেঙে গেল সকলের। ছাত্র দুটির আর্ত চিৎকার আর সীবার চাপা গর্জনে চমকে উঠল সবাই। গুর্খা দারোয়ান প্রাণপণে চেঁচিয়ে চলেছে, খবরদার...খবরদার...

ফাদার এবং অন্যান্য সকলে যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেন, তখন সব শেষ। ছোট ছাত্রটির বয়স ছিল মাত্র আট বছর। সীবার আক্রমণে তার শ্বাসনলী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেহ থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল সে। দ্বিতীয় ছেলেটির বয়স এগারো। প্রাণে বেঁচে গেলেও তার অবস্থাও বেশ শোচনীয়। সীবার ধারাল নখের আঘাতে তার ডান হাতের খানিকটা মাংস অদৃশ্য হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হচ্ছে সেখান থেকে। তার কাছেই শোনা যায় তাদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা।

ছেলেদুটি ছাদের দরজা দিয়ে আউটহাউসে ঢোকে নিঃশব্দে। একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। তারই আলোয় তাদের নজরে পড়ে, সীবা আরামে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে তার কম্বলের ওপর। দরজার কাছ থেকে তারা মৃদু শব্দে ডাকে সীবাকে। ঘুম ভেঙে যায় সীবার। উঠে দাঁড়ায় সে। ইতিমধ্যে হাতের শাবলটার সাহায্যে দরজা খুলে ফেলেছে ছোট ছেলেটা। একটুও আওয়াজ না করে সীবা ঝাঁপ দেয় দরজা লক্ষ্য করে। আকস্মিক ঘটনায় ভয় পেয়ে যায় ছেলেটা। চিৎকার করে ওঠে সে–পরক্ষণেই সীবা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, তারপর তার গলায় বসিয়ে দেয় ছুরির মতো ঝকঝকে দুইসারি দাঁত।

ইতিমধ্যে বড় ছেলেটিও চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। ছোট ছেলেটিকে ছেড়ে সীবা এবার মনোযোগ দেয় তার দিকে। সজোরে থাবা চালায় সে–প্রচন্ড যন্ত্রণায় অবশ হয়ে যায় ছেলেটার ডান হাত। চিৎকার চেঁচামেচিতে ততক্ষণে জেগে গেছে সবাই। আলো জ্বলে উঠেছে সব ঘরে। আর বেশিক্ষণ দাঁড়ানো উচিত নয়। চটপট অদৃশ্য হয়ে যায় সীবা জঙ্গলের মিশকালো অন্ধকারে।

কথাটা রাজ্য সরকারের কানে পৌঁছাতে দেরি হলো না। কারণ এই প্রথম এক ব্রিটিশ শিশু মারা পড়ল জানোয়ারের হাতে। কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সব ফরেস্ট গার্ডকে জানিয়ে দেওয়া হলো, আহত সীবা আরও প্রাণহানি করার আগেই যেন তাকে হত্যা করা হয়।

খোঁজাখুঁজি চললো প্রচুর, কিন্তু কোনো হদিস পাওয়া গেল না সীবার। হয়রান হয়ে ফিরে এলো গার্ডরা। কিন্তু যাকে খোঁজার জন্য এত কষ্ট, সেই স্বয়ং এসে দর্শন দিল ক্যাপ্টেন রলস্টনের কয়েকজন চাকরকে।

ঐ এলাকার শেষপ্রান্তে ছিল ক্যাপ্টেন রলস্টনের খামারবাড়ি। সেদিন ছিল শনিবার। ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতিতে হানা দিল সীবা। মুহূর্তের মধ্যে মারা পড়ল গোটা বারো মুরগী। বাকিগুলো চিৎকার করে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল প্রাণভয়ে। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনটে মুরগী খেয়ে ফেলল সীবা, তারপর আরও দুটোকে মুখে নিয়ে চম্পট দিল জঙ্গলের মধ্যে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা। বাধা দেওয়ার সুযোগও পেল না কেউ। একপলকের জন্য ক্যাপ্টেনের চাকরদের নজরে পড়ে শুধু একটা হলুদ চামড়ার ওপর কালো ছোপ লাগান শরীর–সীবা!

সব শুনে ভীষণ রেগে গেলেন ক্যাপ্টেন রলস্টন। রাগতভাবে তিনি ফাদারকে জানালেন যে তাঁর পোষা জানোয়ারের জন্যই এত ক্ষতি হয়েছে তাঁর এবং আরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সব শুনে ফাদার দুঃখ প্রকাশ করলেন ঘটনাটার জন্য। আরও বললেন যে, তিনিও জন্তুটাকে ধরবার চেষ্টা করছেন।

সেইদিনই রলস্টন সীবাকে হত্যা করার জন্য রওনা দিলেন জঙ্গলের ভিতর। সঙ্গে নিলেন তাঁর পাচকের চোদ্দ বছরের ছেলে চমনকে। ঐ বয়সেই সে চমৎকারভাবে জানোয়ারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে পারতো।

সীবার পায়ের ছাপ ধরে চলতে বেশি অসুবিধা হলো না। পায়ের ছাপের সঙ্গে মুরগীর পালক আর রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। কিছুটা চলার পর তাঁরা পৌঁছোলেন একটা সমতল জায়গায়। পুরো জায়গাটা ঘিরে রয়েছে বুক পর্যন্ত উঁচু শুকনো ঘাসের জঙ্গল। পায়ের ছাপ অদৃশ্য হয়েছে এরই ভিতর।

ইতস্তত করতে লাগলেন রলস্টন। এই ঘন ঘাসের জঙ্গলে কোথাও ওৎ পেতে বসে আছে মূর্তিমান বিভীষিকা। এর মধ্যে তাকে খোঁজার চেষ্টা শুধু কষ্টকরই না, বিপজ্জনকও। যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে জানোয়ারটা।

মনস্থির করে ফেললেন রলস্টন। ভাগ্যে যাই থাকুক, তিনি আজ সীবাকে হত্যা না করে ফিরবেন না। শক্ত হাতে রাইফেল বাগিয়ে ধরে ঢুকে পড়লেন তিনি ঘাসের জঙ্গলে।

এগিয়ে চলেছেন রলস্টন। হঠাৎ চমন দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়, তারপর হাত তুলে দেখাল মাটির দিকে। ভিজে ঘাসজমির ওপর পড়ে আছে কয়েকটা রক্তমাখা মুরগীর পালক। নিচু হয়ে একটা পালক তুলে নিলেন রলস্টন। এখনও তাজা রয়েছে রক্ত। অর্থাৎ জন্তুটা

সস্তা পাউডারগুলো ন্যাটের মত পরিস্কার তো করেই না, ভালো জামাকাপড় নষ্ট করে

ন্যাটের অনেক গুণ। তাই তো সুগৃহিণীর কাছে তার এত কদর। বিশেষ জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি ন্যাট ডিটার্জেন্ট পাউডারের দানাগুলি হাল্কা অথচ ময়লা ধোওয়ার শক্তিতে ভরপুর। সেইজন্য ওজন অনুপাতে অনেক বেশি পাউডার আপনি পান। তাছাড়া সাধারণ পাউডারে যতটা সোডা-অ্যাশ থাকে ন্যাটে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। ফলে জামাকাপড় নষ্ট হয় না, কাপড়কাচা হাতও যত্নে থাকে। সাধে কি বলি-

এতটুকু ন্যাটের ছোঁয়ায় জামাকাপড়ের রূপ খুলে যায়।

ন্যাট ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেটে পাওয়া যায়।

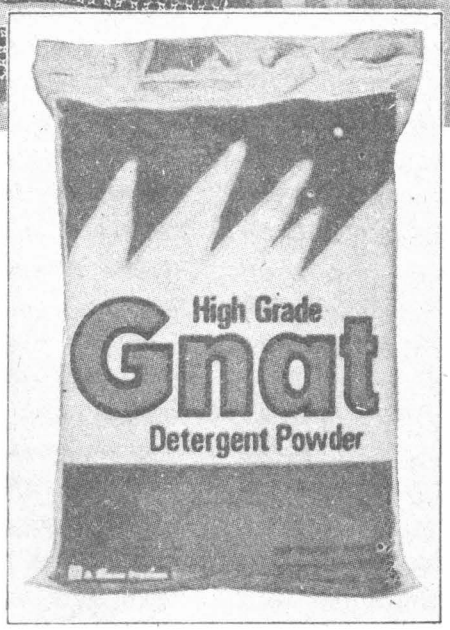

A Kusum Product আস্থার সঙ্গে কিনুন

C85 53

ফাদার ফনটেন শুয়ে পড়লেন সীবাকে আড়াল করে।

সবেমাত্র খাওয়া শেষ করেছে। খুব বেশি দূরে নয় সে। কাছাকাছি কোথাও আছে।

কয়েক পা এগিয়েই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল চমন। জোরে হাওয়া বইছে উল্টো দিক থেকে। পুরো ঘাসবন দুলছে হাওয়ায়। এখন এগোন উচিত নয়। কারণ সাধারণ অবস্থায় ঘাসবনের ভিতর কোনো জন্তু যদি নড়াচড়া করে, তাহলে ঘাসের আন্দোলন দেখে টের পাওয়া যেতে পারে তার অস্তিত্ব। কিন্তু এখন হাওয়ায় নড়ছে পুরো ঘাসবন। চালাক জানোয়ার এই সুযোগে এগিয়ে আসতে পারে নিঃশব্দে।

চমনের ধারণা নির্ভুল প্রমাণিত হলো তখনই। হাতের ইশারায় সে দেখাল কিছুদূরে আন্দোলিত ঘাসের ওপর। হাওয়া আসছিল জঙ্গলের দিক থেকে শিকারীদের দিকে। একটা জায়গায় শুধু ঘাসের আন্দোলন হচ্ছে উল্টোদিকে। ঘাসগুলো খুবই সামান্য নড়ছিল। কিন্তু চমনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি সেটা। জন্তুটা ওখানেই আছে।

কাঁধের ওপর রাইফেল তুলে ধরলেন রলস্টন। হাওয়া থেমে গেছে, কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় ঘাসবন নড়ছে এখনও। হঠাৎ থেমে গেল সেটাও। জন্তুটা বুঝতে পেরেছে যে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে কেউ।

লক্ষ্যস্থির করলেন রলস্টন, তারপর টিপে দিলেন ট্রিগার–পরক্ষণেই ভীষণভাবে নড়ে উঠল ঘাসবন। ছিটকে বেরিয়ে এলো সীবা। গুলি লেগেছে তার গায়ে।মাটিতে বুক চেপে বসে পড়ল সে আক্রমণের ভঙ্গিতে। আবার গুলি চালালেন রলস্টন, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। তাড়াহুড়োয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে তাঁর বুলেট। রাইফেলে দ্বিতীয়বার গুলি ভরার সময় নেই এখন।

বিকট গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহত লেপার্ড। আত্মরক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না রলস্টনের। বন্দুকটাকে মুগুরের মতো ব্যবহার করতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু পারলেন না। সীবার থাবার এক আঘাতে কয়েক ফুট দূরে ছিটকে পড়ল সেটা। নিরস্ত্র চমন চিৎকার করে উঠল দারুণ আতঙ্কে।

মালিককে আক্রমণ করেছে সীবা। তারপরেই আসবে তার নিজের পালা। অসহায়ভাবে মরতে হবে তাকে। ততক্ষণে সীবা দাঁত বসিয়ে দিয়েছে রলস্টনের গলায়। একবার আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, পরক্ষণেই তাঁর আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল সীবার বিকট গর্জনে। পরের দৃশ্য দেখার জন্য আর দাঁড়িয়ে থাকল না চমন। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল সে লোকালয় লক্ষ্য করে..

কয়েকদিন পরের কথা। আবদুল রহিম নামে এক ফরেস্ট গার্ড বাড়ি ফিরছিল বিকেলবেলা। এমন সময় তার চোখে পড়ে কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে চারদিক। কাছেই কোথাও আগুন লেগেছে নিশ্চয়। দৌড় লাগাল সে ধোঁয়ার উৎস লক্ষ্য করে। হাতে ছিল তার একমাত্র অস্ত্র–কুঠার!

চোখে পড়ছে আগুনের শিখা। সামনের মোড়টা ঘুরতে পারলেই সে পৌঁছে যাবে যথাস্থানে। কিন্তু বিপদে ওৎ পেতে ছিল ঐ মোড়ের মাথাতেই। মোড়টা ঘুরতেই আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা লেপার্ড–সীবা।

আচমকা আক্রমণে চিৎ হয়ে পড়ে গেল আবদুল। সীবা ততক্ষণে কামড় বসিয়েছে তার ডান কাঁধে। এক কামড়েই কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে তার। এবার দুটো ধারালো দাঁতে ভরা চোয়াল এগিয়ে এলো তার কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে। মরিয়া হয়ে সে চেপে ধরল সীবার মুখ, তারপর সজোরে আঘাত করলো কুঠারের বাঁট দিয়ে। আঘাত পেয়েই ছিটকে সরে গেল সীবা, দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর একলাফে ঢুকে গেল জঙ্গলের ভিতর।

হাসপাতালে ভর্তি করা হলো অচৈতন্য আবদুলকে। ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে আবদুলের টিটেনাস হয়ে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই

মারা গেল সে। মৃত্যুকালে তার পাশে ছিলেন কর্নেল ওব্রায়েন আর ফাদার ফনটেন। তাঁদের কাছেই সমস্ত ঘটনা বলে গেছে আবদুল। সে বারবার বলেছে যে তার আক্রমণকারী আর কেউ ছিল না, ফাদার ফনটেনের পোষা লেপার্ড সীবাই ছিল নিঃসন্দেহে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ফাদার বন্ধ করে দিলেন তাঁর স্কুল। সব জিনিসপত্র বিক্রি করে দিলেন তিনি। কারুর সংগে বিশেষ কথাবার্তা বলতেন না। একপ্রকার একা একাই থাকতেন সর্বক্ষণ।

কেটে গেল আরও একটা মাস। গ্রীষ্মের পর এলো বর্ষা। অঝোরধারায় ঝরতে লাগল বৃষ্টি। শুকনো জংগলে আবার দেখা গেল সবুজের আভাস। ইতিমধ্যে একবারও সীবার দেখা পাওয়া যায়নি। ক্রমশঃ লোকের ধারণা হয় যে আহত সীবা নিশ্চয় মারা গেছে এতদিনে।

শহরের শেষে জংগলের ধারে যে ঢালু জায়গাটা আছে, তার পাশেই বুধ চামারের বাড়ি। সেদিন সকালবেলা সে কাজ করছিল যথারীতি। গতকালই জন ডেভলিন নামে এক শিকারী একটা সুন্দর হরিণের চামড়া পরিষ্কার করতে দিয়ে গেছে তাকে। চকচকে চামড়াটা পরিষ্কার করে তেল মাখিয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিল সে। কুয়াশা ভালো করে না কাটলেও রোদ্দুর উঠেছে অল্প অল্প। জংগল থেকে শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক। ছোট ছেলেকে চামড়ার কাছে বসিয়ে রেখে নদী থেকে জল আনতে গেল বুধ চামার। পাঁচ মিনিটও হাঁটেনি সে, এমন সময় তার কানে এলো ছেলের আর্ত চিৎকার। চমকে ঘুরে তাকাল সে, তারপরেই ভয়ে অসাড় হয়ে গেল তার সারা শরীর।

একটা বড় লেপার্ড আক্রমণ করেছে তার ছয় বছরের ছেলেকে। উল্টে পড়ে গেছে ছেলেটা। হরিণের চামড়াটা তার শরীরের ওপর। জন্তুটা এক কামড়ে তুলে নিল চামড়াটা। কয়েকবার ঝাঁকালো সেটা, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।আবার চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে সে। নড়াচড়া করছে না একটুও। এগিয়ে এলো রক্তলোলুপ জানোয়ার। ছেলেটাকে লক্ষ্য করে সজোরে চালালো তার বিরাট থাবা...

অস্ফুট একটা আওয়াজ শোনা গেল ছেলেটার মুখ থেকে, তারপর ঢালু জমি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ছেলেটার দেহ।তার মাথা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেহ থেকে।

চিৎকার করে ছুটে এল বুধ চামার। কিন্তু তার আগেই হরিণের চামড়াটা নিয়ে পালিয়েছে জন্তুটা। ছেলেটার দিকে একবার তাকালো সে। নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা। একটা আঘাতেই মারা পড়েছে তার একমাত্র শিশুপুত্র। চিৎকার করে সে অভিশাপ দিতে লাগল খুনী জানোয়ারটাকে। হ্যাঁ, চিনতে পেরেছে সে জন্তুটাকে। হত্যাকারী আর কেউ নয়, আমাদের আদি ও অকৃত্রিম সীবা।

সমস্ত ঘটনা শুনে ক্ষেপে গেল তরুণ শিকারী জন ডেভলিন। তার সাধের হরিণের চামড়া নিয়ে পালিয়েছে সীবা। এর প্রতিশোধ সে নেবেই। হরিণের চামড়ার বদলে সীবার চামড়াই ছাড়িয়ে নেবে সে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বেরিয়ে পড়ে জন ডেভলিন।

জংগলে ঢোকার আগে সে সংগে নেয় তার চিরসাথী রাইফেলটা আর সেই পাচকের ছেলে চমনকে। পরবর্তী ঘটনা চমনের কাছেই শোনা যায়।

ডিসেম্বর মাস। ঠান্ডা পড়েছে প্রচন্ড। জংগলের স্যাঁতস্যাঁতে জমির ওপর সূর্যের আলো পড়ে না বেশি। তাই জংগলের ভিতরটা আরো বেশি ঠান্ডা। তার সংগে উত্তরদিক থেকে আসা হিমালয়ের ঠান্ডা হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে শরীর। জংগলের মধ্যে কয়েকটা জায়গায় সূর্যের আলো এসে পড়ে সরাসরি। সারাদিন রোদ্দুর পড়ায় অনেক রাত পর্যন্ত গরম থাকে জমিটা। এইরকমই একটা জায়গায় চমন আবিষ্কার করল কয়েকটা অস্পষ্ট পায়ের ছাপ। সীবার পায়ের ছাপ নিশ্চয়। চমন ভাল করেই চেনে তার পায়ের ছাপ। রাতে এখানেই বিশ্রাম করে সীবা। সুতরাং কাছেই একটা গাছের ওপরে উঠে পড়ল তারা এবং রাইফেল বাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সীবার জন্য ।

প্রচন্ড ঠান্ডায় মশার কামড় খেয়ে কেটে গেল সারাটা রাত। সূর্যের আলোয় ভরে গেল চারদিক। সীবা একবারও আসেনি সেখানে। ক্লান্ত শিকারীরা ব্যর্থ হয়ে চলে গেল তখনকার মতো। আবার ফিরে এলো দুপুরবেলায়। এসেই চমকে উঠল তারা। কতগুলো তাজা পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানে। তারা চলে যাওয়ার পরেই জন্তুটা এসেছিল সেখানে। অর্থাৎ দিনের বেলায় সে বিশ্রাম করে এখানে।

পরদিন সকালবেলা আবার তারা অপেক্ষা করতে লাগল গাছের ওপর। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ার পরেও দর্শন মিলল না শিকারের। ধাঁধায় পড়ে গেল জন ডেভলিন। বন্য জন্তুদের আচরণ সাধারণতঃ এরকম হয় না।এই জন্তুটা সত্যিই অদ্ভুত চরিত্রের। তার কারণও আছে। সীবা বড় হয়েছে মানুষের সমাজে। এত তাড়াতাড়ি সে অরণ্যজীবনে অভ্যস্ত হতে পারে না।

সীবা নিশ্চয় লোকালয়ের কাছাকাছি থাকে সব সময়।

জনের ধারণা সত্যি। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তারা আবিষ্কার করল সীবার পায়ের ছাপ। ছাপগুলো জংগল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ের দিকে গেছে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করে চলতে লাগল তারা। কিছুদূর গিয়ে একটা বাংলোর সামনে শেষ হয়েছে পায়ের চিহ্ন। চমন অবাক হয়ে গেল খুবই। খুনী জানোয়ারটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে, অথচ বাড়ির অধিবাসী মানুষটা জানতে পারেনি কিছুই। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এটা। তখনই বাড়ির ভিতর ঢুকতে চাইল চমন, কিন্তু বাধা দিল জন ডেভলিন। বাধা দেওয়ার কারণটা না বুঝলেও তখনকার মতো ফিরে গেল তারা দুজনেই।

ভোর হয় হয়। আকাশে চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। সতর্কভাবে এগিয়ে চলেছে জন ডেভলিন আর চমন। নিঃশব্দেই তারা পৌঁছে গেল বাগানে ঘেরা বাড়ির সামনে। বাংলোর অধিবাসী ফাদার ফনটেন জেগে আছেন কিনা বোঝার উপায় নেই। সারাটা বাংলোয় বিরাজ করছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোনো শব্দও শোনা যাচ্ছে না ভিতর থেকে। চাপা গলায় চমনকে কিছু নির্দেশ দিয়ে ডেভলিন চলে গেল বাড়ির পিছনের দরজায়। তার পায়ের শব্দ উঠল খট্ খট্ খট্...

কে ওখানে? ভিতর থেকে ভেসে এল ফাদারের গম্ভীর আওয়াজ। জেগে আছেন তিনি।

আমি, আমি চমন। ডেভলিন সাহেব দেখা করতে চান আপনার সংগে। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন সামনের দরজায়। ডেভলিনের নির্দেশমতো বলে গেল চমন।

কয়েক মিনিট কোনো উত্তর এল না ভিতর থেকে। চারদিক স্তব্ধ। তারপর শোনা গেল দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালার আওয়াজ। কেরোসিনের বাতি জ্বাললেন ফাদার। কাঁচের জানলার গায়ে দেখা গেল তাঁর দীর্ঘ ছায়া। ছায়া একবার নিচু হয়ে কিছু করল, তারপর এগিয়ে গেল পিছনের দরজার দিকে, সেখানে অপেক্ষা করে আছে জন ডেভলিন।

শক্ত হাতে রাইফেল বাগিয়ে ধরল ডেভলিন। নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে গেল দরজাটা–ভিতরে জমাট অন্ধকার। কাঁপা হাতে তুলে ধরল সে টর্চটা, তারপর টিপে দিল বোতাম।

টর্চের জোরালো আলো ঘরের ভিতর ছুটে গেল অন্ধকার ভেদ করে। পরক্ষণেই ডেভলিনের সারা শরীরে খেলে গেল আতংকের শীতল শিহরন!

ঘরের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে সীবা। তার সবুজ চোখদুটিতে বিস্ময়ের ছাপ। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপরেই ঝাঁপ দিল সে দরজা লক্ষ্য করে। ফাদার ফনটেন চিৎকার করে উঠলেন, পালা, সীবা পালা!

লক্ষ্যস্থির করার সময় নেই। কোনোমতে রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপে দেয় জন ডেভলিন। ছিটকে পড়ে সীবা। গুলি লেগেছে তার মাথায়। আবার নিশানা স্থির করে জন। কিন্তু গুলি করার আগেই ফাদার ফনটেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন সীবার সামনে। তাকে বাঁচাতে চান তিনি। দ্বিতীয়বার যাতে গুলি করার সুযোগ না পাওয়া যায়, সেজন্য তিনি শুয়ে পড়লেন সীবাকে আড়াল করে। কিন্তু আহত হয়ে সীবা তখন হয়ে উঠেছে বেপরোয়া আর হিংস্র। লাফ দিয়ে পড়ল সে ফাদারের ওপর। পাগলের মতো কামড়াতে লাগল তাঁর হাতে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন ফাদার। অপর হাত দিয়ে তিনি তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক। সীবা কামড় বসিয়েছে ফাদারের গলায়। মুহূর্তের মধ্যে শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল ফাদারের মাথা।

আতংকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জন ডেভলিন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই আবার গুলি করে সে জন্তুটার মাথায়। একবার নয়, দুবার অগ্নিবর্ষণ করে জনের রাইফেল–অব্যর্থ লক্ষ্য! বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে তার মাথার একটা অংশ। কয়েকবার গোঁ গোঁ শব্দ করে সে অস্পষ্ট ভাবে, তারপর ফাদারের রক্তমাখা গলার পাশেই লুটিয়ে পড়ে সীবার প্রাণহীন দেহ!

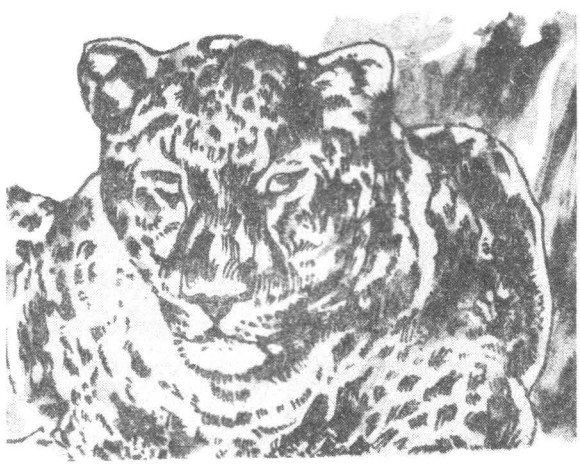

ছবিঃ তরুণ চক্রবর্তী

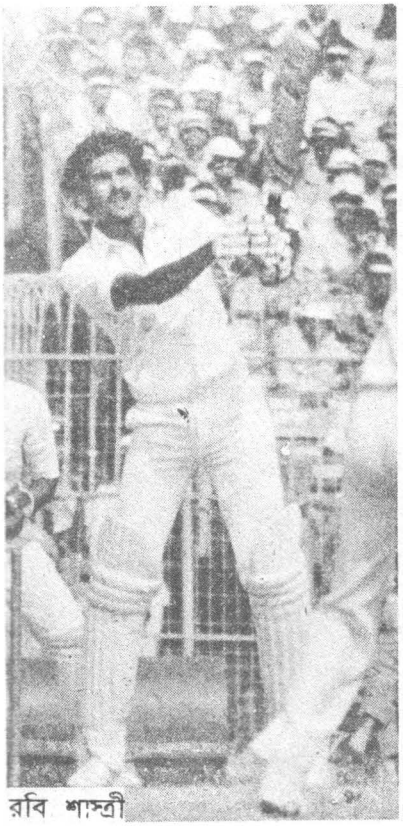
রবি শাস্ত্রী

কপিলদেব

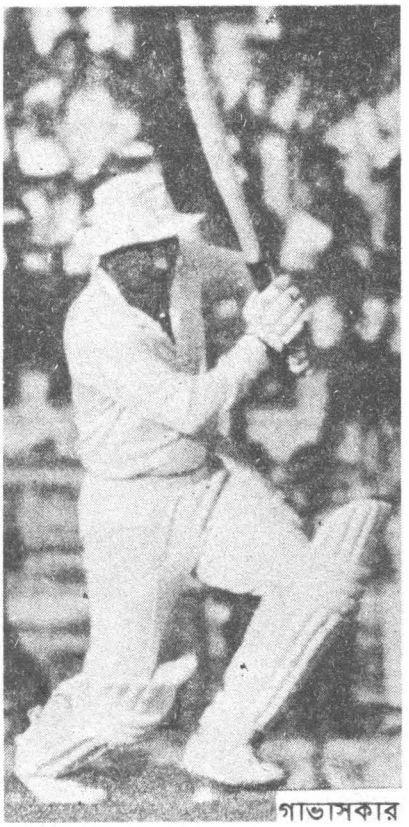
গাভাসকার

এবার খেলা ইংলন্ডে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলন্ডে খেলতে যাচ্ছে। ইংলন্ডে মে-জুন মাসে খেলা রীতিমত কষ্টকর। এই মেঘ, এই বৃষ্টি, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, হাড়কাঁপানো শীত। সব মিলিয়ে বিদেশী দলগুলিকে ভীষণ অসুবিধেয় পড়তে হয়। তার ওপর বলও সুইং করে অনেকখানি করে। ইংলন্ডে আগে যাঁরা খেলেন নি তাঁদের কাছে এই পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে ভালো খেলা খুব সহজ নয়।

তাই বোধ হয় বলা হয় ইংলন্ডের (মে-জুন মাসে) মাঠেই একজন জাত খেলোয়াড়ের আসল পরীক্ষা হয়। ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে এইবার সেই পরীক্ষাই দিতে হবে। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টে পর পর সেঞ্চুরি করার পর আজহারউদ্দিন টেস্ট ক্রিকেটে এখনও তেমন সাড়া জাগানো কিছু করতে পারেন নি। এবার ইংলন্ডে গিয়ে তিনি কেমন খেলেন তাই দেখার জন্যে সকলে এখন অপেক্ষা করে আছেন।

ভারতীয় দলের বেশ ক'য়েকজন খেলোয়াড়ের ইংলন্ডে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। দলনেতা কপিলদেব, সুনীল গাভাসকার, মহিন্দর অমরনাথ, দিলীপ বেংসরকার, শ্রীকান্ত, রবি শাস্ত্রীরা আগেও ইংলন্ডে গিয়ে খেলে এসেছেন। কাউন্টি ক্রিকেটেও খেলেছেন। মে-জুন মাসে ইংলন্ডের মাঠ তাঁদের কাছে অপরিচিত নয়। আশা করা যায় তাঁরা ভালোই খেলবেন।

ইংলন্ডে খেলতে যাচ্ছেন–কপিলদেব (অধিনায়ক), রবি শাস্ত্রী (সহ অধিনায়ক), গাভাসকার, মহিন্দর অমরনাথ, দিলীপ বেংসরকার, শ্রীকান্ত, আজহারউদ্দিন, চেতনশর্মা, রমন লাম্বা, সন্দীপ পাটিল, রজার বিনি, কিরণ মোরে, মনিন্দর সিং, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মনোজ প্রভাকর ও শিবলাল যাদব।

ইংলন্ড এখনো তাদের দল ঠিকমতো সংগঠিত করতে পারে নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলতে গিয়ে তারা ভিভিয়ান রিচার্ডসের দলের কাছে হেরে গেছে। ইংলন্ডের সেরা খেলোয়াড় ইয়ান বথামকে নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। আসলে বথাম খুব মেজাজী খেলোয়াড়। ওঁর সামনে এখন সব থেকে বেশি উইকেট দখলের বিশ্ব রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা। উনি ভাঙতে চাইছেন ডেনিস লিলির রেকর্ড। বথাম মস্ত খেলোয়াড়। ব্যাট-বল কোন দিক দিয়েই তাঁর সমান পারদর্শী বর্তমান বিশ্বে আর কেউ নেই। তাঁর সঙ্গে শুধু তুলনা করা চলে ভারতের কপিলদেব, নিউজিল্যান্ডের রিচার্ড হ্যাডলি আর পাকিস্তানের ইমরান খানের।

ইয়ান বথাম কাউকে পরোয়া করেন না। মুখে যা আসে তাই বলে দেন। তাই খবরের কাগজে তাঁর সমালোচনা প্রায়ই বেরোয়। কাগজগুলো হামেশাই তাঁকে দল থেকে বাদ দেবার ওকালতি করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে গোড়ার দিকে বথাম তেমন খেলতে পারছিলেন না। তখন তাঁকে বসিয়ে দেবার জন্যে ইংলন্ডের কাগজে কাগজে খুব লেখালিখি হয়েছিলো।

তখন ইংলন্ডের অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার বলেছিলেন, বথামকে আমরা কিছুতেই বসাচ্ছি না। খেলতে পারছে না তাতে কি হয়েছে—ওই তো আমাদের সেরা খেলোয়াড়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ভিভিয়ান রিচার্ডস ইংলন্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে সমারসেটে বথামের সঙ্গেই

আজহারউদ্দিন

রজার বিনি

বেংসরকার

খেলেন। দু'জনে খুব ভাব। তিনি বলেছেন, ইয়ানকে নিয়ে কাগজে কাগজে এসব কি লেখালিখি হচ্ছে! ও ভালো খেলতে পারছে না। এখন ওর দরকার সহানুভূতি, উৎসাহ—তা না উল্টে যা-তা লেখা। কোনো মানে হয় না।

সে যাই হোক, দলগত শক্তির দিক দিয়ে ভারত এই মুহূর্তে ইংলন্ডের চেয়ে শক্তিশালী। বোলিংয়ের দিকটায় অবশ্য দুর্বলতা আছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার বলেছেন, ভারতের এই দলের পক্ষে কোনো দেশের দুটো ইনিংস খতম করে দেওয়া সম্ভব নয়।

এ কথা বলার সময় বর্ডারের বোধ হয় মনে ছিলো না দু দুটো টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হারতে হারতে বেঁচে গেছে ভারতের অধিনায়ক কপিলদেবের সামান্য ভুলের জন্যে।

এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে বেদী, চন্দ্রশেখর, বেংকটরাঘবন কিংবা প্রসন্নর মতো একজন বোলার ভারতীয় দলে থাকলে ভারত এই মরশুমে টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারতো, জিততে পারতো বেনসন হেজেস কাপে। তাই এই মুহূর্তে ভালো বোলার খুঁজে বের করার দরকার সবার আগে।

৫১০ লিডসে ১৯৬৭ সালে

ইংলন্ডের পক্ষে

৫ উইঃ ৬৩৩ (ডিঃ) এজবাস্টনে ১৯৭৯ সালে

৭ উইঃ ৬৫২ (ডিঃ) মাদ্রাজে ১৯৮৪ সালে

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

ভারতের পক্ষে

৪২ লর্ডসে ১৯৭৪ সালে

৪৩ মাদ্রাজে ১৯৭৬ সালে

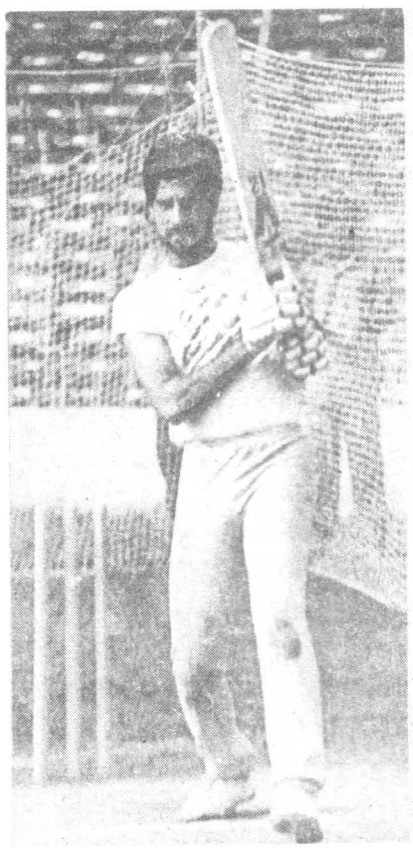

শ্রীকান্ত

কিরণ মোরে

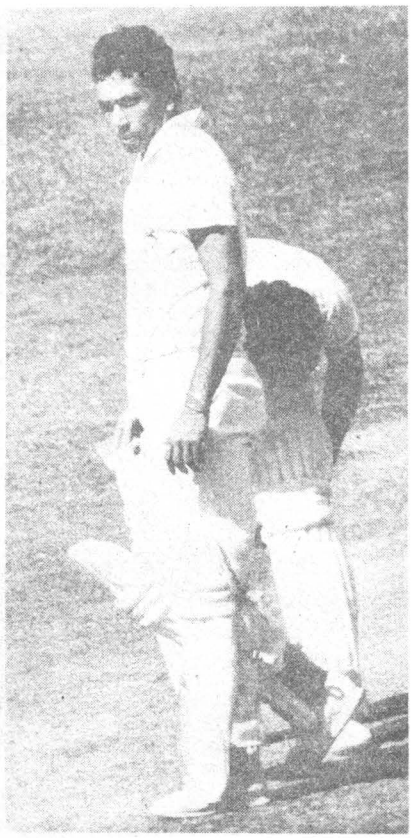

মহিন্দর অমরনাথ

যাই হোক, ভারতের সঙ্গে ইংলন্ডের এ পর্যন্ত ৭২টি টেস্ট খেলা হয়েছে। ভারত জিতেছে মাত্র ৯টি টেস্টে। হেরেছে ৩০টিতে। বাকি ৩৩টি টেস্ট শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। এ পর্যন্ত ভারতের ৪৭ জন ও ইংলন্ডের ৫৫ জন খেলোয়াড় সেঞ্চুরি করেছেন।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

ভারতের পক্ষে

৮ উইঃ ৫৫৩ ডিঃ কানপুর ১৯৮৪ সালে

ইংলন্ডের পক্ষে

১০১ ওভালে ১৯৭১ সালে

১০২ বোম্বাইয়ে ১৯৮১ সালে

এক মরশুমে সর্বাধিক রান

ভারতের পক্ষে

৫৮৬–বিজয় মঞ্জরেকার–গড়ে ইনিংস প্রতি ৮৩.৭ রান ১৯৬১ সালে

৫৯৪–কেন ব্যারিংটন–গড়ে ইনিংস প্রতি ৯৯.০০ রান

১৯৬১ সালে

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারতের পক্ষে

ভিনু মানকড় ৫৫ রানে ৮টি ১৯৫১ সালে

বি.এস. চন্দ্রশেখর ৮০ রানে ৮টি ১৯৭২-৭৩ সালে

ইংলন্ডের পক্ষে

ফ্রেড ট্রুম্যান ৩১ রানে ৮টি ১৯৫২ সালে।

একটি ম্যাচে সব থেকে বেশি উইকেট

ভারতের পক্ষে

ভিনু মানকড় ১০৮ রানে ১২টি মদ্রাজে ১৯৫১ সালে

ইংলন্ডের পক্ষে

ইয়ান বথাম ১০৬ রানে ১৩টি জুবিলি টেস্টে বোম্বাইএ ১৯৮০ সালে

এক মরশুমে সব থেকে বেশি উইকেট

ভারতের পক্ষে

চন্দ্রশেখর ৩৫টি উইকেট–গড়ে ১৮.৯৪ রান–১৯৭২-৭৩ সালে পাঁচটি টেস্টে

ইংলন্ডের পক্ষে

ট্রুম্যান ২৯টি উইকেট–গড়ে ১৩.৩১–১৯৫১ সালে চারটি টেস্টে

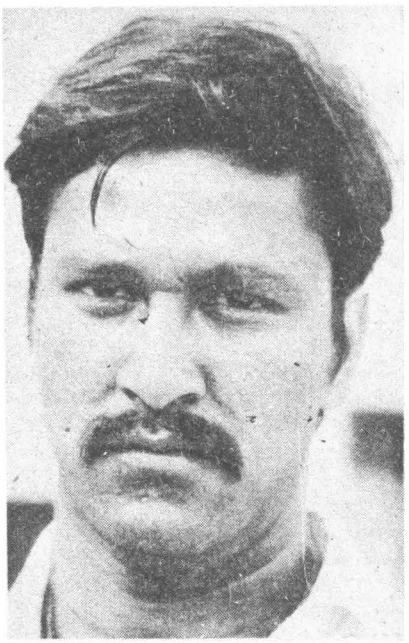

শিবলাল যাদব

উক্তি

সন্দীপ পাটিল

বাজে বল ছোঁড়ার জন্যে কখনই একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত নয়–যখন সে শুধু তার ব্যাটিংয়ের জোরেই দলকে জেতাতে পারে।

(ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর একথা বলেছিলেন সন্দীপ। আসলে এক হাত নিতে চেয়েছিলেন নির্বাচকদের। কারণ ভালো ফিল্ডিং করতে পারেন না বলে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।)

বরিস বেকার

আমি বিশ্বের সেরা টেনিস খেলোয়াড় হতে চাই। সব রকম কোর্টেই আমি পারদর্শী হবো। যতোদিন না হবো ততোদিন বিশ্রাম নেবো না।

(কিছুদিন আগে একটি প্রতিযোগিতায় হেরে যাবার পর নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে ঐ কথা বলেছিলেন সর্ব-কনিষ্ঠ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বরিস বেকার।)

জন ম্যাকেনরো

বরিসের জন্যে আমার কষ্ট হয়। বেচারা নিজেই জানে না–ও কি করবে। সবাই সব সময় ওর কাছ থেকে দারুণ কিছু আশা করেন। এতে কি কেউ শান্তিতে থাকতে পারে। ভীষণ মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। আমারও এই অবস্থা হয়েছিলো। তাই আমি বরিসের কষ্টটা ভালো-ভাবেই বুঝতে পারছি।

(বরিস বেকার একটি প্রতিযোগিতায় হেরে যাবার পর ম্যাকেনরো এই কথা বলেছিলেন।)

পিটার হাসিং

লড়াই ছেড়ে দিলেই আমি বুড়ো হয়ে যাবো। বক্সিং আমার রক্ত–মজ্জার সংগে জড়িয়ে আছে। আমার কাছে রিং ছেড়ে আসা আর একটা লোকের একটি হাত হারানোর সমান।

(এ কথা বলেছেন ৩৬ বছরের জার্মান জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়ন পিটার হাসিং। সম্প্রতি বক্সিং কাউন্সিল ঠিক করেছে যে বয়েস বাড়ার জন্যে পিটারকে আর লড়তে দেওয়া হবে না।)

প্রশ্ন :

১) টেস্ট ক্রিকেটে ক্যাচ লোফার বিশ্ব রেকর্ড কার? কটি?

২) টেস্ট খেলায় একদিনে কম রান তোলার নজির কি?

৩) টেস্ট ক্রিকেটে আবির্ভাবে (প্রথম টেস্টে) ডবল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড কার?

৪) কোন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটে নিজের দেশের ক্যাপ্টেন হয়েছেন আবার বক্সিংয়ে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন?

৫) গত দশকে কোন কোন খেলোয়াড় একই টেস্টে সেঞ্চুরি এবং ডবল সেঞ্চুরি করেছেন?

৬) একটি ফুটবল ম্যাচে সবচেয়ে বেশি দর্শক খেলা দেখার রেকর্ড কতো?

৭) ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম অর্জুন পুরস্কার পান কে?

৮) পুসকাস, ডিস্টিফানো, এবং ডিডি—কোন কোন দেশের খেলোয়াড়?

৯) ভারতবর্ষের প্রথম ফুটবল ক্লাবের নাম কি? ক্লাবটির প্রতিষ্ঠা কোন সালে?

১০) কাইজার ফ্রাঞ্জ—কার ডাক নাম?

১১) পোলো খেলার পোলো শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

১২) ভারতের এক হকি ক্যাপ্টেন পরে পাকিস্তানের হাই কমিশনার হয়েছিলেন। তিনি কে?

১৩) কৃষাণলাল, বলবীর সিং ও কে.ডি. সিং বাবু কোন কোন ওলিম্পিকে ভারতীয় হকিদলের অধিনায়ক ছিলেন?

১৪) ইফতিকার আলি পাতৌদি কোন ওলিম্পিকে ভারতীয় হকিদলের খেলোয়াড় ছিলেন?

১৫) কোন সাল থেকে ভারত ওলিম্পিকের ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে?

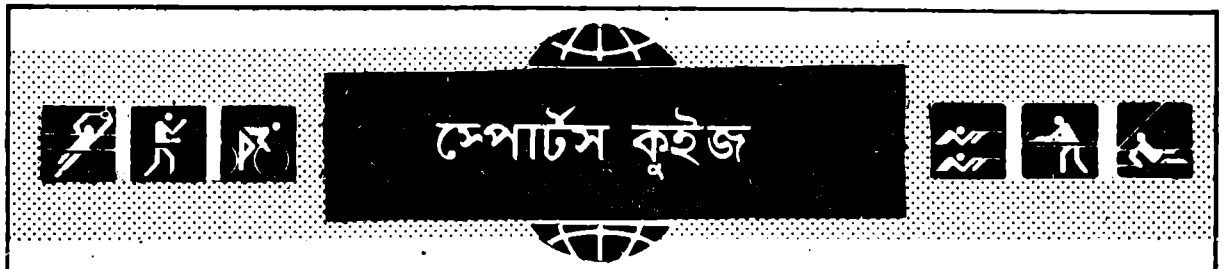

১৬) 'ওলিম্পিক অ্যাওয়ার্ড' আমাদের দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছেন?

স্পোর্টস কুইজ

উত্তর :

১) ইংলন্ডের কলিন কাউড্রের। ১২০টি ক্যাচ লুফেছেন তিনি।

২) ৯৫ রান (অস্ট্রেলিয়া ৮০, পাকিস্তান ২ উইকেটে ১৫) ১৯৫৬-৫৭ সালে—করাচি টেস্টে।

৩) ইংলন্ডের আর. ই. ফস্টার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনি টেস্টে আবির্ভাবেই ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ১৯০৩-৪ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের লরেন্স রো তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ১৯৭৩ সালে।

৪) জে. ডব্লিউ. টি. এইচ. ডগলাস।

৫) অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়ালটারস ও গ্রেগ চ্যাপেল, ওয়েস্ট ইন্ডিসের লরেন্স রো এবং ভারতের সুনীল গাভাসকার।

৬) ২০৫০০০। ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্রাজিলের সংগে উরুগুয়ের খেলা দেখতে ঐ রেকর্ড সংখ্যক দর্শক মাঠে হাজির হয়েছিলেন।

৭) পি.কে. ব্যানার্জি। ১৯৬১ সালে।

৮) হাংগেরি, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের।

৯) কলকাতার ডালহৌসি ক্লাব। ১৮৭৮ সালে ক্লাবটির প্রতিষ্ঠা হয়।

১০) ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ারের। বেকেনবাউয়ার ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপ জয়ী পশ্চিম জার্মানি দলের অধিনায়ক ছিলেন।

১১) পুলু শব্দ থেকে। শব্দটি তিব্বতী। মানে বল।

১২) লালশা বোখারি। ১৯৩২ সালের ওলিম্পিক দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি।

১৩) ১৯৪৮, ১৯৫৬ ও ১৯৫২ সালের ওলিম্পিকে।

১৪) ১৯২৮ সালে আমস্টারডাম ওলিম্পিকের।

১৫) ১৯৩৬ সাল থেকে।

১৬) ইন্দিরা গান্ধী।

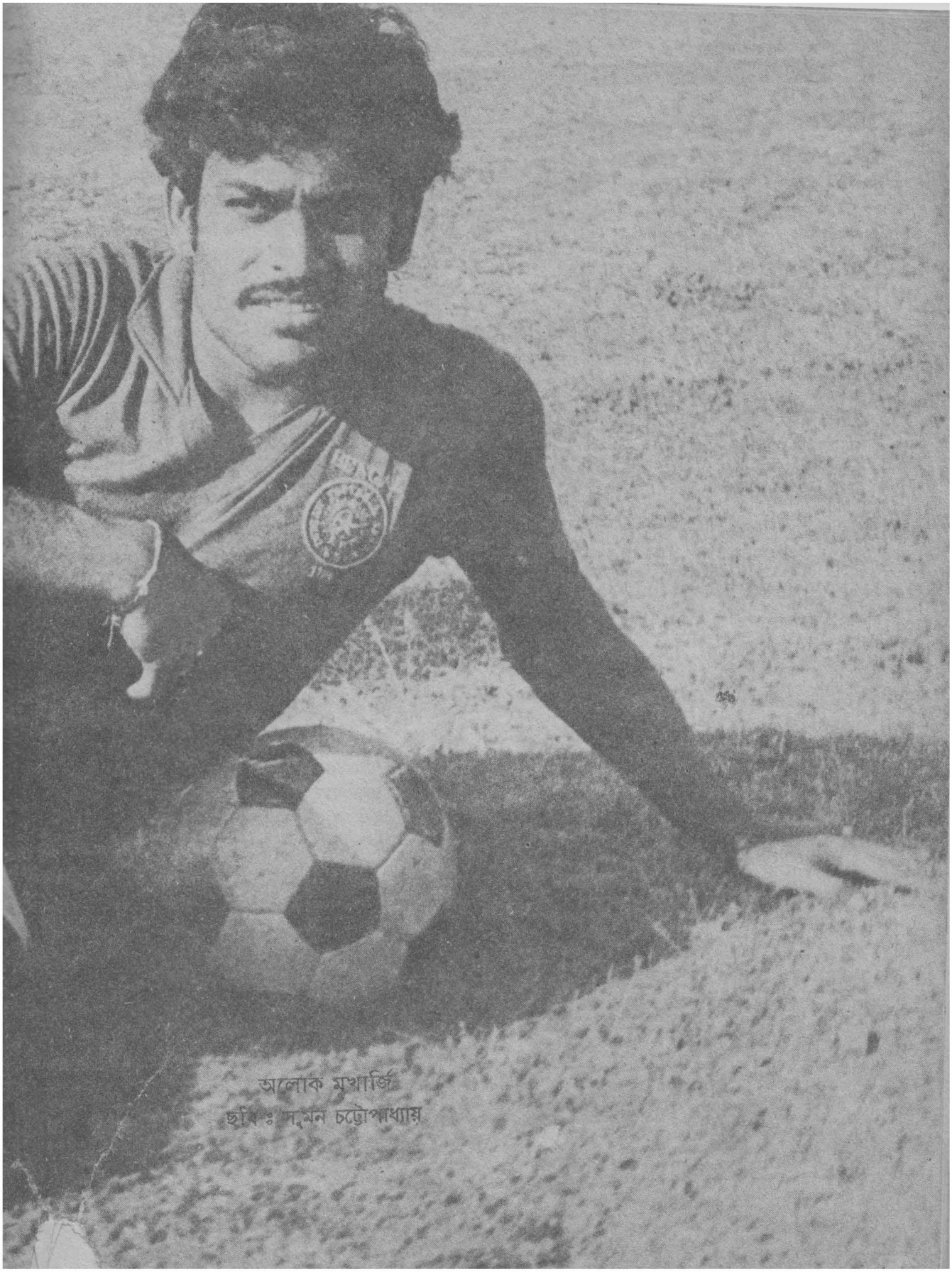

অলোক মুখার্জি
ছবি ঃ সুমন চট্টোপাধ্যায়

দশটির বেশি সেঞ্চুরি

গত জানুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করার পর মহিন্দর অমরনাথ টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ৪২তম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট খেলায় দশটি বা তার বেশি সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এই ৪২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১৪ জন ইংলন্ডের, অস্ট্রেলিয়ার ১০ জন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৯ জন, পাকিস্তানের ৫ ও ভারতে ৪ জন খেলোয়াড় আছেন। নিচে এই ৪২ জন খেলোয়াড়ের তালিকা দেওয়া হলো। কোন দেশের বিরুদ্ধে ক'টি সেঞ্চুরি করেছেন তাও দেওয়া হলো।

দেশ/খেলোয়াড়	শত রান	ইং	অস্ট্রে	সাঃ আঃ	ওঃ ইঃ	নিঃ জিঃ	ভাঃ	পাঃ	শ্রী লঙ্কা
ভারত									
সুনীল গাভাসকর	৩২	৪	৭	০	১৩	২	০	৫	১
জি.আর বিশ্বনাথ	১৪	৪	৪	০	৪	১	০	১	০
পলি উমরিগর	১২	৩	০	০	৩	১	০	৫	০
মহিন্দর অমরনাথ	১০	০	২	০	৩	০	০	৪	১
অস্ট্রেলিয়া									
ডন ব্রাডম্যান	২৯	১৯	০	৪	২	০	৪	০	০
গ্রেগ চ্যাপেল	২৪	৯	০	০	৫	৩	১	৬	০
নিল হার্ভে	২১	৬	০	৮	৩	০	৪	০	০
এলান বর্ডার	১৮	৫	০	০	২	৩	৩	৫	০
ডগ ওয়ালটার্স	১৫	৪	০	০	৬	৩	১	১	০
ইয়ান চ্যাপেল	১৪	৪	০	০	৫	২	২	১	০
বিল লরি	১৩	৭	০	১	৪	০	১	০	০
আর্থার মরিস	১২	৮	০	২	১	০	১	০	০
লিন্ডসে হ্যাসেট	১০	৪	০	৩	২	০	১	০	০
বব সিম্পসন	১০	২	০	১	১	০	৪	২	০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ									
গ্যারি সোবার্স	২৬	১০	৪	০	০	১	৮	৩	০
ক্লাইভ লয়েড	১৯	৫	৬	০	০	০	৭	১	০
ভিভিয়ান রিচার্ডস	১৯	৭	৪	০	০	১	৬	১	০
রোহান কানহাই	১৫	৫	৫	০	০	০	৪	১	০
ক্লাইড ওয়ালকট	১৫	৪	৫	০	০	১	৪	১	০
এভারটন উইকস	১৫	৩	১	০	০	৩	৭	১	০
গর্ডন গ্রিনিজ	১২	৫	২	০	০	১	৩	১	০
অ্যালভিন কালিচরণ	১২	২	৪	০	০	২	৩	১	০
জর্জ হ্যাডলি	১০	৮	২	০	০	০	০	০	০

ইংলন্ড									
জিওফ বয়কট	২২	০	৭	১	৫	২	৪	৩	০
কলিন কাউড্রে	২২	০	৫	৩	৬	২	৩	৩	০
ওয়ালটার হ্যামন্ড	২২	০	৯	৬	১	৪	২	০	০
কেন ব্যারিংটন	২০	০	৫	২	৩	৩	৩	৪	০
লেন হাটন	১৯	০	৫	৪	৫	৩	২	০	০
ডেনিস কম্পটন	১৭	০	৫	৭	২	২	০	১	০
হারবার্ট সাটক্লিফ	১৬	০	৮	৬	০	২	০	০	০
জ্যাক হবস	১৫	০	১২	২	১	০	০	০	০
ইয়ান বথাম	১৩	০	৩	০	০	৩	৫	২	০
পিটার মে	১৩	০	৩	৩	৩	৩	১	০	০
জন এডরিচ	১২	০	৭	০	১	৩	১	০	০
ডেভিড গাওয়ার	১২	০	৫	০	১	৩	১	২	০
ডেনিস অ্যামিস	১১	০	০	০	৪	২	২	৩	০
টম গ্রেভনী	১১	০	১	০	৫	০	২	৩	০
পাকিস্তান									
জাভেদ মিয়াদাদ	১৪	০	৪	০	০	৫	৪	০	১
হানিফ মহম্মদ	১২	৩	২	০	২	৩	২	০	০
জাহির আব্বাস	১২	২	২	০	০	১	৬	০	১
আসিফ ইকবাল	১১	৩	৩	০	১	৩	১	০	০
মুস্তাক মহম্মদ	১০	৩	১	০	২	৩	১	০	০

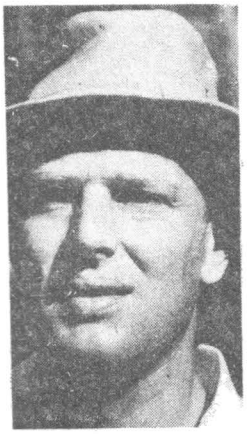

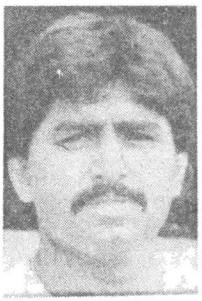

গল্প নয় সত্যি

ডার্বিশায়ারের বোলার জন কেলির নাম চট করে ভোলা যাবে না। ১৯৫৫ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তিনি ল্যাংকাশায়ারের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে একটি অভাবনীয় নজির গড়ে বসেন। পরের দিন সব খবরের কাগজে তাঁর বোলিংয়ের হিসেব বেরিয়েছিলো এই রকম–

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
০	০	৪	০

কি করে হলো?

সেইটাই তো মজার। কেলি মাত্র একটা বল করেছিলেন। সেটি 'নো' বল হয়েছিল। এবং ব্যাটসম্যান জ্যাক ডাইসন সেটি বাউন্ডারিতে পাঠিয়েছিলেন।

* * * * *

আরও মজার ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৫-৩৬ সালে। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ইংলন্ডের টেস্ট খেলায়। জে. এইচ. হিউম্যান মাত্র এক ওভারই বল করেছিলেন। তাঁর বোলিংয়ের হিসেব ছিলো–

১	১	^	০

কিন্তু হিউম্যানের ওভারের শেষে প্রতিপক্ষ দলের ২৪ রান বেড়ে গিয়েছিলো। কি করে হলো? হিউম্যান ইচ্ছে করেই ছটি বল ওয়াইড দিয়েছিলেন এমনভাবে যাতে বলগুলি বাউন্ডারি লাইন পার হয়ে যায়। হয়েও ছিলো তাই।

* * * * *

মেডেন ওভারের ব্যাপারে ইংলন্ডের ডব্লিউ ক্লার্ক আর ভারতের বাপু নাদকার্নীর নাম চিরকাল ক্রিকেট রেকর্ডসের পাতায় জ্বলজ্বল করবে। ১৮৮২ সালে ক্লার্ক মিডলসেক্সের পক্ষে খেলতে নেমে নটিংহ্যামশায়ারের বিরুদ্ধে দারুণ বল করেছিলেন। তাঁর বোলিংয়ের হিসেব দাঁড়িয়েছিলো–২৫.২-২৪-৩-১। ক্লার্কের ১০২টি বলের মধ্যে মাত্র একটি বলে তিন রান উঠেছিলো।

১৯৬৪ সালে মাদ্রাজে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ভারতের বাপু নাদকার্নী দুর্দান্ত বল করেছিলেন। তাঁর বোলিংয়ের হিসেব দাঁড়িয়েছিলো–৩২-২৭-৫-০। খেলার শেষে ইংলন্ডের ব্যাটসম্যানরা বলেছিলেন–বাপুকে মারা অসম্ভব।

ক্রিকেটের লর্ড ক্লাইভ

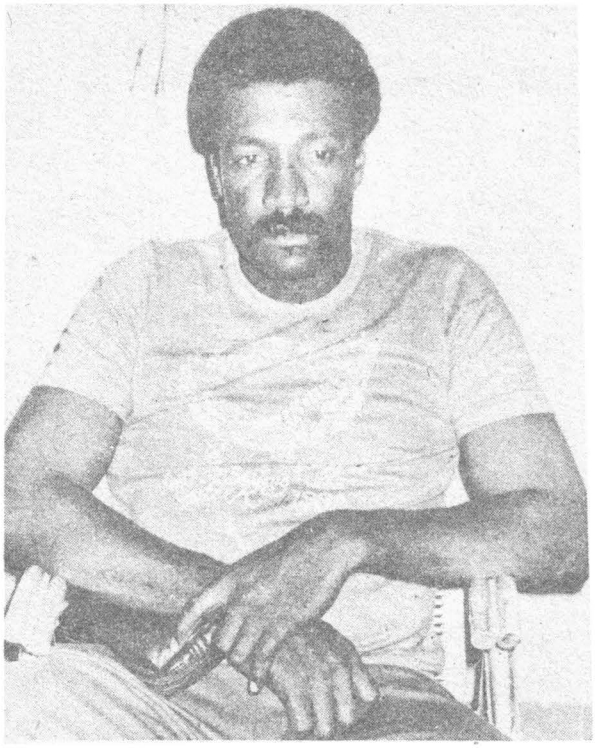

এগারো

ক্লাইভ ভারতে খেলতে এসেছে।

গ্যারি সোবার্সের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলোয়াড় সে। তার মনে আনন্দ আর চাপা উত্তেজনা। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের যে কোনো ছেলের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে চান্স পাওয়া একটা মস্ত বড় স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু টেস্ট খেলার সুযোগ কি সে পাবে ? ক্লাইভ জানে সে সম্ভাবনা খুবই কম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঝের সারির ব্যাটিং দারুণ শক্তিশালী। কানহাই, বুচার, নার্স আর সোবার্স। এই চারজনের কেউই দল থেকে বাদ পড়তে পারেন না। সুতরাং ক্লাইভের দলে আসার কোনো চান্সই নেই।

মনের মধ্যেটা খুঁত খুঁত করে। কিন্তু মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ক্লাইভ তাই ও-সব নিয়ে চিন্তা করে না। শুধু চেষ্টা করছে ভালো খেলার। টেস্ট ছাড়া অন্য সব খেলায় ভালো রান করে সবার নজর কাড়ার দিকেই তার নজর।

স্যার ফ্রাংক ওরেল তখন ভারতে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছেন। শুধু খেলোয়াড় বা প্রাক্তন অধিনায়ক বলে নন, ওরেল মানুষ হিসেবে ক্যারিবিয়ানবাসীর কাছে দেবতার মতো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা ওঁকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন। ওঁর কথা মেনে চলেন।

ওরেল তখন বোম্বাইয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলও সেখানে। ওরেল সুযোগ পেলেই খেলোয়াড়দের কাছে চলে আসেন। গল্পগুজব করেন। পরামর্শ দেন। সেদিন এসেই ডেকে পাঠালেন ক্লাইভ লয়েডকে। ছেলেটার ওপর তাঁর যথেষ্ট ভরসা আছে। ও ভালো খেলবেই।

ক্লাইভ এসে দাঁড়ালো ওরেলের সামনে। একটু ভয় ভয় করে। অতো বড় একজন মানুষের সংগে কথা বলতে সাহস পায় না। কিন্তু ওকে দেখেই হাসলেন ওরেল। বললেন,

আমরা তোমায় ইচ্ছে করেই ইংলণ্ডে নিয়ে যাই নি। ইংলণ্ডের আবহাওয়া ভীষণ খামখেয়ালি। একজন নতুন খেলোয়াড়ের পক্ষে ঐ পরিবেশ মানিয়ে নেওয়া রীতিমতো কষ্টকর। আমরা চাই নি, খেলোয়াড় জীবনের শুরুতেই তুমি ধাক্কা খাও। আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, তোমায় ভারতে আনা হবে। ভারতের আবহাওয়া অনেকটা আমাদের দেশের মতোই। তোমার খুব একটা অসুবিধে হবে না।

ক্লাইভ চুপ। একমনে স্যার ফ্রাংকের কথা শুনে যাচ্ছে। ওরেল বললেন,

ক্লাইভ, তোমার ওপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা। ভারতে তুমি ভালো খেলবে বলেই আমার বিশ্বাস। বেস্ট অফ লাক।

ওরেলের কথা শুনে ক্লাইভ খুব খুশি। কিন্তু বোম্বাই টেস্টের আগের খেলাটিতে ৩৯ আর ১৫ রান করায় ওর মনটা একটু খারাপ। ও বুঝতে পেরেছিলো টেস্ট দলে ঢোকার ওর কোনো চান্স নেই। হয়তো অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে তাকে মাঠে নামতে হবে। একটু আধটু ফিল্ডিং করেই ওকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

খেলার দিন সকালে ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে ও তাই হাল্কা মেজাজেই ছিলো। কখনো ফিল্ডিং করছে, কখনো ব্যাটিং করছে। ওপাশে পাতৌদির নেতৃত্বে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা অনুশীলন করছে।

ক'দিন আগে সেমুর নার্সের আঙুলে চোট লেগেছিলো। আঙুলটা তখনো অল্প ফুলে। খেলার দিন

সকালে নার্সের আঙুল পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু তাঁকে খেলতে নিষেধ করলেন। গ্যারিও সায় দিলেন।

খেলা আরম্ভ হতে তখন ঘন্টাখানেক দেরি। গ্যারি এগিয়ে গেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেটের দিকে। স্লাইভকে ডাকলেন। বললেন, স্লাইভ তুমি খেলবে। রেডি হয়ে নাও।

এ কী শুনছে স্লাইভ। ও যে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ও টেস্ট খেলবে। এতোকাল যে স্বপ্ন দেখে এসেছে আজ সেই স্বপ্নই সত্যি হতে চলেছে! মুহূর্তের জন্যে আনন্দে, উত্তেজনায়, আশংকায় ওর শরীরটা কেঁপে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে কিছু বলতে গেলো সোবার্সকে। কিন্তু ততোক্ষণে গ্যারি সেখান থেকে চলে গেছেন।

গিবস তখন নেটে বল করছেন। স্লাইভ ছুটে গেলো তাঁর কাছে।

দাদা, আমি খেলবো!

সত্যি?

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ল্যান্স গিবসের মুখ। হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দন করার জন্যে। কথাটা কানে যেতেই এগিয়ে এলেন রোহান কানহাই আর বেসিল বুচার। ওঁরা দু'জনেই খুব খুশি। ওঁরাও চাইছিলেন স্লাইভ খেলুক।

হাত বাড়িয়ে দিলেন কানহাই। বললেন, তোমায় আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। তুমি নিশ্চয়ই ভালো খেলবে।

বুচার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে দর্শকরা আসতে শুরু করেছেন। প্রচন্ড উত্তেজনা তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তরুণ খেলোয়াড় স্লাইভ লয়েডের মনে। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলবে সে। কি রকম যেন ভয় ভয় করছে তার। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।

ততোক্ষণে গ্যারি সোবার্স আর পাতৌদি টস করতে নেমে পড়েছেন।

টসে জিতলেন পাতৌদি। ভারতই আগে ব্যাট করবে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো লয়েড। বুকের মধ্যে পাথরের মতো যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো তা কেটে গেলো আস্তে আস্তে। যাক খানিকক্ষণ সময় পাওয়া গেলো। আজই ব্যাট করতে হবে না। তবে ফিল্ডিং করে ও সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে।

আনন্দে টগবগ করে উঠলো তরুণ খেলোয়াড় স্লাইভ লয়েডের মন।

ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠলো।

অধিনায়ক গ্যারি সোবার্সের পেছনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়দের সংগে বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট খেলতে নামলো গায়নার স্লাইভ লয়েড। আজ তার টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের মুহূর্ত।

ভারতের ইনিংসের শুরুটা কিন্তু মোটেই ভালো হলো না। মাত্র ১৪ রানের মধ্যে ভারত হারিয়ে বসলো তিনটি উইকেট। চতুর্থ উইকেটে ভারতীয় দলনেতা পাতৌদি ও সেলিম দুরানী রুখে দাঁড়িয়ে ৯৩ রান যোগ করলেন। ওঁরা হল, গ্রিফিথ আর সোবার্সকে আস্হার সংগেই খেলেছিলেন। তবে ভারতীয় দলের হিরো ছিলেন চান্দু বোরদে। বোরদে সেঞ্চুরি করলেন। তাঁর ১২১ রানের জন্যেই ভারত মোটামুটি ভদ্র গোছের রান ২৯৬ করতে পেরেছিলো।

এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাট করতে নামবে। সাজঘরে ভারতীয় স্পিনার চন্দ্রশেখরকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। তাঁকে কি করে খেলা যাবে--এই নিয়ে সকলেই আলোচনা করছেন। চন্দ্রর বলগুলো বেশ জোরেই আসে। বল ঘোরে আচমকা। তাঁর গুগলিগুলো বোঝাই যায় না।

চন্দ্রকে স্লাইভ খেলে নি। তাই সে চন্দ্রর বলের কথা যতো শোনে ততোই অবাক হয়। মনে মনে ভয়ও পায় একটু। চন্দ্রর বল যে কতোটা বিপদজনক তার প্রমাণ পাওয়া গেলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস আরম্ভ হতে না হতেই। ওপেনিং ব্যাটসম্যান বাইনো ২ রানে, রোহান কানহাই ২৪ ও বেসিল বুচার ১৬ রানে আউট হলেন। তিনজনেই প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন চন্দ্রশেখরের বলে আউট হয়ে। হাল্ট লড়ছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন উইকেটে ৮২ রান। অবস্হা মোটেই ভালো নয়।

এই অবস্হায় ব্যাট করতে নামতে হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত স্লাইভ লয়েডকে। একটু ভয় ভয় করছে। মন দুলছে আশা-নিরাশার দোলায়। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি বুঝি চেপে ধরেছে স্লাইভকে।

সেই অস্বস্তি, ভয় ভয় ভাব ঝেড়ে ফেলে ব্যাট হাতে নিয়ে ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামের প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে এলো স্লাইভ। ধীর পায়ে এগিয়ে চললো উইকেটের দিকে.....।

[চলবে]

তোমাদের ? জিজ্ঞাসা

সোমনাথ চ্যাটার্জি (রবীন্দ্র সরণী, বাঁকুড়া)

উত্তরঃ তোমার গড়া সেরা বিশ্বদলের ১৪ জন খেলোয়াড়ের নাম ছেপে দেওয়া হলো–

গ্রেগ চ্যাপেল, সুনীল গাভাসকার, ক্লাইভ লয়েড, বব উইলিস, কপিলদেব, ডেনিস লিলি, রডনি মার্শ, ল্যান্স গিবস, অ্যারনল্ড, ডন ব্রাডম্যান, জিওফ বয়কট, কিরমানি, বথাম ও চন্দ্রশেখর।

জয়দীপ চক্রবর্তী (রেলগেট, বারাসাত)

উত্তরঃ তোমার গড়া শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দলটি হলো–

লালা অমরনাথ (অধিনায়ক), পংকজ রায়, সুনীল গাভাসকার, বিশ্বনাথ, মহিন্দর অমরনাথ, বিজয় হাজারে, অজিত ওয়াদেকার (সহ-অধিনায়ক), ভিনু মানকড়, প্রসন্ন, দিলীপ দোশি ও কিরমানি।

উদয় ভট্টাচার্য (লামডিং, আসাম)

প্রশ্নঃ বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোল দিয়েছেন কে?

উত্তরঃ স্পোর্টস কুইজে উত্তর তো আগেই দেওয়া হয়েছে।

প্রশান্ত ঘোষ (বাণেশ্বরপুর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্নঃ সুনীল গাভাসকার কোন্ দেশের বিরুদ্ধে প্রথমে টেস্ট সেঞ্চুরি করেছিলেন?

উত্তরঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে।

পার্থ মুখোপাধ্যায় (বাহির শ্রীরামপুর, কালীতলা, শ্রীরামপুর)

প্রশ্নঃ কত সালে ওলিম্পিক শুরু হয়?

উত্তরঃ আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়া ১৮৯৬ সালে শুরু হয়েছে।

প্রদীপকুমার ভক্ত ও স্টার বয়েজ ক্লাব (সোনালী মাইন্স সিংভূম, বিহার)

প্রশ্নঃ বর্তমান বিশ্বের তিনজন ব্যাটসম্যান, তিনজন বোলার ও তিনজন ফিল্ডারের নাম জানতে চাই।

উত্তরঃ ব্যাটসম্যান–সুনীল গাভাসকার, ভিভিয়ান রিচার্ডস ও অ্যালান বর্ডার।

বোলার–রিচার্ড হ্যাডলি, কপিলদেব ও ইয়ান বথাম।

ফিল্ডার–মহম্মদ আজহারউদ্দিন, গ্রেগ ম্যাথুজ ও ডেভিড গাওয়ার।

অলৌকিক

নন্দলাল ভট্টাচার্য

হাজার আড়াই বছর আগের কথা। তখন এদেশে রাজা ছিল, রাজ্য ছিল, রাজপুত্রও ছিল। ভাইই হোক আর যাই হোক, একটা রাজ্যে সিংহাসন যখন একটাই তখন মাত্র এক রাজপুত্রই বসবে–তাই রাজপুত্রদের মধ্যে ঝগড়া ছিল প্রায় নিত্য ঘটনা।

হিমালয়ের কোলে এমনি একটা ছোট রাজ্যের রাজপুত্র দেবদত্ত। রূপে গুণে সত্যিই সে রাজপুত্র। কিন্তু মনটা তার অনেকটা হায়নার মতো। কামড়াতে পারলে আর যেন কিছুই চায় না। তবু দেবদত্তের অনুগামী সঙ্গীসাথীর সংখ্যাটা হিংসে করবার মতোই।

সেদিক থেকে সিদ্ধার্থর সঙ্গীসাথীর সংখ্যা খুবই কম। সিদ্ধার্থও রাজপুত্র। ওই রাজ্যর সিংহাসনে দেবদত্ত নয়, তারই বসার কথা। কিন্তু রাজপুত্র হলেও সিদ্ধার্থ কেমন যেন উদাস। কোনো কিছুই তার ভাল লাগে না। তাই সঙ্গীসাথীও কম।

সঙ্গীসাথী কম থাকলে কি হবে, দেবদত্ত কোনভাবেই সিদ্ধার্থকে হারাতে পারে না। হিংসেটা দিনরাত তাই লালপিঁপড়ের মতো কামড়ায় আর দেবদত্ত নানা ফন্দি আঁটে সিদ্ধার্থকে হারাবার জন্য। কিন্তু এমনই কপাল দেবদত্তর, শক্তিতে বেশি হয়েও বারবার সে হেরে যায় সিদ্ধার্থর কাছে। মাঝেমধ্যে তো দেবদত্তর মনে হয়, সিদ্ধার্থ মানুষ নয়। কোনো অলৌকিক শক্তি কাজ করছে তার মধ্য দিয়ে।

রাজ্যের মানুষজনও অবশ্য তাই ভাবে। তবে তারা ভাবে সে শক্তি ভগবানের। ভগবানই জন্ম নিয়েছেন সিদ্ধার্থ হয়ে। দেবদত্ত কিন্তু ভাবে উলটো। তার ধারণা ভগবান নয়, শয়তান। শয়তানই জিতিয়ে দেয় সিদ্ধার্থকে। না হলে এমন কখনও হয়, না হতে পারে?

বয়স তখন তাদের বছর পনের ষোল। বারবার হেরে দেবদত্ত মনে মনে মতলব এঁটে সিদ্ধার্থর কাছে পাঠাল একটা ক্ষ্যাপা হাতি। হাতিটা মাহুত ছাড়া যাকে পায় তাকেই তুলে আছাড় মারে। দেবদত্ত ভাবল এর সামনে পড়লে সিদ্ধার্থর আর রক্ষে নেই।

গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে দেবদত্ত ক্ষ্যাপা হাতিটাকে পাঠাল সিদ্ধার্থর কাছে। হাতিটা সিদ্ধার্থর কাছে পৌঁছালে দেবদত্ত দূর থেকে গুনতে থাকে–এক, দুই তিন–হাতি এইবার আছাড় মারলে বুঝি সিদ্ধার্থকে।

কিন্তু ওকি কান্ড! পাগলা হাতি যে সিদ্ধার্থর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সিদ্ধার্থ চেয়ে আছে হাতির দিকে। হাতির শুঁড় নাড়া বন্ধ। স্থির দৃষ্টিতে হাতি তাকিয়ে আছে সিদ্ধার্থর দিকে।

কয়েকটা মুহূর্ত যেন ফ্রেমে আঁটা। তারপরই শুঁড় বাড়ায় হাতি। দূরে হাসি ফোটে দেবদত্তর মুখে। হাতি শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে সিদ্ধার্থকে। তুলে ধরে উঁচুতে। হাসি দেবদত্তর মুখে। এখুনি আছাড় মারবে হাতি–নিষ্কন্টক হবে দেবদত্তর সিংহাসন।

কিন্তু না, আছাড় নয়, আলতো ভাবে সিদ্ধার্থকে শুঁড়ে পাকিয়ে হাতি তাকে বসিয়ে দেয় নিজের পিঠে। তারপর হেলতে দুলতে চলে যায় রাজপ্রাসাদের দিকে।

সেদিন রথ প্রতিযোগিতায় হেরে যতটা না কষ্ট হয়েছিল দেবদত্তর, আজ ক্ষ্যাপা হাতির এই ব্যবহারে তার চেয়ে অনেক বেশি রাগ হলো তার।

হিমালয়ের এই রাজ্যটায় রাজপুত্রদের সেবার রথ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দেবদত্ত, আনন্দ, নন্দ, সিদ্ধার্থ সবাই এসেছে। সিদ্ধার্থর কোনো কিছুতেই মন নেই। সেটা শুধু দেবদত্ত কেন, সারা রাজ্যের মানুষই জানে। প্রতিযোগিতার ময়দানে সেদিন সবাই এসেছিল দেবদত্তর জয়ই দেখতে। যদিও তারা দেবদত্তর চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করত সিদ্ধার্থকে। কিন্তু যে অভ্যাস করে না, মন লাগিয়ে কোনো কাজ করে না–প্রতিযোগিতায় জেতা দূরে থাক, যোগ দেবার সুযোগই তার কম। তবু রাজপুত্রদের প্রতিযোগিতা বলেই সিদ্ধার্থ যোগ দিতে পেরেছে। যোগ দিলেও সিদ্ধার্থই যে শেষের জায়গাটা দখল করবে সে ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত।

প্রতিযোগিতার জায়গায় লোকে গমগম করছে। একপাশে বসে আছেন রাজা তাঁর মন্ত্রী কোটালদের নিয়ে। একপাশে রয়েছেন অন্তঃপুরিকারা। প্রতিযোগিতার মাঝখানের জায়গায় রয়েছে পরপর রথ–

সারনাথের বুদ্ধমূর্তি

সামনে তার তেজী ঘোড়া।

একসময় দেবদত্ত, আনন্দ, নন্দ, সিদ্ধার্থ এল প্রতিযোগিতার জায়গায়। প্রণাম করল রাজাকে। তারপর এগিয়ে গেল রথের দিকে। সবাই অবশ্য নয়। সিদ্ধার্থ বাদে বাকি তিনজন। প্রণাম করার পরও সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে আছে প্রায় একই জায়গায়–কেমন যেন শান্ত, নিরাসক্তভাবে।

সিদ্ধার্থকে ওইভাবে দেখে রাজা থেকে সবাই ধরে নিলেন ভয় পেয়েছে সিদ্ধার্থ। লজ্জায় রাজা প্রায় মাথা নিচু করেন। তাঁর পরে যে বসবে এই সিংহাসনে সে আজ জেতা দূরে থাক, রথে উঠতেই ভয় পাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ।

আনন্দ, দেবদত্ত, নন্দ এগিয়ে গেল তিনটে রথের দিকে। অবাক ব্যাপার, রথে তারা উঠতেই পারল না প্রথমে। রথের ঘোড়া তাদের তিনজনকে করল ধরাশায়ী। তারপর অনেক কষ্টে তারা উঠল রথে।

ঘোষক ঘোষণা করে প্রতিযোগিতার সময় হয়েছে। সিদ্ধার্থ শান্ত পায়েই এগিয়ে গেল রথের দিকে। ঘোড়ার সামনে এসে সামান্য চাপড়ে দিল তার গা। তারপর অবলীলায় ঘোড়ায় উঠে যোজনা করল রথ।

সিদ্ধার্থর রথ যোজনা দেখে রাজা থেকে সবাই এবার অবাক। অন্যরা যেখানে ঘোড়াতে উঠতেই পপাত ধরণীতলে সেখানে কত সহজেই না ঘোড়া মাথা নিচু করে মেনে নিল সিদ্ধার্থকে। এতে শুধুই কৌশল নয়, নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনো ক্ষমতা রয়েছে সিদ্ধার্থর।

শুরু হলো প্রতিযোগিতা। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, আরো জোরে–শেষে দেখা যেতে লাগল শুধুই পুঞ্জীভূত ধুলো। সিদ্ধার্থ চোখের নিমেষে পার হয়ে চলে গেল রাজ্যের সীমা। তারপর যখন ফিরে এল আবার রাজার কাছে রথ নিয়ে দেবদত্তরা তখনও পার হতে পারেনি রাজ্যের সীমা।

সেদিনের হারকে সহজ মনে সবাই নিল, এক দেবদত্ত ছাড়া। তার নিশ্চিত বিশ্বাস এর পেছনে অন্য কারণ আছে। আজ ক্ষ্যাপা হাতি মাথা নিচু করাতে সন্দেহ হলো আরো দৃঢ়। দেবদত্ত নিশ্চিত, এটা শয়তানের কাজ। বোকা লোকে একেই ভাবে ভগবানের কাজ।

এরপর যেদিন সিদ্ধার্থ একটা বিরাট মরা হাতির লেজ ধরে বেশ করে ঘুরিয়ে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলল সেদিন দেবদত্তর আর কোনো সন্দেহই রইল না।

দেবদত্ত যাই ভাবুক, রাজা থেকে শুরু করে রাজ্যের আর কেউ কিন্তু সে কথা ভাবে না। ভাববে কি করে, তাদের যে অন্যরকম ধারণা।

ছোট্ট সেই রাজ্যটার নাম কপিলাবস্তু। রাজার নাম শুদ্ধোদন। তাঁর অনেক রাণীর মধ্যে মায়া দেবীর যখন সন্তান হবার সময় হলো তখন এক আশ্চর্য আনন্দে ভরে উঠল রাজার মন। আর রাণীর যেন আনন্দের সীমা নেই।

সেদিন গভীর রাতে স্বপ্ন দেখছেন রাণী মায়া দেবী। দেখলেন কোথা থেকে দেবদূতরা এসে অপূর্ব সুন্দর একটি খাটে বসিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন এক রমণীয় হ্রদের কাছে। সাদা পদ্মে ভরে গেছে হ্রদ। চাঁদের আলোয় আর পদ্মের গন্ধে চারিদিক যেন আমোদিত। সেই হ্রদে খেলা করছে অপরূপ এক শ্বেতহস্তী। হাতিটা মায়া দেবীকে দেখেই যেন খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি শুঁড়ে করে একটি সাদা পদ্ম ছিঁড়ে নিয়ে হাতিটা সেই পদ্ম প্রবেশ করিয়ে দিল রাণীর দক্ষিণ কুক্ষিতে।

ঘুম ভেঙে গেল রাণীর। স্বপ্নের কথা তিনি বললেন রাজা শুদ্ধোদনকে। শুনে ভয় হলো রাজার। তিনি বললেন সভাপণ্ডিতদের। তাঁরা সব শুনে নানা দিক বিচার বিবেচনা করে বললেন, মায়া দেবীর গর্ভে আসছেন এক দিব্য মহাপুরুষ। বললেন, সন্তানের জন্মের সাতদিনের মধ্যে মৃত্যু হবে মা'র।

একদিকে আনন্দ, একদিকে দুঃখ। দিন যায়। একসময়

মায়া দেবী চলেছেন তাঁর বাবার বাড়িতে। পথে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মায়া দেবী নামলেন এক গাছের তলায়।

অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখল, সেই গাছ আস্তে আস্তে তার ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাণীর জন্য তৈরি করে দিল যেন এক লতামণ্ডপ। সবার দৃষ্টির আড়ালে জন্ম হলো এক শিশুর—যার নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থর বয়স যখন মাত্র পাঁচদিন সেই সময় রাজ-প্রাসাদে এলেন তপস্বী নামে এক মুনি। গভীর অরণ্যে সাধনা করতেন তিনি। সেদিনই হঠাৎ এলেন রাজধানীতে। রাজাকে বললেন, তিনি দেখবেন তাঁর নবজাত সন্তানকে। সেকথা শুনে রাজা তাঁকে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে। সিদ্ধার্থকে দেখে মুনি একবার হো-হো করে হেসেই কেঁদে উঠলেন জোরে।

তপস্বী মুনির ওই হাসি আর কান্নার অর্থ বুঝতে পারেন না কেউ। শেষে রাজা শুদ্ধোদনই জিজ্ঞেস করলেন তপস্বী মুনিকে, আপনি হঠাৎ হেসেই বা উঠলেন কেন আর কাঁদলেনই বা কেন?

রাজার কথা শুনে তপস্বী বললেন, আপনার এই ছেলে বুদ্ধদেব। এর সঙ্গে এক জায়গায় থাকতে পারব না ভেবেই আমি কাঁদছি, আবার একে দেখে আমার সব পাপ আজ দূর হলো একথা ভেবে হাসছি আমি।

সিদ্ধার্থর জন্মের সাতদিনের মাথাতেই মারা গেলেন মা মায়া দেবী। সিদ্ধার্থ মানুষ হতে থাকল অন্য মা গৌতমীর কাছে। তাই তাঁর আর এক নাম গৌতম।

রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে দেখেন আর ভাবেন, এ ছেলের তাঁর সবই অদ্ভুত। যেমন অতুলনীয় রূপ তেমনি দেহের গঠন। সবচেয়ে অবাক করে তাঁকে সিদ্ধার্থর মাথার উষ্ণীষের চিহ্নটি।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন তখন পণ্ডিতদের এর কারণ। তাঁরা গণনা করে বললেন, শাস্ত্রে মহাপুরুষের যে ৩২ রকম লক্ষণ রয়েছে, তার সব কটিই রয়েছে এই শিশুর দেহে।

পণ্ডিতদের কথায় আনন্দ হয় রাজার আবার এ ছেলে সব ছেড়ে একদিন সন্ন্যাস নেবে একথা জেনে কষ্টও হয়। সিদ্ধার্থকে তিনি নানারকম সুখ এবং আমোদ আহ্লাদের মধ্যে রাখেন। তা সত্ত্বেও একদিন সিদ্ধার্থ স্ত্রী-পুত্রকে রেখে ঘর ছাড়ল। কঠিন তপস্যার পর হলো বুদ্ধ। নাম হলো তাঁর বুদ্ধদেব। ভারতকেই শুধু নয়, সারা বিশ্বকে বুদ্ধদেব দিলেন এক নতুন ধর্ম—নাম যার বৌদ্ধধর্ম—প্রেম প্রীতি করুণা আর অহিংসা যে ধর্মের মন্ত্র।

অনুবাদ সিরিজ

প্রত্যেক মাসে একটি করে নতুন বই বেরুচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্যের মণি মুক্তার সংগ্রহশালায় আমাদের নতুন সংযোজন।

১ মার্চ বেরিয়েছে

জ্যাক লন্ডনের

দ্য কল অব দ্য ওয়াইল্ড

১ ফেব্রুয়ারি বেরিয়েছে

নুট হ্যামসুনের

ভ্যাগাবণ্ডস্

১লা জানুয়ারি বেরিয়েছে

ম্যাকস ডানস্টোনের

কর্নেট অফ ড্রাগুন্স্

১লা ডিসেম্বর বেরিয়েছে

মেরি করোলির

দ্য সিক্রেট পাওয়ার

প্রত্যেকটি বই ছবিতে ভরা। দাম মাত্র আট টাকা করে।

অনুবাদ সিরিজের আরও ক'য়েকটি বই

দ্য ফিফথ কলামঃ টয়লার্স্ অফ দি সীঃ গ্রেট্ এক্সপেক্টেশন্স্ঃ দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুনঃ দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডসঃ রব রয়ঃ সাইলাস মার্নারঃ দ্য পাথ ফাইণ্ডারঃ দ্য কনস্পিরেটর্সঃ এ কানেক্টিকাট ইয়াংকি ইন্ কিং আর্থার্স কোর্ট: এ্যালিস'স এ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৯

ইলেকট্রিক জীবাণু

অদ্রীশ বর্ধন

প্রাইভেট ট্যাক্সি যখন দার্জিলিংয়ে ঢুকল, তখন রাত নটা। শহর অন্ধকার। দোকানপাট বন্ধ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

সুদর্শন, শিক্ষিত, নেপালী ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলায় বললে–"টুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে চলে যান। মিনিট দশেকের পথ। জলাপাহাড় যাওয়ার রাস্তায় পাবেন আপনাদের হোটেল।"

বলে, চৌমাথা থেকে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিল বোঁ করে। বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গেল ঝকঝকে নতুন অ্যামবাসাডর।

দু হাতে দুটো সুটকেশ নিয়ে গরম জামাকাপড় পরেও ভিজতে ভিজতে শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলাম আমি। নিষ্প্রদীপ, তমিস্রাময়, কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ঢাকা এ শহরকে কে বলবে রাণী শহর।

মনটা দমে গেল খুবই। অন্ধকারে আর বৃষ্টির ধারায় বুঝতেও পারছি না কোন রাস্তাটা দিয়ে একটু উঠলে টুরিস্ট লজের পাশ দিয়ে জলাপাহাড়ের যাওয়ার পথে পৌঁছব।

তিরিক্ষে গলায় পেছন থেকে বললেন প্রফেসর নাট বল্টু চক্র–"কিহে, দীননাথ? বলেছিলাম না, উড়ো খবর শুনে ছুটে এসো না? ছো! ইলেকট্রিক বিভীষিকা দেখাবে! ইলেকট্রিকই নেই গোটা টাউনে–"

কথাটা শেষ করতে পারেন নি প্রফেসর।

আচমকা ডানদিকের ওপর দিকের একটা বাড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলো ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল। নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার ওয়াট যেন ফেটে পড়ল পাহাড়ি কটেজে। পরক্ষণেই শোরগোল, আর্তনাদ, চিৎকার।

বিস্ফোরণের আওয়াজটা কানে ভেসে এল তারপরেই। ঘাড় তুলে দেখলাম, অত্যুজ্জ্বল আলোক বিস্ফোরণ অন্তর্হিত হয়েছে। দার্জিলিং যেমন নিষ্প্রদীপ ছিল, তেমনই রয়েছে। শুধু যে বাড়িটায় অকস্মাৎ আলোর বন্যা বয়ে গেল, তা চৌচির হয়ে ওপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের রাস্তার দিকে পড়ছে!

এ সব পরিস্থিতিতে চিরকালই আমার হাতে পায়ে ইলেকট্রিক খেলে যায়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ দেয়। ধসে পড়া কটেজের তলায় আমি আর প্রফেসর চাপা পড়তে চলেছি, বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সুটকেশ দুটো ফেলে দিয়ে প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম এবং তীরবেগে নেমে গেলাম হিলকার্ট রোড বেয়ে নিচের দিকে।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম দুজনে, প্রচন্ড শব্দে ভাঙা কটেজ এসে পড়ল সেখানে।

কোলবন্দী হয়ে হাত পা ছুঁড়ছিলেন প্রফেসর। নামিয়ে দিলাম রাস্তায়। বললাম ঠান্ডা গলায়–"দেখতেই পেলেন, উড়ো খবর নয়। ইলেকট্রিক বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটেছে দার্জিলিংয়ে।"

শোরগোল তখনও থামে নি। আশপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেকেই। তাদেরই একজন শুনতে পেল আমার কথা। দাঁড়িয়েছিল পেছনেই। হাতে টর্চ। বললে বাংলায়–"ইলেকট্রিক বিভীষিকাই বটে। এত দিন হচ্ছিল নিচের ভুটিয়া গ্রামে। এই প্রথম দেখা গেল ম্যালের এত কাছে। খুব জোর বেঁচে গেলেন। কলকাতা থেকে আসছেন?"

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম–"হ্যাঁ। যাবো সানগোল্ড হোটেলে। রাস্তা চিনতে পারছি না।"

ভদ্রলোক মাঝবয়সী। চোখে রিমলেশ চশমা। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। বেশ বিদগ্ধ পুরুষ বলেই মনে হল। টর্চের আলোয় এর বেশি আর দেখা গেল না।

বললেন–"চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি। আপনাদের মালপত্র?"

"ভাঙা কটেজের তলায়।"

"চলুন তো দেখি টেনে বার করা যায় কিনা।"

আধঘণ্টা পরে সানগোল্ড হোটেলে পৌঁছে দিলেন ভদ্রলোক। একটা সুটকেশ নিজেই বয়ে নিয়ে এলেন–আর একটাকে বইলাম আমি।

হ্যাজাক জ্বলছে ডাইনিং হলে। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম–"আপনি না থাকলে খুবই কষ্ট হত। আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।"

"ক্যাপ্টেন কাকা বলেই সবাই আমাকে চেনে এখানে। পার্মানেণ্ট বাসিন্দা–টুরিস্ট নই। আপনারা?"

"আমাকে শুধু দীননাথ বলেই ডাকতে পারেন–কেউ চেনে না–আপনিও চিনবেন না। তবে এঁকে অনেকে চেনেন।" বললাম প্রফেসরকে দেখিয়ে।

"কে বলুন তো?"

"প্রফেসর নাট বল্টু চক্র।"

"মাই গড! আগে বলবেন তো? টেলিফোনটা আমিই তো করেছিলাম।"

"আপনি? নাম বললেন না কেন?"

রিমলেশ চশমার আড়ালে অদ্ভুত ঝিলিক দেখলাম। ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসলেন ক্যাপ্টেন কাকা।

বললেন–"এখানে যা ঘটছে, তা অবিশ্বাস্য। তাই নাম জানিয়ে হাস্যাস্পদ হতে চাইনি। তবে আপনারা এলেই আমি নিজেই যেতাম।"

"কেন?"

"কারণ," একটু থেমে আবার সেই বিচিত্র হেসে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা–"সব কটা স্ট্রেঞ্জ কেস আমার সামনেই ঘটেছে।–আচ্ছা চলি। কাল সকালে দেখা হবে।"

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ক্যাপ্টেন কাকা। ঢালু রাস্তায় দূর থেকে দেখতে পেলাম তাঁর টর্চের আলো ম্যালের দিকে নেমে যাচ্ছে।

কিন্তু একটা খটকা রেখে গেলেন মাথার মধ্যে।

পেছনে দাঁড়িয়ে উনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে প্রফেসরের কথাবার্তা শুনেছিলেন। উড়ো খবর নয়–এ কথাটা আমিই বলেছিলাম প্রফেসরকে। ক্যাপ্টেন কাকা অবশ্যই তা শুনেছেন।

তা সত্ত্বেও আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন কেন? নাম গোপন করে টেলিফোন তো উনিই করেছিলেন!

ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলেন ক্যাপ্টেন কাকা।

দিনের আলোয় আরও স্পষ্টভাবে দেখলাম চেহারাটা। কি রকম যেন জেলী মাছের মতো থসথসে বপু। শীতবস্ত্র চাপিয়েও চাপা পড়ে নি। মাথায় নেপালী টুপি, কাল রাতেও দেখেছিলাম। এখনও দেখলাম। মুখখানা অদ্ভুত রকমের সাদা। সাবুর পাঁপড় ভাজা যেন। সেই রকম অজস্র আঁচিল। সাদা আঁচিল। জীবনে দেখি নি। আঁচিল লাল হয় জানি, সাদা কি কখনো হয়? সন্দেহ হল, খালি গায়ে থাকলে সারা গায়েও হয়ত দেখতাম সাদা আঁচিল। ভাগ্যিস মুখখানা দাড়ি গোঁফে ঢাকা, নইলে ও মুখের দিকের তাকালে গা শিরশির করে উঠত।

প্রফেসর কিন্তু যেন বেশ মজাই পাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন কাকার মুখশ্রী দেখে। যদিও গতকাল থেকে খেপে ছিলেন আমার ওপর জোর করে দার্জিলিংয়ে টেনে আনায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন কাকা চশমার কাঁচে আর সাদা দাঁতে ঝিলিক তুলে টেবিলে এসে বসতেই বেশ খুশি হয়েই উঠতে দেখা গেল বৃদ্ধকে।

স্বাগতম জানালেন উদাত্ত গলায়–"আসুন, আসুন, ওয়েট করছি আপনার জন্যেই। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

কি ব্যাপার, তা আর ব্যাখ্যা করে না বললেও ক্যাপ্টেন কাকা বুঝলেন। সুতরাং আর ভণিতা করলেন না।

বললেন–"পেশায় আমি ডাক্তার। ছিলাম আর্মিতে। রিটায়ার করে প্র্যাকটিশ করছি এখানে। কিছুদিন আগে একটা রুপোলি চোঙা দার্জিলিংয়ের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে কোবিং চা বাগানে পড়ে ফেটে যায়। ইলেকট্রিক বিভীষিকা দেখা দিয়েছে তারপর থেকেই।"

"রুপোলি চোঙা?" প্রফেসর যেন খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল।

"হ্যাঁ। দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেছিল। নইলে বলতাম উল্কাপাত।"

"নিশ্চয় স্যাটেলাইট। কক্ষপথ থেকে খসে পড়েছে।"

"উল্কা নয়, স্যাটেলাইটও নয়," স্পষ্ট করে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা।

"কেন নয়?" হেসে হেসে বললেও বেশ চোখা প্রশ্নই করলেন প্রফেসর, এবং ঝটিতি তার জবাবও দিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন কাকা চোখে মুখে হেসে হেসেই।

"প্রফেসর, আর্মি এক্সপিরিয়েন্স ছিল বলেই আপনাকে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারসমেত অ্যানসারটা দিতে পারব। গ্রেট সাইবেরিয়ান এক্সপ্লোশনের কথা নিশ্চয় ভোলেন নি?"

"১৯০৮ সালের তিরিশে জুন রাশিয়ার পুব অঞ্চলে–"

"টুংগাসকায় নাকি হাজার হাজার টন ওজনের একটা বিকল মহাকাশযান শূন্যপথেই ফেটে গিয়ে বার হাজার বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করেছিল–এতই পাওয়ারফুল ছিল তার এনার্জি।"

"বাঃ! বাঃ! অনেক খবর রাখেন তো দেখছি!" হল কি প্রফেসরের? এত ফূর্তি তো অনেকদিন দেখা যায় নি ওঁর কথাবার্তায়?

"তা রাখি। আমার হবি যে তাই", থেমে থেমে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা।

"হবি! গাঁজাখুরি ব্যাপারের হবি?"

গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন কাকা–"গাঁজাখুরি কিনা জানি না, তবে বলিভিয়ার এক্সপ্লোশনে যে সাড়ে দশ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্র্যানাইট ভেপার হয়ে উড়ে গেছিল–সেটা চোখে দেখেছি।"

"বলিভিয়ায়? কবে? কখন? কিভাবে?" প্রফেসর বেশ নির্বিকার।

"আমি তখন ছিলাম বলিভিয়ার তারজা আর আর্জেন্টিনার বর্ডারে। হঠাৎ একটা দারুণ হুইসলিং শব্দ শুনলাম মাথার ওপর। দেখলাম, লকলকে আগুনের শিখা দিয়ে ঘেরা একটা জিনিস উড়ে যাচ্ছে ১২০ মিটার উঁচু দিয়ে। তারপরেই শুনলাম বাজ পড়ার মতো শব্দ। আমার ডান কানের পর্দাটা ফেটে গেছে সেদিন থেকেই। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সারা শরীর।"

"আহা! আগে বলবেন তো?" কাঁচুমাচু মুখে বললেন প্রফেসর–"তারপর?"

"জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছেন?" ক্যাপ্টেন কাকার কণ্ঠস্বর এবার একটু কঠিন।

"উড়ন চাকি?"

"হ্যাঁ। সেইদিনই বিকেল সাড়ে চারটের সময়ে আবার সাংঘাতিক সেই হুইসলিং শব্দ শোনা গেল মাথার ওপর। প্রায় তিনশ ফুট ওপরে দেখলাম আশ্চর্য এক দৃশ্য। একটা ধাতুর চোঙা। ক্রোম স্টীলের চাইতেও চকচকে। লালচে কমলা রঙের স্ফুলিংগ ঠিকরোচ্ছে সামনের দিক থেকে। লম্বাটে ডিমের মতো গড়ন। নীলচে ধোঁয়া বেরচ্ছে।"

"বেশ?" প্রফেসর এবার কিন্তু শুনছেন কান খাড়া করে।

"খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল অদ্ভুত সেই আকাশযান–ঘণ্টায় মাত্র ২২০ মাইল স্পীডে। দরজা, জানলার বালাই নেই–খোঁচা বেরিয়েও নেই কোথাও। লম্বায় প্রায় ৩০ ফুট, চওড়ায় ২০ ফুট। ঠিক যেন একটা কামানের গোলা–আর্টিলারি শেল–ক্রোম প্লেটেড। টার্গেটটা মনে হল ১২ মাইল দূরের এল টেয়ার পর্বতচূড়া!"

"ফাইন! তারপর?" ঝুঁকে বসেছেন প্রফেসর। "কতদিন আগের ঘটনা বলছেন বলুন তো?"

"১৯৭৮ সালের ৬ই মে'র ঘটনা।–তিন মিনিট পনের সেকেন্ড পরে চোঙাটা আছড়ে পড়ল টার্গেটে–মানে, এল টেয়ারের চূড়োয়। দারুণ ফ্ল্যাশে অন্ধ হয়ে গেছিল বেশ কিছু লোক। আলোর ঝলক দেখা গেছিল ৯৩ মাইল দূরেও–মানে, প্রায় ৯০০ বর্গমাইল অঞ্চলের সবাই দেখেছিল আলোটা।"

"ব্রিলিয়ান্ট!" প্রফেসরের প্রীত মন্তব্য।

"কয়েক সেকেন্ড পরেই ঘটল ভয়ংকর এক্সপ্লোশন। ভেঙে গেল ৪৫ মাইল দূরের জানলার কাচ, শুনতে পেল ৫৭,০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের প্রত্যেকে।"

"ফিগারগুলো বেশ মনে রেখেছেন তো?"

"রাখতে হয়েছে," চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা–"ভূমিকম্প দেখা দিল তারপরেই।"

"ওয়ান্ডারফুল!" প্রফেসর কি তাতাচ্ছেন ক্যাপ্টেন কাকাকে?

"প্রায় পুরো সাউথ ডাকোটা জুড়ে, ৭৫৪৭৭ বর্গমাইল অঞ্চলে টের পাওয়া গেছিল ভূমিকম্পের রেশ।–প্রফেসর, সাইবেরিয়ায় নাকি উল্কা পড়েছিল–বলিভিয়ার ঘটনা নিজের চোখে দেখা। উল্কা বলে কি মনে হয়?"

"না, না, কখনই নয়," সজোরে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর।

"বেশির ভাগ উল্কাই পৃথিবীর দিকে ৩২,০০০ থেকে ৪৭,০০০ মাইলস পার আওয়ার স্পীডে ধেয়ে আসে। কখনও কখনও ঘণ্টায় ৯০,০০০ মাইল স্পীডও দেখা যায়। কিন্তু বলিভিয়ার উড়ুক্কু চোঙা এসেছিল খুব জোর ২২০ মাইলস পার আওয়ার স্পীডে।"

"রহস্যজনক ব্যাপার!"

"উল্কা নামে সোজাসুজি–দিকরেখার সংগে প্রায় নব্বই ডিগ্রী কোণে। কিন্তু বলিভিয়ার এই বিভীষিকা নেমেছিল দিকরেখার সংগে মাত্র ২৭ ডিগ্রী কোণে।"

"বলিভিয়ার বিভীষিকা! বেড়ে নামটা দিলেন বটে।" প্রফেসর হাসছেন ফিক ফিক করে।

জ্বলন্ত চোখের ফ্ল্যাশ দেখলাম ক্যাপ্টেন কাকার

রিমলেশ চশমার কাচ যুগলের আড়ালে।

বললেন দাঁতে দাঁত পিষে–"কেন দিয়েছি, সেটা পরের কথাটা শুনলেই বুঝবেন। রুপোলি চোঙার ঠিক পেছন পেছন উড়ে এসেছিল আর একটা চোঙা–সাইজে অনেক ছোট। প্রথমটা আছড়ে পড়তেই পেছনেরটা বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেল আকাশে।"

"তারপর?" প্রফেসর এখনও নিরুত্তাপ।

"বলিভিয়ার মিলিটারী অথরিটি বেশ কিছুদিন হৈ চৈ করেছিল বটে–কিন্তু ধামাচাপা পড়ে গেল তদন্ত, যখন দেখা গেল সাড়ে দশ মিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্র্যানাইট ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই ঘটে নি।"

"আপনি কিছু অঘটন আশা করেছিলেন মনে হচ্ছে?" আচমকা প্রশ্ন করলেন প্রফেসর। কণ্ঠস্বরে ঢিলে ভাবটা আর নেই, তীক্ষ্ণতা এসেছে।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেন কাকার চক্ষুযুগলও–"আজ্ঞে হ্যাঁ, আশা করেছিলাম। শুনবেন?"

"নিশ্চয়।"

"সাইবেরিয়ার এক্সপ্লোশন খুব বড় রকমের হয়ে গেছিল–কাজ হয় নি। বলিভিয়ার এক্সপ্লোশন তার চাইতেও কম হল–কিন্তু খুব সামান্য রকমের নয়–কাজেই সেখানেও কোনো ফল দেখা গেল না। তাই–"বলে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন কাকা।

চেয়ে রইলেন প্রফেসর নাট বল্টু চক্রও। আমি তো বটেই।

ফিস ফিস করে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা–"বিফলে যায় নি দার্জিলিংয়ের এক্সপ্লোশন। ছড়িয়ে পড়েছে ইলেকট্রিক জার্ম।"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন কাকা। ভুরু আর কপাল কুঁচকে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে রইলেন জানলা দিয়ে বাইরের কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ের দিকে।

স্পষ্ট মনে হল কি যেন শুনছেন। ডাইনিং হলে তখন জোর গুলতানি চলেছে। টেবিলে হাসিঠাট্টা চলেছে। স্টিরিও বাজছে।

ক্যাপ্টেন কাকার শূন্যগর্ভ চাহনি দেখে মনে হল না এসব শুনছেন।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম আমি আর প্রফেসর। ক্যাপ্টেন কাকা এমন কি শুনছেন যা আমাদের দুজনের কানেই ঢুকছে না?

আস্তে আস্তে চোখের পাতা নেমে এল ভদ্রলোকের ঈষৎ ড্যাবডেবে চোখ দুটোর ওপর। আধবোঁজা চোখে কি

প্রফেসর যেন মজা পাচ্ছিলেন ক্যাপটেনকে দেখে

যেন ভাবছেন!

উঠে পড়লেন হঠাৎ। দ্রুতকণ্ঠে বললেন–"কাজ আছে। বাকিটা পরে বলব।"

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন চটপট। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর খরখরে চোখে তাকালেন আমার দিকে।

বললেন–"ফলো হিম। দেখে এসো কোথায় যান। তোমাকে যেন দেখতে না পান।"

হোটেলের ডাইনিং হলটা রাস্তার ওপরেই। দরজা খুললেই চাতাল। দুপাশে সিঁড়ি নেমে গেছে সটান রাস্তার ওপর। সকালের দিকে জলাপাহাড়ের দিকে ঘোড়ায় চড়ে টুরিস্টরা যায় আবার ফিরে আসে।

চাতালে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম একদল ঘোড়সওয়ারকে। হৈ হৈ করতে করতে টগবগিয়ে চলে গেল জলাপাহাড়ের দিকে।

ক্যাপ্টেন কাকা কোথায়?

ঐ তো! প্রায় দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন নিচের গ্রামের দিকে। থসথসে বপুটা যেন শক্তির আঁধার। এত জরুরী কাজই যদি ছিল, আড্ডা মারতে এলেন কেন বুঝলাম না। তোফা প্রাতরাশটা আধখাওয়া অবস্থায় রেখে আসায় মেজাজ তখন ভাল নেই আমার। কিন্তু প্রফেসরের হুকুম। শুনতেই হবে। বুড়োর মুখখিঁচুনিও তো সহ্য হয় না।

দৌড়ে নেমে গেলাম রাস্তা ধরে। গ্রামে ঢুকলাম সেই

প্রথম। নামছি তো নামছিই। ক্যাপ্টেন কাকাও পাঁই পাঁই করে দৌড়চ্ছেন বললেই চলে। ঘাড় বেঁকিয়ে ওপর দিকে তাকালাম। অনেক উঁচুতে সানগোল্ড হোটেল দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের প্রায় তলায় চলে এসেছি বললেই চলে। ছোট ছোট কটেজ প্যাটার্নের বাড়ির শেষ নেই। পাহাড়ের ঢালু গায়ে একটার পর একটা কটেজ। দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি ক্যাপ্টেন কাকাকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিচ্ছে গাঁয়ের লোক। একজন একটা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল ম্যালের দিকে–ভাড়া খাটানোর জন্যে। ক্যাপ্টেনকে দৌড়ে নামতে দেখে ঘোড়া দাঁড় করাল সামনে। কি যেন বলল ঝুঁকে পড়ে। টপ করে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে বসলেন ক্যাপ্টেন। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ঘোড়ার।

চশমার কাচ ঝলসে উঠল ঠিক সেই সময়ে।

স্পষ্ট মনে হল, পলকের জন্যে আমাকে দেখে নিলেন কাকা। যদিও আমি অনেক পেছনে। কিন্তু উনি যেন ঠিক আমার দিকেই তাকালেন।

পরক্ষণেই মুখ ঘুরে গেল ঘোড়ার। মোড় ঘুরে উধাও হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল অশ্বক্ষুরধ্বনি।

সব শুনলেন প্রফেসর।

শুনে-টুনে বললেন–"হুঁ।"

"হুঁ মানে?" ঠান্ডা ওমলেট গব গব করে খেতে খেতে বলেছিলাম আমি–"ভদ্রলোকের চোখ দুটো দেখেছেন?"

"তুমি শুধু চোখই দেখলে? আর কিছু দেখলে না?" বলেই অন্য কথায় চলে গেলেন প্রফেসর–"ফাইন ওয়েদার। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।"

দুপুরবেলা সবে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকেছি, আবির্ভূত হলেন ক্যাপ্টেন কাকা।

ঘরে ঢুকেই আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুত হেসে বললেন–"সরি। আর একটা ঘোড়া থাকলে আপনাকে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু হাতে আর সময় ছিল না।"

আমি তো থ!

মিটি মিটি হাসছিলেন প্রফেসর। ফস করে বললেন–"আপনার পেসেন্টের খবর কী? বাঁচানো গেল?"

চোখের পাতা ফেলতে বোধহয় ভুলে গেলেন ক্যাপ্টেন কাকা। সেকেন্ড কয়েক ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসরের দিকে। চেয়ে আছেন প্রফেসরও। মুখে সেই হাসি। যা মোনালিসার হাসির মতোই রহস্যময়।

থেমে থেমে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা–"প্রফেসর, তার কথাই বলতে এসেছি। লেটেস্ট কেস। অ্যানাদার এক্সপ্লোশন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মেয়েটা!"

তারপর যা বললেন, তা নড়িয়ে দিল আমার মগজের ঘিলু।

অন্য গ্রহ থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীরা যে পৃথিবী গ্রহে যাতায়াত করছে, স্পেসশিপ পাঠাচ্ছে, খবরাখবর নিচ্ছে–এ সন্দেহ ক্যাপ্টেন কাকার অনেক দিনের। বলিভিয়ার সেই বিস্ফোরণের পর থেকেই।

তাই যখন দার্জিলিংয়ের ওপর দিয়ে রুপোলি চোঙা উড়ে গিয়ে ফেটে গেল চায়ের বাগানে–উনি সেখানে ছুটে গেছিলেন সবার আগে।

"গেলাম বটে। কিন্তু বিশাল একটা গহ্বর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। বলিভিয়ার সেই বিরাট গর্তের মতো নয় মোটেই। লোকজনের হৈ চৈ শুনলাম। উল্কাপাত বলেই মনে করেছে সবাই। কিন্তু উল্কার চিহ্ন যে নেই কোথাও–সেটা মাথায় ঢুকছে না। যা ছিল চোঙার মধ্যে, তা ততক্ষণে ছড়াতে আরম্ভ করেছে দার্জিলিংয়ে।"

"কি ছিল চোঙার মধ্যে?" প্রফেসরের প্রশ্ন।

"ইলেকট্রিক জার্ম।"

"সেটা আবার কী?"

"প্রফেসর, প্রথম কেসটা এল চা বাগান থেকেই। একটি মেয়ের জ্বর হয়েছে শুনে দেখতে গেছিলাম। স্বাভাবিক জ্বর নয় বলেই গেছিলাম। তাকে ছুঁলেই নাকি লোকে ইলেকট্রিক শক খেয়ে ছিটকে পড়ছে।"

"ইলেকট্রিক শক! বলেন কী মশায়!"

"আমি গিয়ে দেখলাম মেয়েটার বয়স পনেরর মধ্যে। ভুটিয়া মেয়ে। এমনিতে চোখ ছোট হয়। কিন্তু এর চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চোখের মেনিনজেস-এর ওপর যেন খুব চাপ পড়ছে। ব্রেনের মেনিনজেস-এর ওপরেও চাপ পড়েছিল বোধহয়। তাই প্রলাপ বকছিল। সেই সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছিল।"

"যেমন?"

"আমি মনে মনে ভাবলাম, টেমপারেচার দেখা দরকার। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বললে–দরকার নেই। এ জ্বর থার্মোমিটারে ধরা পড়বে না। ইলেকট্রোমিটার আছে? ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা ধরা দরকার।"

"অ্যাঁ!" প্রফেসর বিমূঢ় হয়েছেন বলেই মনে হল। অভিনয়ও হতে পারে। বুড়ো কম ধড়িবাজ নন।

"আমি মনে মনে ভাবলাম, তাহলে তো তোমাকে ছোঁয়া যাবে না–শক খেয়ে মরব নাকি? মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বললে–সরে পড়ুন। ডেঞ্জারাস লিমিট এসে গেছে। এক্সপেরিমেন্ট ফেলিওর!"

"কি করলেন আপনি?"

"তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটাও সটান খাটের ওপর উঠে দাঁড়াল। সারা দেহ কাঁপছে থরথর করে। অচমকা স্পার্ক ছিটকে গেল সারা গা থেকে।"

"স্পার্ক?"

"ইলেকট্রিক স্পার্ক। তারপরেই আগুন ধরে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। লাফিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে। বিস্ফোরণটা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের চাল পর্যন্ত উড়ে গেল এক্সপ্লোশনে।"

"মেয়েটা?"

"ফাটল তো মেয়েটাই। একেবারে নিশ্চিহ্ন।"

প্রথম কেসটা এল চা-বাগান থেকেই

"ফাইন!" তৃপ্ত স্বর প্রফেসরের–"তারপর?"

কটমট করে তাকালেন ক্যাপ্টেন কাকা–"একই ব্যাপার ঘটে চলেছে পর-পর। সব পেশেন্টরই বয়স তের থেকে ষোলর মধ্যে। কিশোর কিশোরী প্রত্যেকেই। কিন্তু মজাটা কি জানেন, বোধহয় গ্ল্যান্ডের ক্ষরণে তফাৎ থাকার ফলেই মেয়েরাই শুধু ইলেকট্রিক টেম্পারেচারে ভোগে, আগুন লেগে যায়, ফেটে উড়ে যায়–ছেলেরা দুদিন ভুগে সেরে ওঠে।"

"চোখ দুটো শুধু ড্যাবডেবে হয়ে থাকে, তাই না?" অমায়িক কণ্ঠে বললেন প্রফেসর।

জ্বলন্ত চোখে তাকালেন ক্যাপ্টেন কাকা–"আজ্ঞে হ্যাঁ। ধরেছেন ঠিক। ধরতে পারবেন জেনেই আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে।"

মিষ্টি মিষ্টি হাসলেন প্রফেসর–"তাই নাকি? তাই নাকি? অধমের ভূমিকাটা এখানে কি হতে পারে শুনতে পারি?"

"এতই যখন ধরতে পেরেছেন, এটাও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, অন্য গ্রহের এই ইলেকট্রিক জার্ম যার শরীরে ঢোকে, তাকে পুরোপুরি কব্জায় আনতে গিয়ে প্রথমেই তার ব্রেনের মধ্যে যে ক্ষমতটা জাগিয়ে দেয় তার নাম–"

"টেলিপ্যাথি," বিনয় ঝরে পড়ে প্রফেসরের গলায়–"যেমন আছে আপনার। দূর থেকেই বুঝতে পারেন কে কি ভাবছে। নিচের গাঁয়ে পেশেন্টের ডাক শুনতে পান এই হোটেলে বসে। দীননাথ পেছন নিলে পেছনে না তাকিয়েই জানতে পারেন। ঠিক যেমন আপনার পেশেন্টরা ধরতে পারে আপনার মনের কথা। ঠিক কি না?"

ক্যাপ্টেন কাকার সাদা আঁচিলে ভরা মুখটা অদ্ভুত সবুজ হয়ে আসে এবার। রাগে লাল হতে দেখেছি। সবুজ হতে দেখি নি কখনো। বীভৎস! গা শিরশির করে ওঠে আমার।

ভাঙা গলায় বলেন ক্যাপ্টেন কাকা–"প্রফেসর, আপনাকে ডেকে আনার উদ্দেশ্যটা শুনুন। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আপনার কথা শুনবে–আমি বলতে গেলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।"

"তা তো দেবেই।"

দপ করে জ্বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন কাকা–"আমারও সময় ফুরিয়ে আসছে প্রফেসর, শেষ করতে দিন আমাকে।"

"সেটাও টের পেয়েছি।"

"টের পেয়েছেন কিভাবে?"

"আপনার ড্যাবডেবে চোখ দেখে। বলিভিয়াতেও ইলেকট্রিক জার্ম আপনার ভেতরে ঢুকেছিল–তাই না? ছেলে বলে জ্বলে মরেন নি, ফেটে পড়েন নি–শুধু টেলিপ্যাথি ক্ষমতাটা পেয়েছেন। আর পেয়েছেন–"

"বলুন আর কী ?"

"আপনার প্রভুদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা। বলুন ক্যাপ্টেন, বলে ফেলুন চটপট, কি বলতে চায় তারা।"

জানলা দিয়ে ক্যাপ্টেন কাকা তাকালেন আকাশের দিকে। চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। একেবারে তন্ময়। যেন ইহজগতে নেই। দেহ অনড়।

মিনিটখানেক পর ঝাঁকুনি খেল সারা দেহ।

বললেন প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে–"এক্সপেরিমেন্ট। ইলেকট্রিক জার্ম মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। জীবাণুর ক্ষমতা তো জানেন। মানুষ মাইক্রোসকোপে যা দেখতে পায় না, জীবাণু তা দেখতে পায়। মানুষ তত্ত্ব দিয়ে অ্যাটমের মধ্যে কটা ইলেকট্রন আছে হিসেব করে বার করে–জীবাণু তা চোখে দেখে বলে দিতে পারে। জীবাণুও একটা এনিম্যাল–প্রাণী–অনেক উন্নত স্তরের–কিন্তু মানুষ তাকে হেয়জ্ঞান করে এসেছে এতদিন। যদিও সব জীবাণুর স্বরূপ এখনও জানেনি মানুষ। জানাতে পারে কেবল জীবাণুরাই–জাতিভাইদের সব খবর রাখে কেবল এরাই। প্রফেসর, অসংখ্য ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে, এক একটা ছায়াপথে অসংখ্য সৌরজগৎ, এক-একটা পরমাণুর মধ্যে কি সেই প্যাটার্ন নেই ? একই প্যাটার্ন, একই ছক, একই নিয়ম। জীবাণু, শুধু জীবাণুরাই জানে সেই খবর–মানুষকে তারা সেই জ্ঞান দিতে চায়–কিন্তু মানুষ কি করছে? নিরীহ কিছু জাতের জীবাণু বাদে সমস্ত জীবাণুকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। শত্রু, জীবাণু মানেই যেন শত্রু! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ!" প্রতিধ্বনি করলেন প্রফেসর নাট বল্টু চক্র। "আপনি নিজেই তাহলে একটা জীবাণু হয়ে গেছেন এখন, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন কাকা–"এতদিন ইলেকট্রিক জার্মের ইলেকট্রিসিটিকে মাথা চাড়া দিতে দিই নি–কিন্তু প্রভুদের বিফল এক্সপেরিমেন্টের ফল ফলতে চলেছে আমার ওপরেও। বেশি বকাবেন না। গা ছুঁয়ে এমন শক দেব–"

সরে বসলাম আমি সভয়ে। প্রফেসর নির্বিকার।

বললেন–"এক্সপেরিমেন্ট আনসাকসেসফুল কেন ক্যাপ্টেন সাহেব?"...

"মানুষের মস্তিষ্কই তার জন্যে দায়ী। আমার প্রভুরা বুঝতে পারেন নি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বড় বিস্ময় মানুষের মস্তিষ্ক। ওজন তো মোটে ১.৪৬ কিলোগ্রাম। জিলোটিনের মতো দেখতে ধূসর আর সাদা টিসুর একটা ব্যাঙের ছাতা যেন। জঘন্য! কিন্তু তিন হাজার কোটি স্নায়ুকোষ আর তার পাঁচ থেকে দশ গুণ গ্লাইয়ার কোষ রয়েছে ঐটুকুর মধ্যে। দেড় কিলো ব্রেনের সামান্য অংশ কাজে লাগিয়েই মানুষ আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে গেছে। সবটুকু লাগাতে গেলে সময় লাগবে আরও কয়েক লক্ষ বছর। তাই আমার প্রভুরা শক্তিমান ইলেকট্রিক জীবাণুদের পাঠিয়েছিল ব্রেনে ঢুকে ব্রেনটার ক্ষমতা বাড়িয়ে মানুষকে অতিমানুষ করে তোলার জন্যে। মহৎ উদ্দেশ্য নয় কী?"

"বিলক্ষণ!" প্রফেসর বিপুল হর্ষে যেন ফেটে পড়েন।

"কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া অজ্ঞাত ব্রেন কোষগুলো কি যে কাণ্ড করে বসল, মানুষের বায়ো-ইলেকট্রিসিটি ধাঁ করে বেড়ে গেল পরদেশী ইলেকট্রিক জার্ম ব্রেনে ঢুকে পড়তেই। ব্যস, আর যায় কোথা। আগুন লাগছে শরীরে, ফাটছে বোমার মতো। শুনেছেন তো পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে অনেকে? এই তো সেদিন ফ্রান্সের একটা মেয়ে–"

"জানি, জানি। আপনি বলে যান।"

"আর বলে যান! সময় আমার শেষ, এতদিন প্রভুদের হুকুম শুনে দৌড়েছি ইলেকট্রিক জার্মদের কি হাল হল জানবার জন্যে–কিন্তু এই নচ্ছার মানুষের মগজ নাকানি চোবানি খাইয়েছে প্রতিবার–এমন প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে গোটা বডির মধ্যে–উঃ উঃ উঃ!"

ক্যাপ্টেন কাকা মুখ বিকৃত করে আর্তনাদ করে উঠতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রফেসর আমার নড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড়লেন দরজার দিকে। চৌকাঠ পেরিয়েই করিডরে পড়ে পাশ ফিরে ছুটতে গিয়ে দেখলাম লকলকে আগুনের শিখা ঘিরে ধরেছে ক্যাপ্টেন কাকাকে। ছিটকে যাচ্ছে অজস্র ইলেকট্রিক স্পার্ক।

রাস্তায় নেমে এসেছিলাম হুড়মুড় করে।

বিস্ফোরণটা ঘটল ঠিক সেই সময়ে। সানগোল্ড হোটেলের একটা অংশ ভেঙে গড়িয়ে গেল পাহাড় বেয়ে চোখের সামনে!

টোকোনের বন্ধু

শিশিরকুমার মজুমদার

সব হিসেব গোলমাল হয়ে গেল চাঁদরার ঘোষবাবুর জন্য, কাজ মেটাতে তিনি রাত করে ফেললেন। শীতের রাত, তার উপরে চারদিকে ঘন কুয়াশায় ছাওয়া, কাঁপতে কাঁপতে স্টেশনে এসেই ট্রেন পেয়ে গেলেন ব্রজবাবু। একখানা কুলতলির টিকিট কেটে আরাম করে চাদর মুড়ি দিয়ে ট্রেনের কামরার এক কোণে বসে পড়লেন।

চাঁদরা থেকে কুলতলি বেশ কিছুক্ষণের পথ। মনে মনে হিসাব কষে একটু অস্বস্তিতেই পড়লেন ব্রজবাবু। কুলতলিতে নতুন বাড়ি করে এসেছে ওঁর মেয়ে জামাই। চিঠি লিখে এদিনের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন ব্রজবাবু। বিকাল নাগাদ ওখানে পৌঁছে, রাতটা আজ ওখানেই থাকবেন। ঝুলিতে এই নাতির জন্য কেনা কখানা নতুন এ্যাডভেঞ্চারের বই। কিন্তু চাঁদরার ঘোষবাবুই সব গোলমাল করে দিলেন। এখন জামাই মেয়ে নিশ্চয়ই দেরি দেখে চিন্তায় পড়বে। কি আর করা, গাড়ি ছাড়তেই চোখ বুজলেন ব্রজবাবু। ঠিক ইচ্ছায় নয়, শীতের রাতের আমেজও ছিল কিছুটা। এক চটকায় ঘুম ভাঙতে দেখলেন গোটা কামরা খালি, একা উনিই যাত্রী! কতক্ষণ যে কেটে গেছে, ট্রেন, কোথায় যে এসেছেন, সব হিসাব ওঁর গোলমাল হয়ে গেল। ঘড়িতে দেখলেন, ঘন্টা দুই এর মধ্যে কেটে গিয়েছে। সর্বনাশ, তারমানে তো কুলতলি পিছনে ফেলে এসেছেন তিনি!

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন তিনি। কোথাও কেউ নেই। অত রাতে অজ পাড়াগাঁয়ে এই ঠান্ডায় যাত্রী আসবে কোথা থেকে। কিন্তু কোথায় নামলেন তিনি? ভাল করে এদিক ওদিক দেখে খুশিই হলেন, না, যেখানে নেমেছেন, সেটাই কুলতলি, ওই তো স্টেশনের শেষে বিশাল বটগাছটা, তার নিচে বেঞ্চ পাতা। কতবার ট্রেন ধরতে এসে ওটাতে বসেছেন উনি। নিশ্চিন্ত মনেই স্টেশনের বাইরে এলেন তিনি। কোনো সন্দেহ নেই, ঠিক জায়গাতেই নেমেছেন তিনি। তবে হ্যাঁ, আ রাস্তার বাঁ দিকে কটা কাঁচা দোকান ছিল চায়ের। তার পাশে রিক্সাগুলো দাঁড়াত। এখন সেখানে

পাকা দোকান। এত রাতে তালা বন্ধ। আর রিক্সাগুলোও ওখানে নেই। বছর কতক আগে শেষবার কুলতলি এসেছিলেন উনি। বছরখানেকে এই সামান্য পরিবর্তনটা কি আর হবে না।

নিশ্চিন্ত মনেই এগোলেন উনি। বেশ কিছুটা এগিয়েই সামনে রেল-পোল। লুপ লাইনটা এখান দিয়েই গেছে। মেল ট্রেনগুলো সোজা এরই উপর দিয়ে যায়। এরপর কখানা পাকা দালান, তারপর ক্ষেত জমি। তারপর দুটো মান্ধাতার আমলের বিশাল দীঘি। তা ছাড়ালেই ভাঙা শিবমন্দির। তারপরেই সরকারি কলোনি। তার দুনম্বর গলিতেই ওঁর মেয়ের বাড়ি।

স্টেশনে রিক্সা না পেয়ে জোর কদমে হাঁটতে থাকলেন ব্রজবাবু।

রাত অনেক হয়েছে। মেয়ে জামাইয়ের যথেষ্ট চিন্তার কারণ এরই মধ্যে হয়েছেন উনি। তবে থাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। নানান কথা ভাবতে ভাবতে ঘোর কুয়াশা ভেদ করে সামনে এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন ব্রজবাবু। একি!' সামনে আবার রেল-পোল কেন? এই তো কিছুক্ষণ আগেই ওটা উনি পেছনে ফেলে এসেছেন! তাহলে এ কোথায় এলেন উনি? রাস্তা জনশূন্য। আশেপাশে বাড়ি নেই। কাউকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবেন, সে উপায়ও নেই। একটা ব্যাপার পরিষ্কার ওঁর কাছে। ট্রেনে ঝিমুনি আসাতে কোথায় নামতে কোথায় এসে পড়েছেন উনি। বোকার মতো বটগাছ চিহ্ন দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফের বেকায়দায় পড়েছেন উনি। এখন আবার ফিরে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। কপালে অশেষ দুর্ভোগ না থাকলে এমন হয়। ফিরতেই যাচ্ছিলেন উনি ...., ঠিক তখনি সামনের ঘন কুয়াশার মাঝ থেকে একটা অবাক করা গলার স্বর ভেসে এল, এ কি দাদু, আপনি এখানে এত রাতে! কোথায় গেছিলেন, যাবেন কোথায়?

গলাটা বড় চেনা চেনা মনে হলো ব্রজবাবুর। কিন্তু বুঝতেই পারলেন না এখানে এভাবে এত রাতে চেনাজানা কে ওঁর আসতে পারে। তাও ছেলেমানুষ!

কুয়াশা ভেদ করে ছেলেটা ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল। নেহাতই বাচ্চা ছেলে, পরনে হাফ প্যান্ট, হাফ হাতা সার্ট। একটা গরম জামাও গায়ে নেই। তবে দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রঘরের ছেলে। অন্ধকারে মুখটা ওর যতটা দেখতে পেলেন ব্রজবাবু, বড়ই চেনা চেনা বলে মনে হলো। কিন্তু....!

ছেলেটা মুচকি হেসে বলল, দাদু আমাকে চিনতে পারেননি তো?

ব্রজবাবু হ্যাঁ, না, কিছু বলার আগেই ও বলল, আমিতো টোকোনের বন্ধু, বাপ্পন আমার নাম, এক ক্লাশে পড়তাম, পাশের বাড়িতে থাকতাম।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব্রজবাবু বললেন, ও হো হো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তোমার বাবা না ব্যাংকে কাজ করেন?

–হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। বলল ছেলেটা।

–তা তুমি এখানে এত রাতে কি করছ? অবাক ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আজ ঠান্ডাও পড়েছে বেশ, গায়ে তো কিছুই দাওনি দেখছি!

বাপ্পন অন্ধকারে হাসল, বলল, আমার কথা থাক দাদু, আপনি তো রাস্তা হারিয়েছেন। টোকোনরা তো থাকে কুলতলি। এ তো তার আগের স্টেশন মান্দারহাট। কোথায় নামতে আপনি কোথায় নেমে পড়েছেন।

ব্যস্ত হয়ে ব্রজবাবু বললেন, তাই তো, তাহলে ফিরে গিয়ে স্টেশনে ট্রেন ধরি। আজ আমাকে কুলতলি যেতেই হবে।

বাপ্পন বলল, এখন যে ট্রেন পাবেন দাদু তা মান্দারহাট থামলেও কুলতলিতে থামবে না। সে ট্রেন আবার সেই সকালে।

পথের মাঝে থমকে ব্রজবাবু বললেন, তাহলে উপায়?

–এগারোটা বাহান্নয় শেষ ট্রেন মান্দারহাটে, ওটা সোজা কলকাতায় যায়। ওটাতেই কি ফিরে যাবেন?

–না বাবা, না, চিঠি লিখে ওদের জানিয়েছি আজ আসব। এখন না গেলে সারা রাত চিন্তায় ছটফট করবে। তার চেয়ে তুমি আমাকে একটা রিক্সা ডেকে দাও, চলে যাই। বরাতে খরচা ছিল, হবে।

–এত রাতে কোনো রিক্সা ওদিকে যেতে চাইবে না।

ভীষণ হতাশ হয়ে ব্রজবাবু ফের বললেন, তা হলে উপায়?

ছেলেটা আবার কুয়াশায় হারিয়ে গেল। কুয়াশার ভিতর থেকেই বলল, হাঁটতে হবে দাদু, দেড় মাইল পথ। মাঠের মাঝ দিয়ে আল ধরে। না, না, চিন্তা করবেন না, শীতকালে ওপথেই বেশি লোক চলে দিনে। তবে আমি যদি সঙ্গে থাকি তো রাতেই বা কি ভয়। চলুন আমার সঙ্গে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মনে নানান প্রশ্ন জাগল ব্রজবাবুর। থাকতে না পেরে বললেন, সে কি, এত রাতে তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তোমার বাবা, মা ...

বাপ্পন বাধা দিয়ে বলল, ও নিয়ে ভাববেন না। ওঁরা

আজকাল এখানেই থাকেন না। বদলি নিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছেন। আমি এখন একা থাকি এখানে। একদম একা। শেষ কথাগুলো ওর কেমন যেন দুঃখে ভরা!

–না, মানে তোমরা থাকতে কোথায়? অবাক ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা না টোকোনদের বাড়ির পাশে থাকতে কুলতলিতে?

–হ্যাঁ, থাকতাম তো। ঠিক পাশের বাড়িতে। সে বাড়ি তো ভাড়া বাড়ি ছিল। দুবছর আগে বাবা এখানে এই মান্দারহাটে বাড়ি করেছিলেন। সেই থেকেই আমি এখানে।

–ও, তাই বল, বললেন ব্রজবাবু, তা বাবা, মা না থাক, গার্জেন তো কেউ আছেন? চল আমি নয় তাঁর কাছ থেকে তোমাকে সঙ্গে নেবার পারমিশনটা নিয়ে নিই। আজ রাতে না হয় কুলতলিতেই থেকে যাবে।

বাপ্পন বলল, খুব মজা হতো তাহলে, কিন্তু দাদু ওসব আর হবার নয়। তার চে আপনি ওই ডান দিকের পায়ে *চলা পথটা ধরুন তো, রোজ আমি স্কুলে যেতাম* ওই পথটা দিয়ে। এমনিতে যেতে বেশ। কিন্তু বর্ষাকালে কাদায় কাদায় চারদিক পিছল, আর প্যাচপ্যাচে হয়ে পড়ে, তাছাড়া তখন এদিকের ধান জমি সব জলের তলায় চলে যায়। সাপের ভয় থাকে খুব। এখন শীতকালে কোনোও ভয় নেই। চলুন আপনি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মনটা বেশ খুঁতখুঁত করতে থাকল ব্রজবাবুর। ছেলেটার কথাবার্তা যেন কেমন! এত রাতে অতটুকু ছেলে একা যাবে...কিন্তু কি আর করবেন উনি? নিরুপায় হয়ে ওর কথামতই হাঁটতে আরম্ভ করলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, এত রাতে আর ওকে একা ফেরত পাঠাবেন না। ধরে রাখবেন কুলতলিতে। এসব ভেবে মনে যেন উনি একটু স্বস্তি পেলেন। ভাগ্যিস ছেলেটা এসেছে এই শীতে সাহায্য করতে, তা না হলে তো..., আর ভাবতেই পারলেন না ব্রজবাবু।

হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করলেন, তুমি তো টোকোনের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়। না?

–হ্যাঁ, পড়তাম।

–পড়তাম কেন? অবাক ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তরে বাপ্পন বলল, দাদু, দাদু, আপনি অত বাঁ দিকে যাবেন না। ওদিকে একটা চোরা গর্ত আ ছে, খুব গভীর। আমিও আগে জানতাম না, বিপদ তো সেজন্যই ঘটেছিল।

এসব কথা ব্রজবাবুর কানে ঠিক গেল না। ডান দিকে সরে এসে উনি আবার ওর প্রশ্নের জের টানলেন, পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছ নাকি? হাতের কাজটাজ শেখ! কি কর আজকাল?

ছেলেটা কোনোও উত্তর দিল না। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হলো ব্রজবাবুর, তবে কি এ ছেলে বয়ে গেছে। না, না, তা-ই বা হয় কি করে, ও তো টোকোনের বন্ধু, বয়স বড়জোর দশ কি বার। ও বয়স তো বয়ে যাওয়ার নয়। তবে? ব্রজবাবু থাকতে না পেরে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি হে? কি হলো তোমার, কথা বলছ না যে!

থেকে থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছিল চারদিক। কখনও ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছিল, কখনও ও হারিয়ে যাচ্ছিল। তেমনি কুয়াশায় ও তখন হারিয়ে গেছে। উত্তর না পেয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়লেন ব্রজবাবু। চাপা গলায় ডাক দিলেন, *বাপ্পন, কোথায় গেলে তুমি?*

ঠিক চলেছেন দাদু, চিন্তা করবেন না।

পথের মাঝে সেই গর্তটাতে সেদিন পড়ে গিয়েছিলাম।

কুয়াশার মাঝ থেকে বাপ্পন উত্তর দিল, ঠিক চলেছেন দাদু। চিন্তা করবেন না। আর কিছুটা এগোলেই পাকা পথ, ওখানে পৌঁছালে সোজা কুলতলি। আর আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।

খুশি হয়ে ব্রজবাবু বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন, ওঃ তোমার পড়াশুনার কথা। ব্রজবাবু কথা শেষ করতে পারলেন না।

কুয়াশার মাঝ থেকেই বাপ্পন বলল, জানেন দাদু, আমি না পড়াশুনায় খুব ভাল ছিলাম। টোকোনের সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। বাবা ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে এই মান্দারহাটে বাড়ি করলেন। এখানেও ভাল স্কুল আছে। আমি বললাম, নতুন স্কুলে আমি কিছুতেই পড়ব না। বাবা বললেন, দেড় মাইল পথ রোজ যাবি কি করে? আমি বললাম, হেঁটে যাব আসব। আমার কষ্ট হবে না। আমি আমার পুরনো বন্ধুদের ছাড়তে পারব না। বাবা ভীষণ রাগ করলেন, বললেন, যা ইচ্ছা তাই কর। ব্যস, আর আমাকে বদলি নিতে হলো না। আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম। তখনও বৃষ্টি নামে নি। শুকনো মাঠঘাট। হেঁটে স্কুলে যেতে আসতে আমার মন্দ লাগত না। তারপর যখন এই সিধে রাস্তাটার খোঁজ পেলাম তখন আর আমাকে দেখে কে! তারপর নামল বৃষ্টি! ভীষণ বৃষ্টি! দেখতে দেখতে চারদিকে জল জমে গেল। মাঠে যে সব লোক কাজ করত, তারা আমাকে বলল, খোকা, আর এ পথে আসা যাওয়া কর না। ঘুর পথেই যেও। আমি সে কথা শুনব কেন, এ পথে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লাগে, আর ও পথে...

ব্রজবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আমরাও তো সে পথেই যাচ্ছি, তাহলে তো কিছুক্ষণেই কুলতলি পৌঁছে যাব?

কুয়াশা কেটে গেল। বাপ্পন বার হয়ে এসে বলল, হ্যাঁ, আর বড়জোর পাঁচ সাত মিনিট লাগবে, ঐ তো সামনে পাকা পথ।

অন্ধকারের মাঝে কালো চওড়া পাকা পথটা সত্যিই দেখতে পেলেন ব্রজবাবু। খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে?

–গত বছর ভীষণ বর্ষা হয়েছিল এদিকে। একদিন স্কুলে পৌঁছেচি, নামল ভীষণ বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! সাড়ে চারটেয় যখন ছুটি হলো তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। দিনটা ছিল সাতই আষাঢ়, আমার সঙ্গে ক্লাসে টোকোনের একটু ঝগড়া হয়েছিল। একটা ডট পেন, ওর মামা ওকে দিয়েছিল, চার রকম কালি ছিল তাতে। আমি বললাম, আমাকে দু দিন দে না ভাই। বাড়ি নিয়ে যাব। ও কিছুতেই দিল না। ভীষণ দুঃখ হলো আমার। ছুটির পর আবদুল বলল, চল আমরা বার হয়ে পড়ি, বৃষ্টি বাড়তে পারে। পাকা রাস্তায় ও প্রায় মান্দারহাটের কাছাকাছি থাকে। আমি রাগ করে বললাম, না, আমি একা যাব। রাগ হলো এই জন্য, কারণ আবদুলও টোকোনের হয়ে কথা বলেছিল, বলেছিল, মামা ওকে জিনিসটা দিয়েছেন, ও কেন তোকে দেবে। আবদুল ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই কোন দিকে যাবি? আমিও রাগ করেই বলেছিলাম, আজ আমি মাঠপথে ফিরব। আবদুল বলেছিল, না ভাই, যাস না। টোকোন বলেছিল, আবদুল ওকে বল, ওর একটা মাসীর বাড়ি এখানে আছে, আমার ওপরে রাগ করেছে করুক, সেখানে তো ও গিয়ে থাকতে পারে। আগে কি থাকেনি নাকি ও। আবদুল বলেছিল, আমার সঙ্গেই ফিরে চল না। আজ তোর কি হলো বল তো? আমার রাগ তখন যেন কেমন দুঃখ হয়ে গিয়েছিল। এত কথা বলছে ওরা অথচ একবারও তো বলছে না, এই নে ডট পেনটা, আমি কি আর ওটা নিতাম? ফেরতই তো তাহলে দিয়ে দিতাম। তা নয়, ওরা আমাকে থাকতে বলছে, সঙ্গে যেতে বলছে। আমি বলেছিলাম, আমি থাকব না, আমি যাবই, আর যাব ওই মাঠপথে একা একা। বলে আর আমি দাঁড়াইনি। রাগ করে তো কিছুদূর চলে এলাম, পায়ের পাতা ডোবা জল ক্রমে হাঁটু ছাড়িয়ে যখন

প্রায় কোমর পর্যন্ত উঠল, আমি ভয়ে থেমে ছিলাম। কোন দিকে পথ, কোন দিকে যে যাব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভীষণ ভয়ে ঠিক করলাম, ফিরেই যাব। আজ নয় টোকোনদের বাড়িতেই থাকব রাতে। ফিরতে গেলাম যেই...থামল বাপ্পন।

ব্রজবাবু প্রায় আতঙ্কে বললেন, কি সাহস তোমার, এমন রাগও করে কেউ? ভাগ্যিস ফেরার বুদ্ধি করেছিলে।

কুয়াশায় আবার প্রায় হারিয়ে যাওয়া বাপ্পন বলল, দাদু, ওই দেখুন গলির মুখে টোকোনের বাবা দাঁড়িয়ে আছেন আলো হাতে। আমি যাই দাদু।

ব্রজবাবু হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে মানে? পাগল হলে নাকি তুমি? বাবা মা নেই, তা বলে কি আমরা নেই নাকি। চল বাড়ি চল। আজ রাতে–

কুয়াশায় একদম হারিয়ে গিয়ে বাপ্পন বলল, পথের মাঝে সেই গর্তটাতে পড়ে গেছিলাম সেদিন দাদু। আর উঠতে পারিনি। পাঁচ দিন পরে জল নেমে গেলে আমাকে সবাই খুঁজে বার করে।

–মানে! চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রজবাবু।

জমাট বাঁধা কুয়াশার মাঝ থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া গলায় স্বর ভেসে এল, দুঃখে বাবা মা বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছেন। টোকোন আর আবদুল খুব কেঁদেছিল। দাদু, সবাইকে বলবেন, আমি ওদের খুউব ভালবাসি। নতুন জায়গায় বাবা মা বাড়ি করেছিলেন বলে এ হয়নি। আর ডট পেন...দূর, ওসব কিছুই না। ও আমার ভাগ্য। কাউকে পাচ্ছিলাম না, এসব কথা বলতে। আপনি এলেন, বললাম। এবারে আমার ছুটি। যাই দাদু। গলার স্বর মিলিয়ে গেল।

ব্রজবাবু তাকিয়ে দেখলেন, ওদিক থেকে আলো হাতে ওঁর জামাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে অবাক হয়ে বলল, এ কি, এদিক থেকে কি করে আসছেন আপনি?

শান্ত ভাবে ব্রজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, টোকোনের বন্ধু বাপ্পনের বাবা মার নতুন ঠিকানাটা কি জান তুমি? দিয়ো তো, একটা জরুরী চিঠি লিখব।

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

নামেও মজা

ছদ্মনাম

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিএ্যানভ সবশুদ্ধ ১৫১টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত ছদ্মনাম লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)।

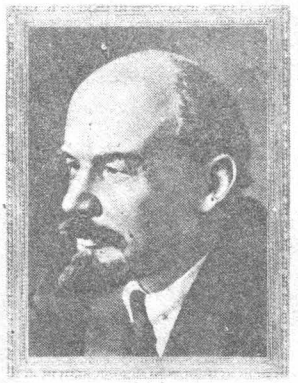

আসল নাম

ইউনাইটেড নেশনস বা জাতিপুঞ্জের প্রথম নাম ছিল এ্যাসোসিয়েটেড পাওয়ারস বা সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনসটন চার্চিল কবি বায়রনের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে নামটি বদলে দেন।

বদনাম!

এ্যাডলফ হিটলারের সময় পুলিশ ও কৃষকরা তাদের ঘোড়ার নাম এ্যাডলফ রাখতে পারত না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শাঙ্কো হ্যারির কাছে ফিরে ফিরে এল। আর একটা পলতে নিল। তীরে জড়াল। আবার মশালের আলো থেকে তীরটায় আগুন জ্বালল। ততক্ষণে খালাসিরা আবার পিপেগুলো পাটাতনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তুলতে শুরু করেছিল। লক্ষ্য স্থির করে শাঙ্কো জ্বলন্ত তীরটা ছুঁড়ল। কাঠের পিপেটায় জ্বলন্ত তীর ঢুকে গেল। পিপেটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। খালাসি দু'জন পিপে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। জ্বলন্ত পিপেটা ঢালু পাটাতন দিয়ে গড়াতে গড়াতে জাহাজের ডেক-এর দিকে চলল। ডেক-এ সাজিয়ে রাখা পিপেগুলোয় গিয়ে পড়ল জ্বলন্ত পিপেটা। মুহূর্তে আর একটা পিপেয় আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে আরো ক'টা পিপেয়। প্রচন্ড শব্দে প্রথম পিপেটা ফাটল এবার। চারিদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই ফাটল আর একটা পিপে। চোখের পলকে জাহাজটার ডেকে আগুন লেগে গেল। আগুনের ফুলকি ছিটকোতে লাগল অনেক দূর পর্যন্ত।

সৈন্যরা প্রথমে হকচকিয়ে গেল। ওরা বুঝতেই পারল না জাহাজে আগুন লাগল কী করে। তারপরেই ওরা সবাই জ্বলন্ত জাহাজটার সামনে এসে হৈচৈ শুরু করল। কিন্তু পিপেগুলো যে প্রচন্ড শব্দে ফাটছে, তাই ওরা কাছে যেতে সাহস পেল না। দূর থেকে বালতি করে জল ছুঁড়ে দিতে লাগল। কিন্তু আগুন তাতে নিভল না। আগুন আরো ছড়াল।

ওদিকে হ্যারি চাপাস্বরে বলে উঠল–'সব ছোটো–চার নম্বর জাহাজটায় গিয়ে উঠবে। কোনো শব্দ করবে না।' ততক্ষণে শাঙ্কোও এসেছে। সবাই দ্রুতপায়ে ছুটল চার নম্বর জাহাজটার দিকে। দ্রুতহাতে পাটাতন পেতে সব নিঃশব্দে জাহাজটায় উঠে পড়ল। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল সবাইকে–'নোঙর তোল–নিঃশব্দে। দাঁড়ঘরে চলে যাও কিছু। কোনো শব্দ না করে দাঁড় বাইতে থাকো।' ফ্রান্সিসের কথামতো সবাই কাজে লেগে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নোঙর তোলা হলো–দাঁড় বাওয়া শুরু হলো। জাহাজটা আস্তে আস্তে ভেসে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে।

ওদিকে সৈন্যরা জাহাজের আগুন নেভাতে ব্যস্ত। কিন্তু একটু পরেই বুঝল যে আগুন নেভানো অসম্ভব। আগুন তখন সমস্ত জাহাজটায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে প্রচন্ড শব্দে পিপেও ফাটছে। কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না কারো।

এই আগুন আর হৈচৈয়ের মধ্যে সৈন্যরা দেখল একটা জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। সৈন্যরা ভেবে উঠতে

পারল না কী করবে ওরা। জাহাজটা ততক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে। সৈন্যরা হাল ছেড়ে দিল। ঐ জাহাজ আর ফেরানো সম্ভব নয়। এদিকে অন্য জাহাজগুলোতেও যাতে আগুন না লেগে যায় তার জন্যে ওরা জ্বলন্ত জাহাজটার নোঙর তুলল। জ্বলন্ত জাহাজটা ঠেলে দিল গভীর সমুদ্রের দিকে। অন্য জাহাজগুলোতে আর আগুন লাগল না। জ্বলন্ত জাহাজটা ভেসে চলল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা বন্দর থেকে অনেকদূর এসে পড়েছে তখন। ভাইকিংরা খুশীতে চীৎকার করে উঠল–'ও-হো-হো–।' দাঁড়ীদের ঘর থেকে দাঁড়ীরাও চীৎকার করে উঠল–'ও-হো-হো–।' ঘড়্ঘড়্ শব্দে পালগুলো তোলা হলো। সব পাল হাওয়ার তোড়ে ফুলে উঠল। একটা পাক খেয়ে জাহাজটা যেন জল কেটে উড়ে চলল। জাহাজ চলল দক্ষিণমুখো।

জাহাজ চলেছে। ওপরে নির্মেঘ আকাশ। নীচে শান্ত সমুদ্র। বাতাসও বেগবান। পালগুলো ফুলে উঠেছে বাতাসে। বেশ জোরেই চলল জাহাজ। ভাইকিংদের আর দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। শুধু জাহাজের ডেক মোছা, পালের দড়িদড়া ঠিক রাখা আর রান্নাবান্না। এ ছাড়া কোনো কাজ নেই।

রাত হলে ওরা ডেক-এ জড় হয়। ছক্কাপাঞ্জা খেলে। নাচে গান গায়। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও নাচগানের আসরে বসে কখনো। নাচগানের আসর ভেঙে যায় একটু রাত হলেই। ফ্রান্সিস তখন ডেক-এ একা একা পায়চারি করে বেড়ায়। হ্যারিও কোনো কোনো দিন ওর সঙ্গে থাকে। দু'জনে কথাবার্তা হয়– রাত বাড়ে। দু'জনে কেবিন ঘরে ফিরে আসে। শুয়ে পড়ে।

এর মধ্যেই একদিন বিকেলে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ জমল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বিদ্যুতের জ্বলন্ত রেখা আঁকাবাঁকা জালের মতো কালো আকাশটায় ফুটে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে বজ্রপাতের প্রচন্ড গম্ভীর শব্দ।

দেখতে দেখতে প্রচন্ড গতি নিয়ে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজটার ওপর। ভাইকিংরা অভিজ্ঞ নাবিক। ওরা আগেই দড়িদড়া টেনে পাল নামিয়ে ফেলেছিল। এবার জাহাজের হুইলের সামনে দাঁড়াল কয়েকজন। বাকীরা দাঁড়ীঘর থেকে উঠে এল ডেক-এ। তৈরী হলো ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্যে।

শুরু হলো ঝড়ের তান্ডব। বিরাট বিরাট ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জাহাজের ডেক-এ। জাহাজ একবার ঢেউয়ের ধাক্কায় অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। আবার আছাড় খেয়ে নেমে আসছে ঢেউয়ের ফাটলের মধ্যে। আবার উঠছে। আবার পড়ছে। জাহাজের প্রচন্ড দুলুনিতে কেউ স্থির হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ডেক-এর ওপর এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে। ওরই মধ্যে ভাইকিংরা হুইল ঘুরিয়ে চলল। দড়িদড়া আঁকড়ে ধরে টাল সামলাতে লাগল। জলে ভিজে সবাই যেন স্নান করে উঠল।

প্রচন্ড ঝড় চলল প্রায় আধঘন্টা। হঠাৎ ঝড়ের দাপট কমে গেল। বাতাসের বেগ কমে এল। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেল। বাতাসের বেগ স্বাভাবিক হলো। মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। তারা ফুটল আকাশে। ঝড়ের প্রচন্ড দাপটের সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত ভাইকিংরা যে যেখানে পারল কেউ বসে পড়ল, কেউ শুয়ে পড়ল।

জাহাজ চলল। দিন রাত। কিন্তু ডাইনী দ্বীপের দেখা নেই। ফ্রান্সিস ঠিক করেছিল প্রথমে ডাইনীর দ্বীপে যাবে। দ্বীপে নামবে না। ঐ দ্বীপ থেকে দিক নির্ণয় করে পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে জাহাজ চালাবে। তবেই পৌঁছুতে পারবে কঙ্কাল দ্বীপে। পাঙ্কো সে রকমই বলেছিল।

জাহাজ চলেছে। এর মধ্যে আর ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয় নি। বেশ দ্রুতই চলেছে জাহাজ।

অনেকদিন হয়ে গেল। ভাইকিংদের মধ্যে একটু গুঞ্জন শুরু হলো। এখনও ডাইনীর দ্বীপে পৌঁছোতে পারলাম না। সেখান থেকে আবার কঙ্কাল দ্বীপ। তার দূরত্ব কত কে জানে? হ্যারি শুনল এসব কথা। কিন্তু ফ্রান্সিসকে কিছু বলল না।

একদিন ভোর ভোর সময়ে দূর থেকে দেখা গেল ডাইনীর দ্বীপ। স্পষ্ট দেখা গেল না। কারণ একটা কুয়াশার আস্তরণ দ্বীপটাকে ঘিরে ছিল। মাস্তুলের ওপরে যে নজরদারি করছিল সেই প্রথম দেখল ডাইনীর দ্বীপ। ও চীৎকার করে বলে উঠল–'ফ্রান্সিস–ডাইনীর দ্বীপ।' ওর চীৎকার চেঁচামেচিতে অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম খুব পাতলা। ও প্রথম ডাকেই উঠে পড়ল। ডেক-এর ওপর উঠে এল। ভোরের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ডাইনীর দ্বীপ দেখল।

একটু বেলা হতেই কুয়াশার আবরণ সরে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল ডাইনীর দ্বীপ। সবুজ পাহাড় সবুজ গাছগাছালি।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়ে দ্বীপটা দেখল। তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল–'জাহাজের মুখ পশ্চিমদিকে ঘোরাও। সোজা পশ্চিম দিকে যেতে হবে

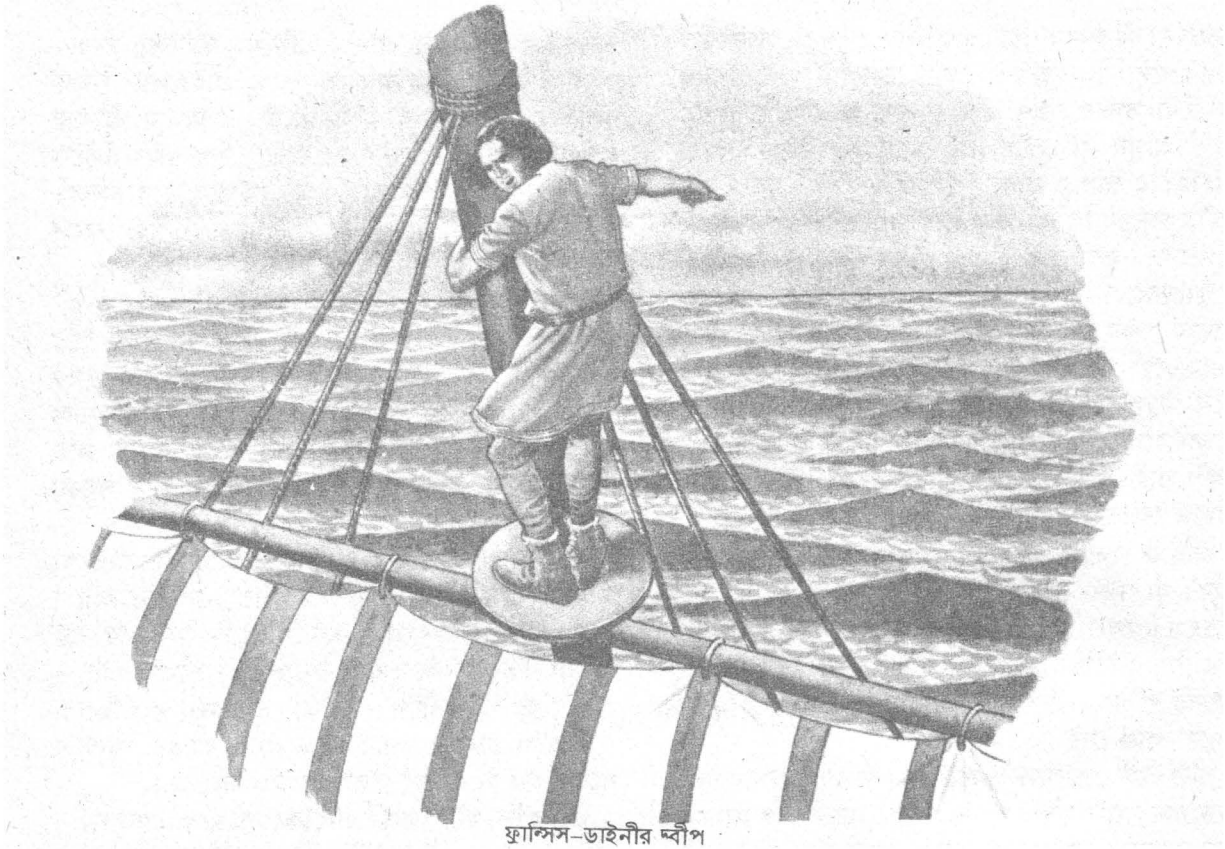

ফ্রান্সিস–ডাইনীর দ্বীপ

আমাদের। তাহলেই কঙ্কালদ্বীপে পোছবো আমরা।'

জাহাজের মুখ ঘোরান হলো পশ্চিমদিকে। জাহাজ চলল জল কেটে। লক্ষ্য–কঙ্কাল দ্বীপ।

জাহাজ চলল। কয়েকদিন পরে এক রাতে ফ্রান্সিস ডেক-এ পায়চারি করছে। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল–'হ্যারি–এই জাহাজে কাঠ কত আছে?'

'কাঠের তক্তাগুলো গুনে দেখি নি। তবে কাঠের স্তূপটা নেহাৎ ছোট নয়।'

'তুমি কালকেই ভালো করে দেখ–কেমন কাঠ আছে।'

'কী করবে কাঠ দিয়ে?'

'সেই কাঠ দিয়ে নৌকো তৈরী করতে হবে। যে ক'টা নৌকো হয় তৈরী করতে হবে। কঙ্কাল দ্বীপে যেতে লাগবে। জাহাজ থেকে সরাসরি দ্বীপে নামা যাবে না।'

'বেশ–ফার্নান্দো ওস্তাদ কাঠের মিস্ত্রী। ওকেই বলবো কয়েকজনকে নিয়ে কাজ শুরু করতে।'

ফার্নান্দোকে বলতে ও পরদিনই নৌকো তৈরীর কাজে হাত লাগাল।

জাহাজ চলেছে। এর মধ্যে দু'বার ঝড়ের মুখে পড়েছিল জাহাজটা। তবে ঝড় তেমন প্রচণ্ড ছিল না। দু'তিনটে পাল ফেঁসে গিয়েছিল শুধু। সেগুলো মেরামত করে জাহাজ পূর্ণ গতিতেই চলল।

মাঝখানে দিন চারেক হাওয়া পড়ে গিয়েছিল। পালে কাজ হয় নি। ক্রমাগত দাঁড় বাইতে হয়েছে ভাইকিংদের।

দিন কুড়ি কেটে গেল। কিন্তু কঙ্কাল দ্বীপের দেখা নেই। এবার বেশ জোর গুঞ্জন উঠল ভাইকিংদের মধ্যে। হ্যারির কানে গেল সে কথা। ও বুঝল এই অসন্তোষকে বাড়তে দিলে যে কোনো মুহূর্তে ভাইকিংরা ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। ও ফ্রান্সিসকে বলল সব কথা। ফ্রান্সিস সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই ডেক-এ সভা ডাকল।

সন্ধ্যে হতেই ভাইকিংরা ডেক-এ এসে জড়ো হলো। একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে কেবিন ঘর থেকে ডেক-এ উঠে এল। সব ভাইকিং বন্ধুদের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফ্রান্সিস বলতে লাগল–'ভাইসব–এই অভিযানে বেরোবার আগেই আমি বলেছিলাম–আমাদের পথ ভুল হতে পারে, খাদ্যজল ফুরিয়ে যেতে

পারে কিন্তু আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। সোনার ঘণ্টা আনতে গিয়েও এরকম সমস্যায় আমাদের পড়তে হয়েছিল। সেদিন বন্ধুরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলেই বলছি কেউ যদি হতাশ হয়ে পড়ো তাহলে বলো সামনে কোনো বন্দর পেলে তাকে নামিয়ে দেবো। সে অন্য জাহাজ ধরে দেশে ফিরে যাবে।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল–'বলো তোমরা কে কে ফিরে যেতে চাও।' ভাইকিংরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর বলল–'তাহ'লে সবাই হাত লাগাও। বাতাস পড়ে গেছে। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে যাও। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ চালাও। কঙ্কাল দ্বীপে আমাদের যেতেই হবে।'

ভাইকিংরা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল–'ও-হো-হো–।' তারপর যে যার কাজে লেগে পড়ল। জাহাজের গতি বাড়ল অল্পক্ষণের মধ্যেই।

আরো দু'দিন কাটল। বাতাসের বেগ বাড়ল। পাল ফুলে উঠল। দাঁড় বাওয়াও চলল। জাহাজ চলল দ্রুত-গতিতে। ভাইকিংরা আবার আগের মতোই প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা ফ্রান্সিসকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। ফ্রান্সিস বলেছে। ব্যস্। আর হতাশ হওয়া নয়। অধৈর্য হওয়াও চলবে না।

পরের দিন। সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়েছে। তখনও অস্ত যায় নি। মাস্তুলের মাথায় পালা করে ওরা থাকে। চারদিকে নজর রাখে। সেই বিকেলে মাস্তুলের নজরদার চীৎকার করে উঠল–'ডাঙা দেখা যাচ্ছে–ডাঙা।' ফ্রান্সিসকে খবর দেওয়া হলো। ও দ্রুতপায়ে ডেক-এ উঠে এল। হ্যারিও এল। ফ্রান্সিস নজরদারকে চীৎকার করে বলল–'কী দেখছো?'

'মনে হচ্ছে একটা দ্বীপ। একটা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে।' নজরদার বলল।

'জাহাজ ঠিক ঐ দ্বীপের দিকেই যাচ্ছে?' ফ্রান্সিস বলল।

'না। আমাদের একটু উত্তরের দিকে সরে যেতে হবে।'

ফ্রান্সিস জাহাজ চালকের কাছে এল। বলল–'একটু উত্তর দিক ঘেঁষে চালাও।' জাহাজ একটু উত্তরমুখো হলো।

একটু পরেই অস্তগামী সূর্যের আলোয় দ্বীপটা দেখা গেল। লাল আকাশের নিচে কালো পাহাড়ের মাথাটা দেখা গেল। মানুষের মাথার খুলির মতো। জাহাজ থেকে সবাই দেখছিল পাহাড়টা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল–'হ্যারি–এটাই কি কঙ্কাল দ্বীপ?'

'আমার বিশ্বাস এটাই কঙ্কাল দ্বীপ। দেখছো না পাহাড়টা দেখতে করোটির মতো।'

'হ্যাঁ–মানুষের মাথার খুলির মতো।' ফ্রান্সিস বলল। একটু পরেই পশ্চিমের লাল আলো আকাশ থেকে মুছে গেল। অন্ধকার নেমে এল।

ফ্রান্সিস জাহাজের চালককে বলল–'জাহাজ থামাও।' সবাইকে বলল–'পাল নামাও। দাঁড় বাওয়া বন্ধ কর। কাল দিনের বেলা দ্বীপের দিকে যাবো আমরা।'

একটু পরেই জাহাজ থেমে গেল।

পুব আকাশের আধভাঙা চাঁদটা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হলো। মেটে জ্যোৎস্না ছড়াল সমুদ্রের ওপর। আবছা দেখা গেল দূরের কঙ্কাল দ্বীপ।

পরদিন সকালে কারো কোনো কাজ নেই। সকালের খাবার খেয়ে সকলেই ডেক-এ এসে জড়ো হলো। দেখতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ। পাহাড়ের চূড়োটা ন্যাড়া। কিন্তু পাহাড়ের নিচ থেকে শুরু করে চারদিকে প্রচুর গাছপালা। তীরের কাছে জঙ্গল অত ঘন নয়। অতদূর থেকে মানুষ জন্তু বা পাখি দেখা গেল না।

হঠাৎ একজনের নজর পড়ল–গভীর সমুদ্রের দিকে দূরে একটা ভেলামত কী যেন ঢেউয়ের মাথায় উঠছে পড়ছে। সে সঙ্গীদের ডাকল–'দ্যাখ্ তো ওটা কী?' প্রায় সকলেরই দৃষ্টি পড়ল ওদিকে। কিন্তু অত দূর থেকে ওরা বুঝতে পারল না জিনিসটা কি?

দু'জন ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে খবর দিল। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে এল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ভেলাটার দিকে। তারপর ফিরে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল–'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ কর–জাহাজ চালু কর, ঐদিকে জাহাজ নিয়ে চল।'

কথামত সবাই কাজে লেগে পড়ল। জাহাজ একবার নড়ে উঠে গভীর সমুদ্রের দিকে চলতে লাগল। জাহাজটা যত কাছে যেত লাগল ভেলাটা ততই স্পষ্ট হতে লাগল।

[চলবে

ছবিঃ নারায়ণ দেব

হাঁদা-ভোঁদার

দন্ত চিকিৎসা

এই যে! আপনার গাছের সব আম লোপাট হয়ে গেলো!
বটে! দেখাচ্ছি মজা!
অ্যাইও! হতভাগারা!
মূর্তিমান ঝামেলা আসছে! শীগগির পালা!
ওহ্! দুঃখিত, হাঁদা!
গেছি রে!
দন্ত চিকিৎসক আসার পর
বাদ বাকি তোমরা সব চলে যেতে পারো। এই ছেলেটির দাঁত মেরামত করতে আমার সারা দুপুর লেগে যাবে!
ভালো দাঁতের জন্যে বিশেষ পুরস্কার এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম জিতে আমরাই কাম ফতে করেছি!
আমগুলো দারুণ ছিলো রে, হাঁদা! তোর জন্যে কয়েকটা রেখেছিলাম কিন্তু তোর হালত দেখে খুবই দুঃখের সঙ্গে আমিই এখন ওগুলি — হেঃ হেঃ!
রুফ্!

মেঘমুক্ত সূর্য

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেইমান ! বিশ্বাসঘাতক ! কাপুরুষ !

অস্থির পদক্ষেপে পায়চারি করতে করতে গর্জে উঠলেন মারাঠা বীর। ক্রোধে আরক্ত দুচোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরতে শুরু করেছে।

ক্রোধের কারণ অবশ্যই আছে। পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে এনে অতিথিকে যদি চরম অবমাননার মধ্যে বন্দী করা হয় তবে তার চেয়ে হীন বিশ্বাসঘাতকতা আর কি হতে পারে।

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই ঘৃণ্য চক্রান্তের জাল বিছিয়েই বন্দী করেছেন মারাঠা গৌরব শিবাজীকে দিল্লীর দুর্গপ্রাসাদের এক অংশে।

–এ শুধু সম্ভব হলো আপনার পিতা মুঘল সেনাপতি অম্বররাজ জয়সিংহের জন্যেই। তাঁর আশ্বাসবাক্যে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রাজপুত সেনাপতির শপথ মিথ্যে হবে না। মুঘল রাজধানীতে আমার অমর্যাদা করার সাহস পাবে না সম্রাট আলমগীর।

মারাঠা অধিপতির কথা শেষ হলো না, জয়সিংহের যুবকপুত্র রামসিংহ বাধা দিয়ে বলে ওঠে –আপনার প্রত্যাশা মিথ্যা নয় মারাঠারাজ, রাজপুত কখনও শপথ ভঙ্গ করে না, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রকৃত অভিসন্ধি পিতা আগে অনুমান করতে পারেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো শিবাজীর ঠোঁটের ফাঁকে, বললেন–যে ঔরঙ্গজেবকে সারা হিন্দুস্তানের মানুষ চিনেছে, যার মতো বিবেকহীন, ধর্মবিদ্বেষী অকৃতজ্ঞ মুঘল বংশে আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নি, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে আপন সহোদরদের একে একে হত্যা করে যে সম্রাট সিংহাসনে বসেছে, দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কাউকে যে বিশ্বাস করে নি, হিন্দু প্রজাদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েও যার শান্তি হয় নি, একের পর এক ধ্বংস করেছে হিন্দু মন্দির, সারা সাম্রাজ্যের বুকে জ্বালিয়ে তুলছে অসন্তোষের আগুন–তাকে যদি

এতকালেও আপনার পিতা না চিনে থাকেন তবে বলতে হবে; হয় তিনি অপরিণামদর্শী অথবা নেহাতই ভণ্ড....

–সাবধান মারাঠারাজ। এবার তলোয়ারে হাত দেয় রামসিংহ –পিতৃনিন্দাকারীকে রাজপুত রামসিংহ ক্ষমা করবে না।

হঠাৎ হেসে ওঠেন শিবাজী। নাতিদীর্ঘ গড়ন, ক্ষীণ কটি, সিংহের মতো বিশাল বক্ষ, অমিতবীর্যশালী মারাঠা নরপতির দুচোখে নেচে ওঠে কৌতুক। রামসিংহের কাঁধে হাত রেখে বলেন –রামসিংহ, রাজপুত বীরের জাতি, আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু কৌশলী নয়, তাই চিরকালই সে চরমমূল্য দিয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে...বলতে বলতে শিবাজীর দু চোখে আবার ঝলসে ওঠে আগুনের দীপ্তি, বলেন –তবে পাহাড়ী ইঁদুর শিবাজীকে বন্দী করে রাখার সাধ্য যে আপনাদের মুঘল সম্রাটের বেশীদিন হবে না সে কথা আমি এখনই জানিয়ে দিতে পারি।

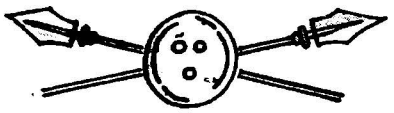

ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে এখানে দু'কথা বলে নেওয়া যাক।

১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

দিল্লীর সিংহাসনে আসীন মুঘল সম্রাট ঔরংগজেব।

মুঘল সাম্রাজ্য সেসময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের তৎকালীন কর্ণধার সম্রাট ঔরংগজেব চরিত্রের এই সব দুর্গুণের জন্যেই সে সময়টা অশান্তি আর বিদ্রোহ সাম্রাজ্য জুড়ে লেগেই ছিল। নতুন নতুন অঞ্চলে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল বিদ্রোহের আগুন।

অবশ্য সামরিকশক্তিতে মুঘল সম্রাট তখনও অপরাজেয়। ব্যর্থ হচ্ছিলেন শুধু একজায়গায়– মহারাষ্ট্রে।

তখন সেখানে এক নবীন সূর্যের উদয় হচ্ছে।

সে সূর্যের নাম–শিবাজী।

অতি অল্পবয়স থেকেই তিনি গড়ে তুলেছেন এক স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের ভিত্তি।

দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের এক জায়গীরদার শাহজীর পুত্র ছিলেন শিবাজী। মায়ের নাম জিজাবাই। দাদাজী কানাইদেব নামে এক মারাঠা বীরের তত্ত্বাবধানে ছেলেবেলা থেকেই শিবাজী দুঃসাহসী যোদ্ধা হয়ে ওঠেন এবং এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। স্থানীয় মাউলী উপজাতি যুবকদের নিয়ে এক দুঃসাহসী সেনাদল

ঔরংগজেবের সারা মুখমণ্ডল ভ্রুকুটিকুটিল হয়ে ওঠে

গঠন করে অতি অল্প বয়সেই তিনি বিজাপুর সুলতানকে পরাজিত করে তাঁর বহু দুর্গ দখল করে নেন। এরপর শুরু হয় মুঘলদের সংগে যুদ্ধ।

শিবাজী তাঁর উন্নত রণনীতি, অসীম সাহস আর গেরিলাযুদ্ধের কৌশলে মুঘলবাহিনীকে প্রথম থেকেই নাস্তানাবুদ করতে শুরু করেন। শায়েস্তা খাঁকে শায়েস্তা করেন, যশোবন্ত সিংহের মতো সাহসী মুঘল সেনাপতিও পেরে ওঠেন না এই নতুন মারাঠা শক্তির সংগে। তখন ঔরংগজেব পাঠান তাঁর সবচেয়ে দক্ষ সেনাপতি জয়সিংহকে। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে জয়সিংহ ধেয়ে যান শিবাজীকে দমন করতে।

এবার শিবাজী জয়সিংহের সংগে সন্ধি করতে বাধ্য

হলেন তারপর জয়সিংহ তাঁকে মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে রাজধানী দিল্লীতে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন এবং শপথ করে কথা দিলেন দিল্লীতে শিবাজীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

কিন্তু সে শপথে আশ্বস্ত হয়ে শিবাজী যখন পুত্র শম্ভুজীকে নিয়ে দিল্লীতে দেওয়ানি খাসে সম্রাট ঔরংগজেবের সংগে সাক্ষাৎ করলেন? সম্রাট তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দিলেন না এবং মাত্র পাঁচহাজারী মনসবদারী দিয়ে অবমাননা করতে চাইলেন। বীর কেশরী শিবাজী প্রকাশ্য দরবারেই সে অবমাননার প্রতিবাদ করলেন–ফলে তাঁকে বন্দী করে পাঠান হলো দিল্লীর এক দুর্গপ্রাসাদে।

সশস্ত্র প্রহরীরা ঘিরে রইলো সেই প্রাসাদ। বিনা অনুমতিতে কেউই সে প্রাসাদে ঢুকতে কিংবা বেরুতে পারবে না।

–রাজা।

ফিরে তাকালেন শিবাজী।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শিবাজীর আবাল্য সুহৃদ তন্নজী মালশ্রী। মাউলী উপজাতীয় এই বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর অনেক দুঃসাহসী অভিযানের সাথী।

–কিছু বলবে তন্নজী?

–হ্যাঁ, রাজা। দিল্লী থেকে মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে অপেক্ষা করছে আমাদের পাঁচশো অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক সৈন্য। যদি অনুমতি করেন আজই রাতে ফৌজ নিয়ে গোপনে দিল্লী প্রবেশ করি তারপর যেমন ভাবে শায়েস্তা খাঁর হাত থেকে আচম্বিতে পুনা দুর্গ অধিকার করেছিলাম...

ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শিবাজী। পরম সুহৃদের দিকে এবার তাকিয়ে বললেন–মুঘল রাজধানী দিল্লী আর মহারাষ্ট্রের পুনা দুর্গ এক নয় তন্নজী। আমি তো ভাবছি আজই ঔরংগজেবকে পত্র পাঠাব। আমার যাবতীয় সেনাকে যেন নিজরাজ্যে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।

–সে কি রাজা! এখানে আপনি সম্পূর্ণ অরক্ষিত।

–কেন আমাদের প্রহরায় রয়েছে শত শত মুঘল সৈনিক।

–রাজা। তন্নজী অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে তাকায় মারাঠাপতির দিকে, বলে, তবে কি আপনি বন্দিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন...

বলতে বলতেই হঠাৎ থমকে যায় তন্নজী। শিবাজীর দুচোখে রহস্যময় হাসি। এ ভংগি এ হাসির সংগে পূর্বেই পরিচিত তন্নজী।

তন্নজী চুপচাপ তাকিয়ে থাকে বীর কেশরীর দিকে। কি বলতে চান উনি? কি?

–তন্নজী! আরও কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে বলেন শিবাজী –এখানে আমি যে কথাগুলো বলবো খুব মন দিয়ে শুনে যাও, তারপর তোমার মতামত জানিও।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘাড় নাড়ে তন্নজী।

তারপর দুই সুহৃদ মন্ত্রণায় বসে। দ্বাররক্ষায় থাকে শিবাজীর বালকপুত্র শম্ভুজী।

মুঘল শাহেনশা ঔরংগজেব নিভৃত প্রাসাদকক্ষে বসে আপনমনেই ক্রূর হাসি হাসছিলেন।

অনেক কৌশলে মহারাষ্ট্রের পার্বত্য মূষিকটিকে জালে ফেলতে পেরেছেন তিনি। এরপর একেবারে বিনাশ করতে পারলেই শান্তি।

কিন্তু সরাসরি হত্যা করায় অনেক বিপদ। সাম্রাজ্যের হাল ভাল নয়। ইতিমধ্যেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে রাজপুতানা, পাঞ্জাব, আরও কিছু প্রদেশে। শিবাজীর হত্যাকান্ডে আর একটা দাবানল জ্বলার আশংকা থাকবে। কারণ পার্বত্য মূষিক হলেও মারাঠিয়াটা নিঃসহায় নয়। সারা হিন্দুস্থানের মানুষের মন জয় করেছে সে–বিশেষতঃ হিন্দুদের মধ্যে তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। ঔরংগজেব জানেন।

তাই তো বন্দী অবস্থায় কৌশলে বিনাশ করার উপায় নির্ধারণ করা দরকার। তাই নতুন করে দাবার গুঁটি সাজাচ্ছেন ঔরংগজেব। তার সারা রাজনৈতিক জীবনটাই তো দাবা খেলা।

এবার বোধহয় মারাঠিয়াটার ব্যাপারে স্বয়ং খোদাতালাই একের পর এক সুযোগ এনে দিচ্ছেন ঔরংগজেবের কাছে।

না হলে এত সহজেই বা কি করে বন্দী করা সম্ভব হলো ওই ধূর্ত পাহাড়ী ইঁদুরটাকে। শুধু কি তাই, নিজের মুক্তি প্রার্থনা করে হতাশ হয়ে হঠাৎ নিজের ফৌজকেই বা বিদায় দিতে চাইবে কেন।

ঔরংগজেব অনুমতি দিতে অবশ্যই দেরি করেন নি। যদিও ওই কয়েক হাজার সৈন্য এখানে থাকা না থাকা সমান–তবু শত্রুকে যত নিঃসংগ করে রাখা যায় ততই তো ভাল।

এখন আবার শোনা যাচ্ছে শিবাজী নাকি কি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। বিছানা থেকে নড়বার শক্তিও নেই। তার ব্যাধি এখনও পর্যন্ত কোনো চিকিৎসকই আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু সংবাদ মিথ্যে নয়। সম্রাট ইতিমধ্যেই গোপনে গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর জেনেছেন–শিবাজী একেবারেই শয্যাশায়ী।

ঔরংগজেব রাজহাকিম পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ধূর্ত কাফেরটা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

নিজের মনেই হাসেন ঔরংগজেব–মারাঠিয়াটা ধূর্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু এভাবে নিজের আয়ুষ্কাল কি খুব বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে? আল্লাহর অনুগ্রহে রোগের প্রকোপে যদি ওর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তবে আর ঔরংগজেবের হাতে নতুন করে ঘাতকের রক্ত মাখতে হয় না, কিন্তু তা যদি না হয়, তবে তো...

–সম্রাট।

চমকে তাকান মুঘল শাহেনশা।

এসে দাঁড়িয়েছে রামসিংহ। সেনাপতি জয়সিংহের পুত্র। এই মুহূর্তে ওর কি বলার আছে তা বিলক্ষণ অনুমান করতে পারেন ঔরংগজেব, তবু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়ম করে বলেন–কিছু বলবে রামসিংহ?

–হ্যাঁ, সম্রাট। এ সময়ে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালাম বলে ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু গুরুতর একটা সংবাদ কানে এল বলে না এসে পারলাম না।

–কি সেই গুরুতর সংবাদ রামসিংহ?

–শুনলাম আমার পিতা জয়সিংহ বর্তমানে দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত, শত্রুর হাতে প্রায় অবরুদ্ধ, তাঁর সেনা-সংখ্যাও যথেষ্ট নয়। তিনি আপনার কাছে আরও কিছু সেনা পাঠাতে প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আপনি তা পাঠাতে রাজী হন নি।

–তুমি কি আমার কাজে কৈফিয়ত চাইতে এসেছ?

–না সম্রাট। রামসিংহ বার বার তসলিম করে বললো–এ সংবাদ আমার বিশ্বাস হয় নি, তাই তা সত্য কিনা শুধু জানতে এসেছিলাম। যে আমার পিতা সারা জীবন মুঘল সাম্রাজ্যের রক্ষকের ভূমিকায় সারা হিন্দুস্থানের যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে রক্তদান করেছেন, দুর্জয় মারাঠা বীর শিবাজীকে পর্যন্ত সন্ধি করতে বাধ্য করেছেন...

–কিন্তু তোমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, এবার বোধহয় বিশ্রাম দরকার। ঔরংগজেব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন–ভাবছি খুব শীঘ্র জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্য থেকে

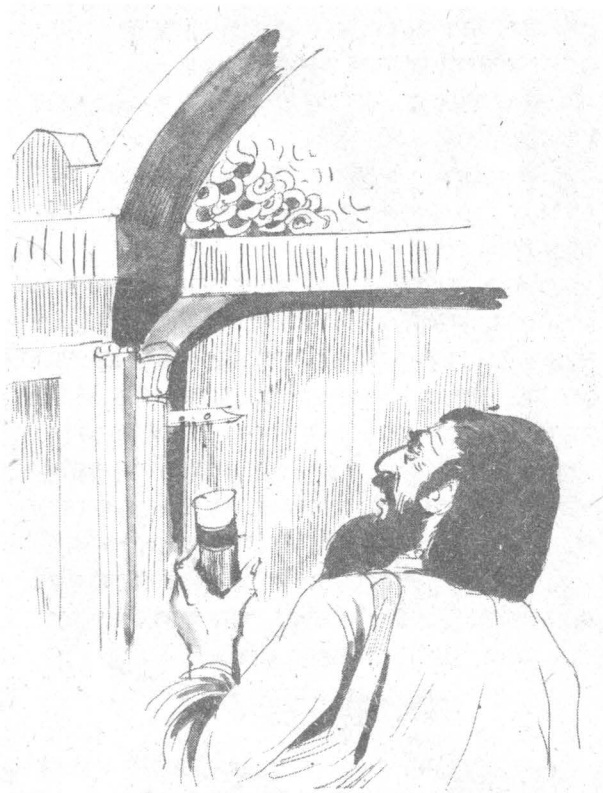

সেদিন সকালে এক সন্ন্যাসী এল প্রাসাদদ্বারে

ডেকে পাঠিয়ে যশোবন্ত সিংহকে স্থলাভিষিক্ত করবো।

–সম্রাট!

–তাছাড়া তোমার পিতার কথামতো অধিকসংখ্যক সৈন্য পাঠান এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়–বিভিন্ন রণাংগনে আমার বাহিনী এখন যুদ্ধে ব্যাপৃত...বলতে বলতে হঠাৎ থেমে সরাসরি রামসিংহের দিকে তাকিয়ে ঔরংগজেব বললেন–তোমার কি আর কিছু বলার আছে?

–আর একটা কথা।

–কি কথা?

–শিবাজীকে আমার পিতা বাক্যদান করেছিলেন যে দিল্লীতে এসে তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না। রাজপুতের বাক্যদান ব্যর্থ হয় না সম্রাট।

মুহূর্তমধ্যে ঔরংগজেবের সারা মুখমণ্ডল ভ্রুকুটি কুটিল হয়ে ওঠে, বলেন–তাকে রাজসভায় আমি মনসবদারী পদ দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করে প্রকাশ্যে আমায় অপমানিত করেছে। একমাত্র তোমার পিতার সম্মানে এখনও তার কোনো

ক্ষতি করি নি। বরং তার কথায় রাজী হয়ে তার সমস্ত ফৌজকে দিল্লী ছাড়বার অনুমতি দিয়েছি।

–কিন্তু তাঁকে তো সে অনুমতি দেন নি সম্রাট। শুনছি বর্তমানে তিনি খুবই পীড়িত...বলতে বলতে হঠাৎ সম্রাটের চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে যায় তরুণ রামসিংহ। ঔরংগজেবের দুচোখ যেন জ্বলন্ত অংগারের মতো বোধ হচ্ছে।

সে অবস্থায় কিছুক্ষণ রামসিংহের দিকে তাকিয়ে থেকে দিল্লীশ্বর বললেন –সম্রাট ঔরংগজেব আজ পর্যন্ত তার কাজের কৈফিয়ত একমাত্র খোদা ছাড়া অন্য কারুর কাছে দেয় নি। তুমি এখন আসতে পার রামসিংহ। জালে বদ্ধ মারাঠা ইঁদুর সম্পর্কে উপযুক্ত সিদ্ধান্তই আমি নেব।

রামসিংহ আর কোনো কথা না বলে আভূমি তসলিম জানাতে জানাতে বিদায় নেয় এবং তারপরই সম্রাট ডেকে পাঠান এক আফগান প্রহরীকে। সে এসে তসলিম করে।

ঔরংগজেব বলেন –আসলাম খাঁ, আজ থেকে কুমার রামসিংহের প্রতিটি গতিবিধির খোঁজ আমায় জানাবে। ওকে আমি আর বিশ্বাস করি না।

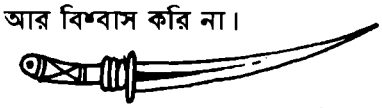

মুঘল রাজধানী দিল্লী নগরে এখন একটিই আলোচ্য বিষয়–শিবাজী রাজার অসুস্থতা। কিছুদিন যাবৎই শিবাজী ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। ব্যাধির কারণ আজ পর্যন্ত কোনো বৈদ্য ধরতে পারে নি।

শিবাজীকে আজ শুধু ভারতবর্ষের হিন্দুরাই নিজেদের আদর্শ বীর মনে করে না, এই দিল্লী শহরেই বহু মুসলমানও তাঁকে শ্রদ্ধা করে তার অসাধারণ বীরত্ব আর তেজস্বিতার জন্য। অতএব ঔরংগজেবের হাতে শিবাজী বন্দী হবার পর থেকেই দিল্লীর অনেক মানুষই মনে মনে ক্ষুব্ধ।

প্রতিদিন দলে দলে দিল্লীবাসী এসে প্রাসাদদ্বারের প্রহরীর কাছে সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে শিবাজীর শরীরের। ভেতরে যাবার তো উপায় নেই, সম্রাটের বিনা অনুমতিতে কোনো ব্যক্তিকেই শিবাজীর সংগে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু তবু শুধু প্রহরীর মুখ থেকে খোঁজখবর নিয়ে যাবার লোকের বিরাম নেই।

সেদিন সকালে এক সন্ন্যাসী এল প্রাসাদদ্বারে। সন্ন্যাসীর নাতিদীর্ঘ গড়ন, এক মুখ পাকা দাড়ি গোঁফ, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে কমণ্ডলু, লাঠি।

ব্যোম শংকর।

সন্ন্যাসী এসে দাঁড়াতেই মুঘল প্রহরী নিয়মমাফিক পথ অবরোধ করে বললো –ভেতরে যাবার হুকুম নেই।

সন্ন্যাসী শান্ত হাসি হেসে বললো –জানি; আর তোমাদের সর্বশক্তিমান সম্রাটের অনুমতি আনবো, এই দরিদ্র সন্ন্যাসীর তেমন সাধ্যও নেই। তবে ভেতরে ঢুকতে না দাও, এই বার্তাটি পৌঁছে দিও শিবাজী রাজার হাতে। বলতে বলতে তুলট কাগজে লেখা একটি পত্র সন্ন্যাসী তুলে দিল প্রহরীর হাতে।

পত্র হাতে নিয়ে মুঘলপ্রহরী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, কি আছে পত্রে?

সন্ন্যাসী ঠিক তেমনি শান্ত হেসে বললো –মথুরা থেকে সেখানকার সন্ন্যাসী সংঘ শিবাজীকে পাঠিয়েছে এই স্বস্তিপত্র, আশীর্বাদ বাণী। ইচ্ছে হয়ে পত্র নিজেরা পাঠ করে সন্তুষ্ট হলে তবেই পাঠিও। ব্যোম শংকর।

বলতে বলতে সন্ন্যাসী চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

মুঘলপ্রহরী পত্র খুলে দেখলো দুর্বোধ্য দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। তা পাঠোদ্ধার করা তার সাধ্যের বাইরে। তখন সে গেল সংস্কৃত জানা এক পন্ডিতের কাছে। পন্ডিত পাঠ করলো, কয়েকটি মাত্র অক্ষরে লেখা পত্র ঃ

"তোমার আরোগ্য কামনায় আছি
–মথুরানাথ গোস্বামী"

যদি আশীর্বাদ আর মংগল কামনা সম্বল করেই শিবাজীকে ঔরংগজেবের কবল থেকে মুক্ত করা যেত তবে তো কবেই মুক্তি পেত মারাঠা ইঁদুরটা–মুঘলপ্রহরী নিজের মনেই হেসে গোঁফ চুমরাতে চুমরাতে গিয়ে পত্র তুলে দিল শিবাজীর হাতে।

প্রহরী পত্র দিয়ে চলে যাবার পর পুত্র শম্ভুজির হাতে পত্র দিয়ে বললেন –পড়ে দেখ শম্ভু কি লেখা আছে?

বালক শম্ভুজী এই বয়সেই বিদ্যাচর্চায় পারদর্শী। সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে পড়লো ঃ

"তোমার আরোগ্য কামনায় আছি
–মথুরানাথ গোস্বামী"

সংগে সংগে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বসলেন মারাঠাবীর –শম্ভু, সময় হয়েছে। আজ থেকেই আমি রোগমুক্ত হলাম।

শিবাজী চিঠির গূঢ় অর্থ পুত্রের কাছে প্রকাশ করলেন। এটি একটি সংকেতলিপি।

পূর্ব ব্যবস্থামতো পাঠিয়েছে শিবাজীর আবাল্য সুহৃদ

এক

সুপার ফাইটার কি ক'রে দাঁতের গর্তের সঙ্গে যুদ্ধ করল।

একদিন আম্মার ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল...

"মা, মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে"

"মানে, দাঁতে ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা"

দাঁতে গর্ত?

ওকে বোঝালাম, কি ক'রে দাঁতকে একনাগাড়ে কত হামলা সইতে হয়...

"দাঁতে গর্ত হওয়ার কারণ হল, দাঁতের ফাঁকের খাবারের কণায় জীবাণু জন্মে একরকম অ্যাসিড তৈরী করে, যা দাঁতের এনামেলের ওপর হামলা করে"

...আর, ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড কি ভাবে কাজ ক'রে ওর দাঁতে সুরক্ষিত রাখে...

"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইডের ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে সত্যি-সত্যিই দাঁত শক্ত করে..."

"...ফলে, জীবাণু দাঁত ভেদ ক'রে গর্ত করতে পারে না"

"হুঁহুঁ, আম্মার স্বাদেওয়ালা, ফেনাওয়ালা সুপার ফাইটার"

আর, তার ওপর,
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড দেয়
ফরহ্যান্স-এর সেই সুবিখ্যাত যত্ন!

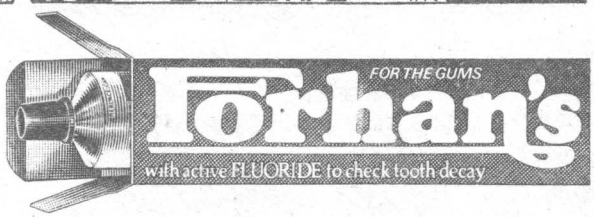

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড মাড়ি সঙ্কুচিত করে, ক্ষয়ের মোকাবিলা করে।

404-GM-203 BEN

তন্নজী মালশ্রী। পত্রদাতা সন্ন্যাসীও সে নিজেই। আসলে ঔরংগজেবের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে শিবাজীর সব সৈন্য রায়গড়ে ফেরে নি। কিছু অংশ থেকে গেছে ছদ্মবেশে এই মুঘল রাজধানীর বুকেই শিবাজীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পদক্ষেপ হিসেবে। তন্নজী ইতিমধ্যে মথুরা গিয়ে সেখানে শিবাজীর মংগলাকাংক্ষী এক মারাঠী গোস্বামীর সংগে কথা বলে এসেছেন। অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত।

এ সব ব্যাপারে তন্নজীর সংগে আগেই শিবাজীর আলোচনা হয়ে গেছে এবং ব্যাধির শুরু থেকে সবকিছুই চলছে পরিকল্পনামাফিক।

দিনকয়েকের মধ্যেই সারা রাজধানীতে রাষ্ট্র হলো চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং হাজার হাজার দিল্লীবাসীর শুভকামনায় শিবাজী দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে শুরু করেছেন। এর পর প্রতিদিন তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নগরের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত মানুষজনের বাড়িতে পাঠাতে শুরু করলেন ঝুড়িভর্তি ফল, মিষ্টান্ন।

সে এক এলাহী ব্যাপার।

প্রতিদিন সকাল হলেই একাধিক বড় বড় ঝুড়ি কিংবা পেটিকা ভর্তি ফল বা মিষ্টান্ন বয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলো বাহকরা। এক একটার যা ওজন–দুই বা ততোধিক বাহক ছাড়া সেগুলি বহন করাই সম্ভব নয়। সেগুলি পৌছে দেয়া হয় শহরের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, পন্ডিত, রাজা মহারাজা কিংবা সম্মানিত নগরবাসীর গৃহে।

ঔরংগজেব খবরটা শুনে বিস্মিত হন বটে কিন্তু আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পান না–শুধু প্রহরীদের কড়া নির্দেশ দেন যে প্রতিটি পেটিকা বা ঝুড়ি যেন ভাল করে পরীক্ষা করে তবেই ছাড়া হয়।

দ্বার-প্রহরীরা সে হুকুম তামিল করতে ভুল করে না।

এই ভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন।

তারপর যা স্বাভাবিক, বহুদিন যাবৎ একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটলে সতর্কতায় শিথিলতা আসে–এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না। প্রতিদিন ঝুড়ি বা পেটিকা পরীক্ষার আগ্রহ দ্বার-প্রহরীদের কমতে শুরু করলো–পরিবর্তে নতুন আগ্রহের সঞ্চার হলো, প্রতিদিন বাহকদের দ্বার অতিক্রম কালে নজরানা স্বরূপ নিজেদের ভাগের মিষ্টান্নের পরিমাণটা যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেয়ার দিকে।

আর এই সময়টির জন্যেই বুঝি এতদিন অপেক্ষা করছিলেন চতুর চূড়ামণি শিবাজী।

নিত্যদিনের মতো সেদিন সকালেও দুটি বড় ভারী পেটিকা বেরিয়ে এল প্রাসাদের ভেতর থেকে।

সারা রাত প্রহরায় ক্লান্ত প্রধান দ্বারপ্রহরী রোজকার মতোই অলস চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলে–কি আছে।

জানা উত্তরটাই শোনা গেল–মিঠাই।

–কোথায় যাচ্ছে?

–সোয়াই রাজা জয়সিংহের আবাসে। বলতে বলতে বাহক অন্যদিনের মতোই পেটিকার মধ্যে থেকে একটা মিষ্টান্নের ঝুড়ি বার করে এগিয়ে দেয় প্রধান দ্বার-প্রহরীর দিকে, মুখে বলে –আজ বড় আচ্ছা মিঠাই আছে সিপাইজী, খেলে আর ভুলবে না।

তাই তো বটে, আজকের ভাগের মিষ্টির ঝুড়িটাও বেশ বড়। অন্য প্রহরীদের নজরও ততক্ষণে পড়ে গেছে মিঠাইএর দিকে। ভাগ-বাটারা নিয়ে কাড়াকাড়ি।

এরই মধ্যে নিরুপদ্রবে পেটিকা বেরিয়ে যায় প্রাসাদের বাইরে।

কিন্তু আজ সে পেটিকায় সত্যি সত্যিই মিষ্টান্ন ছিল না। একটিতে বসে ছিলেন শিবাজী স্বয়ং, অন্যটিতে পুত্র শম্ভুজী।

এই ভাবেই বিশ্বাসঘাতক ঔরংগজেবকে টেক্কা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলেন ধূর্ত চূড়ামণি শিবাজী।

সম্রাট ঔরংগজেবের কাছে যখন এ খবর পৌছলো তখন শিবাজী দিল্লী থেকে অনেক দূরে।

ঐদিকে ঔরংগজেবের অবস্থা হলো শিকার ফসকে যাওয়া হিংস্র বাঘের মতো। অনেক চেষ্টা করেও যখন তিনি শিবাজীকে ধরতে পারলেন না প্রচন্ড জিঘাংসায় প্রথমেই প্রাণদন্ড দিলেন 'দিল্লীকা লাড্ডু' যাদের কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছিল সেই প্রতিটি প্রাসাদ প্রহরীকে।

এই অনুদার নীতি এবং ধর্মান্ধতায় নতুন করে জ্বলে উঠলো আগুন। ইতিমধ্যে ঔরংগজেবের পরম ভরসা সেনাপতি জয়সিংহেরও মৃত্যুসংবাদ এল। সারা জীবন মুঘলের স্বার্থে অস্ত্রধারণ করে মৃত্যুকালে তাঁর কপালে জুটলো শুধুই অপবাদ। পুত্র রামসিংহ ক্রোধে এবং অন্তর্জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ক্রমে সমগ্র রাজপুতনাতেই আগুন জ্বললো।

ঔরংগজেবের দুচোখে এখন ধ্বংসের ছায়া। তাঁর চোখের সামনেই একটু একটু করে ধ্বসে পড়তে শুরু করেছে বাবর-হুমায়ুন-আকবরের গড়া মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ।

তখন আর এক মেঘমুক্ত আকাশে এক নতুন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ছে–সেই দাক্ষিণাত্যে।

ভালকুভামের কণ্ঠ লক্ষ্য করে তরোয়াল তুলেছে রীকি। ভালকুর পক্ষে শাপে বর, সে তা চোখে দেখছে না। দেখছে না, কারণ তার চোখ আগেই বেঁধে রেখেছে টারজান। কথা? রীকি কথা কইছে খাঁটি ইংরেজীতে, তা ভালকু বোঝে না। যে-ইংরেজী বোঝে, তা দশ আনা দিশী ভাষার আর ছয় আনা ইংরেজীর একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি।

এদিকে রীকি তুলেছে তলোয়ার–

দংশনের প্রাক্কালে যেমন করে ফণাটা সাঁ করে এগিয়ে যায় কালভুজঙ্গের, ঠিক সেইভাবে ডান হাতখানা এগিয়ে দিল টারজান, চেপে ধরল রীকির হাত। শাণিত ভাষায় বললো–"ধীরে বন্ধু, ধীরে! কী করতে হবে না-হবে, সেটা বাৎলে দেব আমি। যে-যার খুসীমত কাজ করবে, চলবে না তা।"

"কিন্তু তুমি কে বাৎলে দেবার?" রোখা জবাব রীকির।

টারজান এক হ্যাঁচকা টানে রীকির হাত থেকে ছিনিয়ে নিল তরোয়ালখানা, তারপরে তার গালে কষে বসিয়ে দিল এক বিরাশি-সিক্কা চপেটাঘাত। সেই প্রচণ্ড চড়ে টাল খেতে খেতে ঘুরতে ঘুরতে রীকিটা গিয়ে আছড়ে পড়ল ঘরের দেয়ালে।

টলতে টলতে সে আবার উঠে দাঁড়ালো যখন, চোয়ালে হাত ঘষতে ঘষতে সে বলল–"দেখে নেব তোমায়।" রাগে তার গলার স্বর কাঁপছে।

টারজান কিন্তু কথা কইল যখন, তার কথায় কোন আবেগ নেই–"যা বলি, তাই কর, বাজে বোকো না।" আবেগশূন্য সাদামাঠা কথা, কিন্তু তা অমান্য করে, এমন সাধ্য কার?

এবার টারজান হেস্টরকে বললো–"সবুজমণিটা তুমি আর হর্ন পালা করে হেফাজতে রাখ। আলবুর্জ আর রীকি কাঁধে নেবে ভালকুভামকে।"

ভয়ে ভয়ে ন্যাথানিয়েল জিজ্ঞাসা করল–"কিন্তু যাচ্ছি আমরা কোথায়?" সে তো জানে যে ডাইনের ঘরের লাগোয়া বারান্দায় নারী সান্ত্রী রয়েছে একদল!

"যাচ্ছি আমরা এমরেলডার মহলে। এই ঘর থেকেই যাওয়া যাবে সেখানে।"–উত্তর দিল টারজান।

আলবুর্জ বলল–"বাঃ, আমাদের এই অবস্থায় দেখলেই সে হাঁক-ডাক করে সান্ত্রী ডাকবে, গোটা দলটাই

এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপরে।"

"এমরেল্‌ডার ভাবনা ভেবো না তোমরা। তবে এ-ঘরের এই হাতিয়ারগুলো আমরা সংগে নেব। অঘটন তো ঘটতেও পারে কোন রকম!"

হেক্টর এইবার সবুজমণিটা পেড়ে নিল অগ্নিকুণ্ডের মাথা থেকে। এদিকে আলবুর্জ আর রীকি কাঁধে তুলে নিল ভালকুভামকে। ডাইন তো তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে ভয়ে। সবাই তখন টারজানের পিছু নিয়েছে।

এ-দরোজা দিয়ে বেরিয়ে অন্য এক ঘর, তার দরোজা দিয়ে বেরিয়ে আবারও আর এক ঘর, এইভাবে তারা পৌঁছোলো এমরেল্‌ডার কক্ষে। আগল খুলে টারজান রাণীর ঘরে ঢুকল।

এমরেল্‌ডা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। পোশাক পরেছে বাইরে যাবার মতনই। চিতার চামড়ায় তৈরী সে-পোশাক। পায়ে দিয়েছে মোটা চপ্পল। বুটিতোলা হরিণের চামড়ার একটা ফালি দিয়ে তার সোনালি চুল আঁটো করে বাঁধা।

বেচারী রাণী! ভালকুভামকে মুখ বেঁধে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছে এরা, এ-দৃশ্য দেখে সে তো চেঁচিয়েই উঠতে যাচ্ছিল, ভাগ্যিস সেই সময় তার চোখ পড়ল পূর্বপরিচিত হেক্টরের উপরে। একটু আশ্বাস পেয়ে সে এইবার গিয়ে হেক্টরের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

হেক্টর তাকে আশ্বস্ত করার জন্যই বলল–"ভয় কোরো না রাণি! আমরা তোমাকে নিয়ে যেতেই এসেছি। অবশ্য তুমি যদি নিজের ইচ্ছায় যেতে চাও, তবেই।"

"নিশ্চয়, যেতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু ওকে কী করবে? ডাইনকে কী করবে তোমরা? আমরা যেখানেই যাই না কেন, যতদূরেই যাই না কেন, ও ঠিক টেনে ফিরিয়ে আনবে আমাদের, এনে কোতল করবে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে। যারা পালায়, তাদের ও ক্ষমা করে না কখনো।"

আলবুর্জ হিস হিস করে উঠল সাপের মত–"সেই জন্যই তো আগেভাগে ওকেই খতম করা উচিত আমাদের।"

এবার ন্যাথানিয়েল হর্নও অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করল টারজানের উপরে–"আমারও তাই মত। কেনই বা আমরা খতম করব না ওকে? আমরা যদি না মারি ওকে, ওই মারবে আমাদের।"

টারজান মাথা নাড়ল–"অনেক জিনিস ভাববার আছে। এই ভাল্লার নারীযোদ্ধাদের মতিগতি কী-রকম, আমরা জানি না। এই ডাইনকে তারা হয়ত কোন

আছড়ে পড়ল ঘরের দেয়ালে

একরকম দেবতা বিবেচনা করে, বিশ্বাস করে যে লোকটার কোন-না-কোন রকম দৈবশক্তি আছে। তারা জানে যে ভালকুর অবর্তমানে ভাল্লার নারীরা অসহায় হয়ে পড়বে, যে-কোন শত্রুজাতি এসে চেপে বসবে তাদের মাথার উপরে। না, না, ওকে মেরে ফেলে ঐ নারীদের মরিয়া করে তুলতে পারি না। বরং বন্দী করে রাখলে, ওর জীবনের বিনিময়ে অনেক কিছু আমরা সুবিধা আদায় করতে পারব ঐ নারীযোদ্ধাদের কাছ থেকে।"

হেক্টর মাথা নাড়ল–"আমার তো মনে হয়–ঠিকই বলেছে ক্লেটন।"

কিন্তু ওদের এ-আলোচনা আর বেশীদূর এগুতে পেলো না। ওদিকে ভালকুভামের পরিত্যক্ত কক্ষের দরোজায় পড়তে লাগল দমাদ্দম ঘুষি আর লাথি। অনেক কণ্ঠ থেকে ডাকাডাকি শুরু হয়েছে ভালকুর নাম ধরে।

টারজান তা শুনে এমরেল্‌ডার দিকে তাকালো। "সান্ত্রীদের মধ্যে উপরওয়ালা কাউকে ডাকো, দেখ ওরা কী চাইছে। আমরা ততক্ষণ পাশের ঘরে আছি।" সবাইকে ডেকে নিয়ে সে কক্ষান্তরে চলে গেল।

এমরেল্‌ডা গিয়ে দাঁড়ালো নিজের ঘরের অন্যপাশে। সেখানে মেঝেতে রয়েছে ঢাক একটা–দরোজার কাছেই। সে গুনে গুনে তিনবার ঘা দিল সেই ঢাকে, তারপর দরোজা থেকে আগল খুলে নিল। পরের মুহূর্তে এক নারীযোদ্ধা ঘরে ঢুকল খোলা দরোজা দিয়ে। একটা হাঁটু মাটিতে নুইয়ে সে সম্মান জানালো রাণীকে।

রাণী জিজ্ঞাসা করল–"বারান্দায় গোলমাল কিসের? এই ভোর রাত্রে ডাইনকে কে ডাকাডাকি করছে?"

"খবর এল–জোল্লা দেশের সৈন্য আসছে আমাদের আক্রমণ করতে। সংখ্যায় তারা অনেক। ডাইনকে ডাকছি, তার যাদুর সাহায্যে সে জোল্লার সৈন্যদের শক্তি হরণ করুক। তা নইলে আমরা লড়াই জিতব কেমন করে?"

"জোল্লারা কি লড়াই করতে জানে না কি?" জোর দিয়ে বলল এমরেল্‌ডা –"তাদের কচুকাটা করার জন্য ডাইনের যাদু দরকার নেই। তোমাদের বল্লম-তরোয়ালই যথেষ্ট সেজন্য। ডাইনকে বিরক্ত কোরো না। আমার নাম করে সব নারী-যোদ্ধাকে বল, যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ুক।"

কিন্তু নারী-সান্ত্রীটা নাছোড়। সে জেদ করে বসে আছে–"জোল্লারা শহরের দরোজায় এসে গিয়েছে। সংখ্যায় অনেক জন তারা। ভালকুভামের যাদু আমাদের পক্ষে যদি কাজ না করে, তাহলে যুদ্ধে কী হবে, বলা যায় না। কোথায় ভালকুভাম? সে সাড়া দিচ্ছে না কেন এত ডাকাডাকিতেও?"

রাগে এমরেল্‌ডা লাথি মারছে মেঝেতে–"আমি যা বলছি, তাই কর। তোমার কাজ তর্কাতর্কি নয়। সিং–দরোজায় গিয়ে শহর রক্ষার জন্য লড়াই কর। ডাইনের যাদু লাগবে না, রাণীর হুকুমই রাণীর সৈনিকদের শক্তি যোগাবে।"

"তবু একবার ভালকুভামকে দেখবই আমরা"–

সান্ত্রী রমণীটা বেয়াড়া। নিশ্চয় অন্যরাও এই কথাই বলবে। এমরেল্‌ডা চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো একটা–"বহুৎ আচ্ছা। আগে যুদ্ধে যাও। জোল্লাদের হাঁকিয়ে দিয়ে দরবার ঘরে হাজির হও। সেইখানেই ডাইনকে পাবে দেখতে। কিন্তু সব কাপ্তেনকেই হাজির হতে হবে, মনে রেখো।"

সান্ত্রীটা চলে গেল এইবার, দরোজা বন্ধ করে।

আর তক্ষুণি ভিতরের দরোজা খুলে টারজান এসে এ-ঘরে ঢুকল। "কী মতলব এঁটেছ, বল তো?" –জিজ্ঞাসা করল রাণীকে। রাণী উত্তর দিল–"কী আর মতলব! একটুখানি সময় যাতে পাওয়া যায়, তাই আর কি।"

"তাহলে সত্যি সত্যি দরবার ঘরে তুমি হাজির করতে চাও না ভালকুভামকে?"

"না, না, তাতে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওরা যদি দেখে যে ভালকুভামকে বেঁধে, চোখে ঠুলি পরিয়ে, মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে ঘোরানো হচ্ছে, ঐ সান্ত্রীরা খুন করে ফেলবে আমাদের সবাইকে। ওদিকে আবার, আমরাই যদি ভালকুভামকে ছেড়ে দিই, সেই খতম করবে আমাদের।"

"সবই সত্যি, তবু আমার মনে হয়, তুমি মতলবটা এঁটেছ ভাল। ঐ কাজই করা যাক–"একটা কুটিল হাসি দেখা দিল টারজানের ঠোঁটের কোণে।

"পাগল! পাগল হয়েছ তুমি"–বলে উঠল এমরেল্‌ডা।

"হয়ত পাগলই। কিন্তু ভেবে দেখ, এখনই যদি আমরা বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করি ভাল্লা থেকে, একটা যুদ্ধ বাধবেই। কিন্তু অন্যদিক দিয়েও উপায় হতে পারে একটা বোধ হয়। একটা নকল সবুজমণি আছে না? সেটা কোথায় জান?"

"তা জানি"–

"সেইটে নিয়ে এস। এক্ষুণি একটা চামড়ার আবরণে ভাল করে ঢেকে, যাতে অন্য কারও চোখে না পড়ে, বলবেও না অন্য কাউকে। জানলে শুধু তুমি, আর জানলাম শুধু আমি।"

"কিন্তু তুমি করতে চাও কী?"

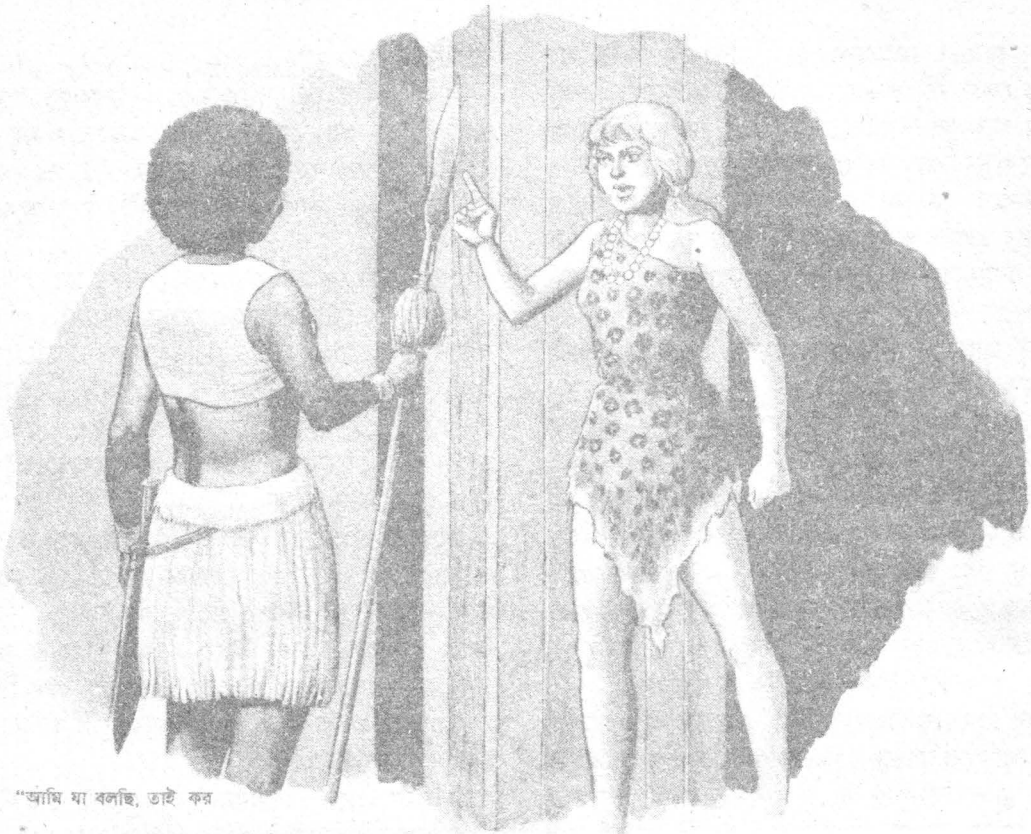

"আমি যা বলছি, তাই কর

"সবুর কর, দেখতেই পাবে। এখন যা বলি, তাই কর।"

হঠাৎ এমরেল্‌ডার আত্মসম্মানে ঘা লাগল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল–"তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি রাণী।"

"আমি কিন্তু তোমাকে জানি স্রেফ এক বিপন্না নারী বলে, যার একান্ত ইচ্ছা এদেশ থেকে পালিয়ে ইংল্যাণ্ডে যেতে।"

এমরেল্‌ডার মুখখানা লাল হয়ে উঠল।কিন্তু কোন কথা আর সে বলল না। নীরবে চলে গেল, কক্ষের পরে কক্ষ পেরিয়ে ভালকৃভামের মহলে।

গেল মাত্রই কয়েক মুহূর্তের জন্য। ফিরে যখন এল, তার হাতে চামড়ায় ঢাকা একটা বাণ্ডিল।

টারজান সেটা নিয়ে নিল–"এইবার আমরা তৈরী, চল দরবার ঘরে।" সাথীদেরও সে ডেকে নিল। রাণীকে জিজ্ঞাসা করল, "দরবার ঘরে যাওয়ার গোপন রাস্তা নেই?"

"আছে। এই দিক দিয়ে। আমার পিছনে এসো–" বললো এমরেল্‌ডা। তার অনুসরণ করে ভালকৃভামের কক্ষেই আবার তারা ফিরে এল সবাই। সেখানে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট দরোজা, রাণী তা খুলে ফেললো। দরোজার নীচে একটা সিঁড়ি, তাই বেয়ে নেমে যেতেই তাদের সামনে পড়ল দ্বিতীয় আর এক দরোজা।

সেই দরোজার ওপিঠে দরবারের মঞ্চ, ডাইন আর রাণীর স্বর্ণাসন যার উপরে স্থাপিত।

কেউ নেই দরবার ঘরে। সেনানায়কেরা কেউ এসে পৌঁছোয়নি তখনো। সিংহাসনের সমুখে যে টেবিলটা আছে, টারজানের নির্দেশে তারই উপরে সবুজমণিটা স্থাপন করল হেক্টর। আলবুর্জ আর রীকি ভালকৃভামকে তার নিজের চেয়ারেই বসিয়ে দিল। তবে এখন তার চোখ আর হাত-পা সবই বাঁধা, মুখের ভিতরও কাপড় গোঁজা।

এমরেল্‌ডাও আসন গ্রহণ করল তার নিজের চেয়ারে। যে-টেবিলের উপরে সবুজমণি রাখা হয়েছে, টারজান নিজে দাঁড়ালো তারই পাশে। হেক্টরেরা অন্য সবাই দাঁড়িয়ে গেল দু'খানা সিংহাসনের পিছনে।

[চলবে]

ছবি : নারায়ণ দেবনাথ

এসো, দূরের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি

অরূপরতন ভট্টাচার্য

তুমি তোমার বন্ধুর কথা শুনছো। শুনছো আর কথা বলছো। এইভাবেই আলাপ-আলোচনা চলে। কথাবার্তায় কখনো গলা চড়ে, কখনো মুখের ভাব বদলায়, কখনো মুখের ভাষায় জোর দেওয়ার জন্যে হাত নাড়তে হয়, কখনো সোচ্চার হই, কখনো ফিসফাস করি—এইরকমই তো আমাদের কথা বলার রীতি-নীতি বা ধরন-ধারণ। এইভাবে কে কি বলতে চায় বুঝি, কাকে কি বোঝাতে চাই বলি। এত সহজে সব কিছু চলে যে এ নিয়ে চিন্তা করারই কোনো অবকাশ নেই। বাংলা ভাষায় ভর করে আমাদের ভাবের দেওয়া-নেওয়া।

কিন্তু ভাষা যেখানে আলাদা সেখানে কি হয়? তুমি যে ভাষায় কথা বলছো, আর একজন তার মানে বুঝতে পারছে না। কিংবা আর একজন যে ভাষায় তোমায় জানাতে চাইছে, সে ভাষা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। তাহলে কি হবে? বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের বেলায় এ রকমটা প্রায়ই হয়। সেখানে দো-ভাষী অর্থাৎ দুটো ভাষা জানা লোকেরা কাজ চালায়। কিন্তু আমার তোমার বেলায় বিস্তর অসুবিধে। মুখের সামনে হাত-পা নেড়ে, মুখ-চোখ ঘুরিয়ে যতটুকু বোঝানো যায়, ততটুকুই যথেষ্ট। তার বেশি আর কিছু নয়।

তবু সামনে থাকলে একটা উপায় হয়। অসহায় মানুষের খড়কুটো ধরার মতো একটা কিছু। কিন্তু যদি একজন আর একজনের কাছ থেকে থাকে অনেক, অনেক দূরে, তাহলে কি হবে? তখন একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়া বললেই কি হাল ছেড়ে দেওয়া চলে। যেখানে বিজ্ঞানীরা আছেন, সেখানে অত সহজে হাল ছাড়ার কথা আসে না।

পৃথিবীর ব্যাপার হলে এ আলোচনা এতদূর গড়াতো না। বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ছাড়িয়ে, মর্তের সীমারেখা পার হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। ভাবছেন আমাদের সৌরলোকেই হোক বা আমাদের সৌরলোকের বাইরের অন্য কোথাও, অন্য কোনো গ্রহই হোক, বুদ্ধিমান এবং অনেক উন্নত জীব যদি সেখানে থাকে, তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবে কি করে!

বুদ্ধিমান জীব থাকার সম্ভাবনাটা কিন্তু খুব উজ্জ্বল, কিন্তু যোগাযোগ বা ভাব-বিনিময়ের ব্যাপারটা যে খুব কঠিন, এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরে গেছো। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে অনেক দূর এগিয়েও গেছেন। এ বিষয়ে দু'জনের নাম উল্লেখ করতেই হয়। একজন ফ্রাঙ্ক ড্রেক, আর একজন কার্ল সাগান।

ভেবে এঁরা ঠিক করলেন, ভাষায় তো কাজ চলবে না।

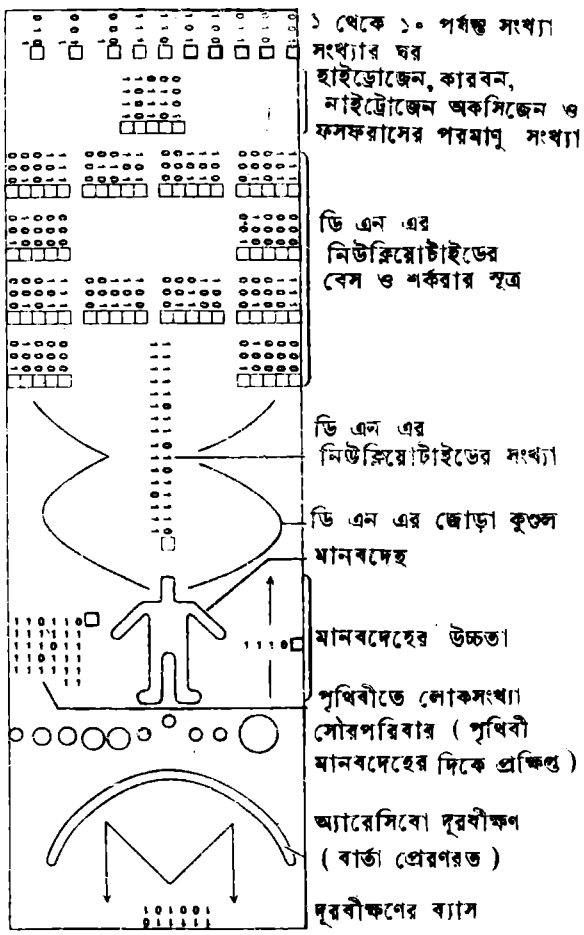

অ্যারেসিবো মানমন্দির থেকে প্রেরিত বার্তাচিত্রের ভেতরের খবর

সঙ্কেতের ভিত্তিতে এগোলে মন্দ হয় না। কিন্তু যে সঙ্কেতে সংবাদ পাঠানো হবেএখান থেকে, সে সঙ্কেত অন্যে বুঝবে তো? যাদের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত যাচ্ছে, তারা যদি না বোঝে, তাহলে তো সব চেষ্টাটাই বৃথা।

তাহলে কি করা যায়?

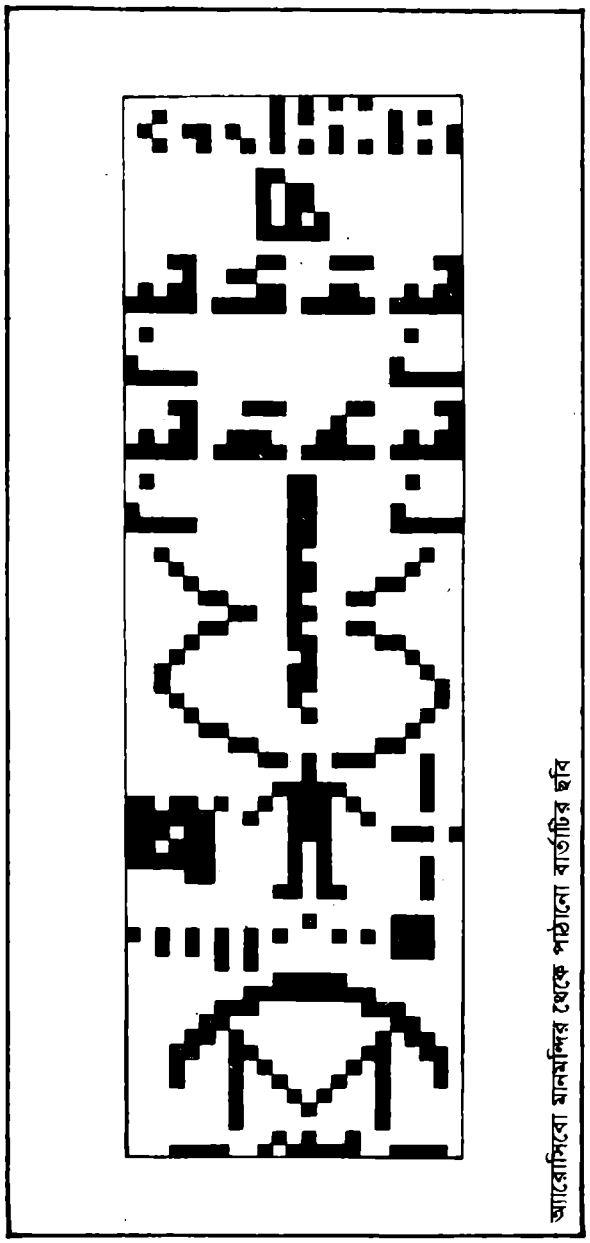

আরেসিবো মানমন্দির থেকে পাঠানো বার্তাটির ছবি

বিজ্ঞানীরা ভেবে ঠিক করলেন, বহির্জগতে যদি কোথাও বুদ্ধিমান জীব থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে সংখ্যার ধারণা বা সংখ্যা লেখার একটা পদ্ধতি থাকবেই। সে পদ্ধতি ০ থেকে ৯-এর উপর নির্ভর করা আমাদের দশমিক পদ্ধতি না হতে পারে, না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেমনই হোক, কোনো পদ্ধতি না থেকে পারে না।

যে কোনো ধারণার দুটো দিক আছে, একটা হ্যাঁ-এর দিক, আর একটা না-এর। এই হ্যাঁ আর না যেন দুটো সংখ্যা। তাহলে দু'টো সংখ্যার কমে কিছুতেই কাজ চলবে না। বহির্বিশ্বের যে কোনো সভ্যতার কাছে এই দুটো সংখ্যা থাকবেই, তাদের যে নামই থাক, বা যে নামেই ডাকা হোক না কেন।

০ থেকে ৯ পর্যন্ত দশটা অঙ্ক নিয়ে যেমন দশমিক সংখ্যা লিখন পদ্ধতি, তেমনি ০ আর ১ এই দুটো অঙ্ক নিয়ে একটা সংখ্যা লিখন প্রণালী আছে। এর নাম বাইনারি কোড (Binary code) বা দ্বি-মাত্রিক পদ্ধতি। এই দুটোর চেয়ে কম অঙ্ক নিয়ে আর কোনো সংখ্যা লিখন প্রণালী হতে পারে না। এখানে ০ যেন না বা নেই আর ১ হ্যাঁ বা আছে।

বহির্বিশ্বে যে কোনো উন্নত, সভ্য দেশে সংখ্যা লিখন পদ্ধতি থাকবে। তা দ্বি-মাত্রিকের চেয়ে বেশি হতে পারে। কিন্তু দ্বি-মাত্রিক ভাবনাটা একেবারে প্রাথমিক ভাবনা।

দ্বি-মাত্রিক পদ্ধতিতে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা হয় যে ভাবে তা হল ১ = 001, ২ = 010, ৩ = 011, ৪ =

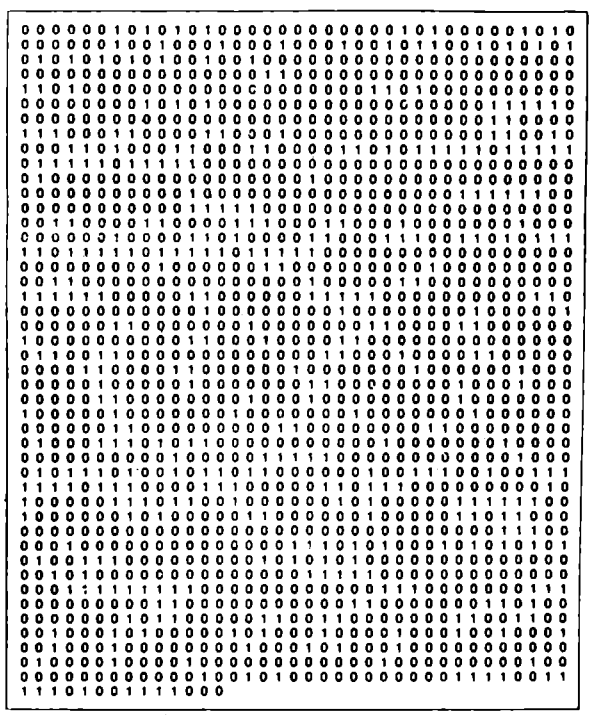

আরেসিবো মানমন্দির থেকে হারকিউলিস মণ্ডলের উদ্দেশে পাঠানো '০' আর '১' এর বার্তাচিত্র।

১০০, ৫ = ১০১, ৬ = ১১০, ৭ = ১১১, ৮ = ১০০০, ৯ = ১০০১, ১০ = ১০১০।

ফ্রাঙ্ক ড্রেক আর কার্ল সাগান দ্বি-মাত্রিক পদ্ধতিতে একটা বার্তা তৈরি করেন শুধু ০ আর ১ কাজে লাগিয়ে। এটা পাঠানো হল হারকিউলিস মণ্ডলের একটা তারকাপুঞ্জের উদ্দেশে। দেখা যাক, ফলাফল কি হয়, এমন একটা উদ্যোগ। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। অ্যারোসিবো মানমন্দিরে একটা ১০০০ ফুট ব্যাসের বেতার দূরবীক্ষণ আছে, সেটা থেকে।

কিন্তু এই বার্তাটা পাঠানো হবে কি ভাবে?

আমাদের মর্স কোডে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। তাতে টরে টক্কায় বার্তা চলে। ডট আর ড্যাশ। এই ডট আর ড্যাশের মতো সাঙ্কেতিক স্পন্দন যাবে ০ আর ১-এর বদলে। ০ যেন 'নেই' আর ১ 'আছে', খেয়াল রাখতে হবে এইভাবে।

বার্তায় '০' আর '১'-এর সর্বমোট সংখ্যা ১৬৭৯। এটি ২৩ আর ৭৩, এই দুটি মৌলিক সংখ্যার গুণফল। বিজ্ঞানীরা এ থেকে বোঝাতে চাইছেন যে, বার্তাটি হয় হবে ৭৩ লাইনের না হলে ২৩ লাইনের। দেখা গেছে, ৭৩ লাইনে ধরলে বার্তাটির একটা মানে ফুটে ওঠে।

কিন্তু যাদের জন্যে বার্তা, ০ আর ১-এর জন্যে তারা কি ধরবে? '০' মানে না বা নেই—তার জন্যে ফাঁকা ঘর আর ১ মানে হ্যাঁ বা আছে—তার জন্যে ভর্তি ঘর বা কালো ঘর। এ সেই কাঠের ফ্রেমে নকসা কাটার মতো।

ফলে আমার নানা খবরে ভরা একটা সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে। এর মধ্যে মানুষের ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছো?

দূরের কোনো গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে এইভাবে কোনো সঙ্কেতবার্তা তোমরাও তৈরি করতে পারো।

বাঘ বেচারা

চিড়িয়াখানায় কর্মী স্ট্রাইক,
পুজোয় কেন নাইকো মাইক?

সারাটি দিন সব উপোসী,
বাঁদর কুমীর ছোট্ট পুসি।

ক্যাঙারুটা আঙুল চোষে
খাচ্ছে মশা হিপোয় মোষে।

চাটছে হাতি কানের কুলো
ডিগবাজি খায় ভোঁদড়গুলো।

খিদের চোটে বাঘ বেচারা,
লুকিয়ে খায় সজনে চারা।

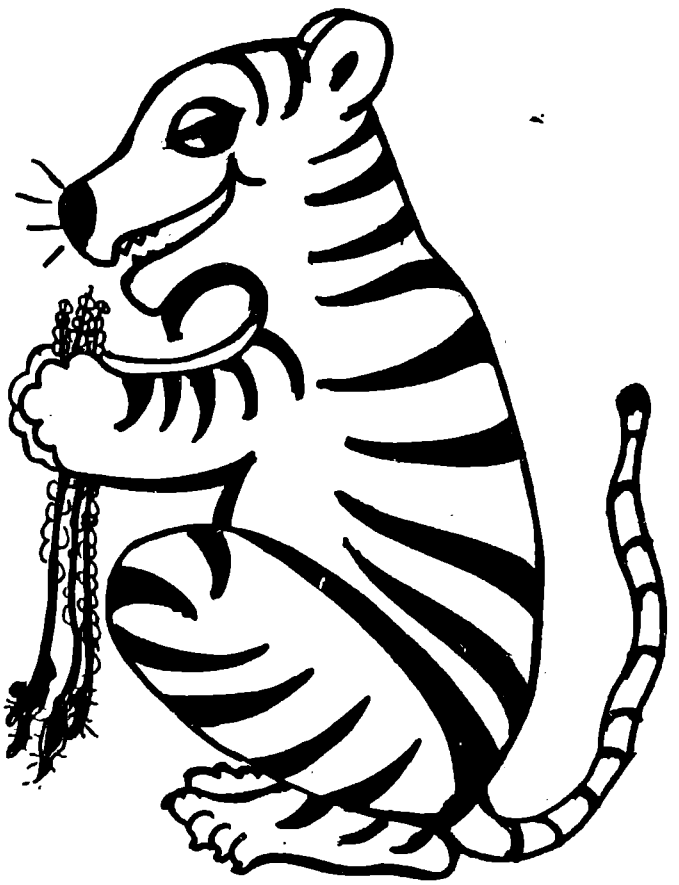

ছবি ও ছড়া দীপঙ্কর বিশ্বাস

অনিলবরণ ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

নকল ভূত

সুব্রত বসাক

বেশ অনেকদিন পর বৌদি এল। বৌদির বাপের বাড়ি আন্দামানে। যে আন্দামানে ইংরেজদের একদা সেলুলার জেল ছিল।

এবারে বৌদি একা নয়। বৌদির দুই যমজ ভাই রুকু সুকু এবং বৌদির এক বোন সঞ্চিতাও সংগে এসেছে। সুতরাং সন্ধ্যের আসর জমজমাট।

আমার আবার সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আমি পড়াশুনায় তেমন ভাল নই। তবে কোনোমতে উতরে যাই। সুতরাং এবারেও উতরে যাব এ আশা আমার আছে। আর বাড়িতে এরকম লোকজন এলে কারই বা পড়াশুনা হয়।

সেদিন সন্ধ্যের আসর বসতেই কথা উঠল ভূত নিয়ে। আন্দামানে নাকি অনেক ভূত আছে। গেছো ভূত, মেছো ভূত, টেকো ভূত আরো বিভিন্ন রকমের সব নাম। আমি

বললাম– তুমি ভূত দেখেছো নাকি!

বৌদির বোন ঠোঁট উল্টে বলল–হুঁঃ। আমি দেখব ভূত। ভূত আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। ভূত আছে আমি বিশ্বাস-ই করি না।

–তাই নাকি! আমি বললাম–আমাদের এখানে কিন্তু অনেক ভূত। একদিন দেখাব।

–ভূত কেমন দেখতে? তোমাদের এখানের ভূত খুব লম্বা বুঝি? বলে খিল খিল করে হেসে উঠল সঞ্চিতা। আমি রেগে গিয়ে বললাম–ঠিক আছে যখন দেখবে তখনই বুঝতে পারবে লম্বা কি বেঁটে।

তারপর বৌদিকে বললাম–যে ভাবেই হোক সঞ্চিতাকে ভূত দেখাতেই হবে। বৌদি বলল–কি ভাবে!

আমি মোটামুটি বুঝিয়ে দিলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা মাঠ আছে। কয়দিন পর অমাবস্যা। সুতরাং অসুবিধা হবে না। আমি আর সঞ্চিতা মাঠের এদিকটায় দাঁড়িয়ে থাকব। এমন সময় বৌদি একটা সাদা কাপড়ে সর্বাংগ ঢেকে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াবে। আমি ভূত ভূত বলে চেঁচিয়ে উঠব। ব্যস্। কেল্লা ফতে।

বৌদি আমার পিঠ চাপড়ে বলল–দারুণ হবে। কিন্তু ভয়ে আমার বোন যদি অক্কা পায় তাহলে কিন্তু তোমার দোষ।

আমি বললাম–ঠিক আছে। আর শোনো এ কথা যেন কেউ না জানে।

বৌদি সায় দিয়ে চলে গেল।

আমি বৌদির দুই ভাই রুকু সুকু ও আমার দুই বন্ধু অমর ও জয়দেবকেও আমার প্রস্তাবটা জানালাম। ওরা সানন্দে সম্মতি জানাল। যাক ভালই হলো। দলে ভারী হলে তেমন বেগ পেতে হবে না। ওদের কি কি করতে হবে আমি বুঝিয়ে দিলাম। ওরা খুশি হয়ে চলে গেল।

দেখতে দেখতে অমাবস্যা এসে গেল। আজকে রাতেই সঞ্চিতাকে ভূত দেখানো হবে।

রাত্রি বারোটা।

আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম মাঠটার এপাশে। চারিদিকে অন্ধকার। কেমন যেন একটা ভৌতিক পরিবেশ। হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল। সাদা কাপড়ে সর্বাংগ ঢাকা। মূর্তিটি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। আমি ফিস-ফিস করে বললাম–ঐ দেখো ভূত।

সঞ্চিতা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মূর্তিটির দিকে। হঠাৎ একটা আলো পড়ল মূর্তিটির উপর। পরক্ষণেই নিভে গেল। আর মূর্তিটিও যেন সংগে সংগে উবে গেল। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার উঠল কোথা থেকে যেন। আমার তখন মনে হচ্ছে সত্যিকারের ভূতই যেন প্রত্যক্ষ করছি।

ছায়ামূর্তিটাকে আবার দেখা গেল মাঠের মধ্যে। মনে মনে বললাম বৌদির অভিনয়টা দারুণ হচ্ছে।

এমন সময় সঞ্চিতা একটা কাণ্ড করে বসল। একদৌড়ে গিয়ে ছায়ামূর্তিটাকে জাপটে ধরল। তারপর হাসতে হাসতে বলল–অনেক হয়েছে। এখন সাদা কাপড়টা খোল দেখি।

তারপর সে এক কাণ্ড। বৌদি তো এসে আমাকে ধমকায়–তোমার জন্যেই সব ভেস্তে গেল। রুকু সুকু আর তোমার বন্ধু দুটোকে দলে টানার কি প্রয়োজন ছিল। ওরাই সব ফাঁস করে দিয়েছে। এমনি কি বলে...

এমন সময় সঞ্চিতা ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বলল–ঠিক বলেছ দিদি ওরা না বললে সত্যি ভয় পেয়ে যেতাম। আর তোমরাও ভূত আছে বলে দিব্যি চালিয়ে যেতে।

ছবি–দিলীপ দাশ

অনিলবরণ ঘোষ স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

বিফল যাত্রা

পার্থসারথি সরকার

প্রতিবারের মতো এবারও আমরা ঠিক করলাম দুর্গাপূজার পর সন্দাকফু ট্রেকিং এ যাব। এবারকার ভ্রমণের প্রস্তাবটা তুলেছিল পেম্বা দাজ (দাদা)–কারণ সে নাকি দু-দুবার সন্দাকফু গেছে। সন্দাকফুর অসীম সৌন্দর্যকে নাকি ভোলা যায় না। তাই সে আবার যেতে চায়। আর এবারে আমাদের সংগী করতে চায়। আমি এবং আমার আরও তিন বন্ধু দাওয়া, নোয়েল ও বিনয়, পেম্বা দাজুর প্রস্তাব মতো রাজী হয়ে যাই কারণ সন্দাকফু যাব এটা আমাদেরও অনেকদিনের ইচ্ছা। বন্ধুদের মধ্যে আমার আর দাওয়ার একবার সন্দাকফু যাবার অভিজ্ঞতা আছে। তবুও দাওয়ার অনিচ্ছার কোনো কারণ ছিল না কারণ সে যেসময় গিয়েছিল সেটা মোটামুটি ভাবে বলা যায় বর্ষাকাল।

সন্দাকফু ট্রেকিং-এ যাওয়া এখন অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। যারা দার্জিলিং ঘুরতে আসে তারাই একবার সন্দাকফু ঘুরে যায়। এর মধ্যে বিদেশীর সংখ্যাও কম নয়। যারা প্রকৃতিকে দেখতে জানে তারা এর হাতছানিকে কখনই দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। সন্দাকফু সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১২,০০০ ফিট উঁচুতে অর্থাৎ পাহাড়ের রাণী দার্জিলিং-এর তুলনায় ৫,০০০ ফিট উঁচু। সুউচ্চ সন্দাকফু থেকে এভারেস্টের চূড়া, সূর্যোদয়, দার্জিলিং-এর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ ভাবে উপভোগ করা যায়, প্রকৃতি তার সৌন্দর্য মানুষের জন্য এখানে অকৃপণ হাতে ছড়িয়ে রেখেছে। তাই সন্দাকফু যাওয়ার জন্য আমাদের মন ছটফট করছিল।

যাবার দুদিন আগে আমরা Himalayan Mountaineering Institute-এ গেলাম আমাদের tracking-এর জন্য জুতো, জ্যাকেট, কীট ব্যাগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে। কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে সবার পোশাক ভাড়া করা হলো। পরদিন সকালে খাওয়ার বাসনপত্র সবাই কিছু কিছু ভাগ করে নিয়ে Land Rover করে রওনা দিলাম। বিকেলের দিকে আমরা মানেভঞ্জ নামক একটি জায়গায় পৌছলাম এবং সেখানে একটি ফরেস্ট বাংলোতে উঠলাম। সেখানে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে আমরা সবাই মিলে ঠিক করতে বসলাম কোন রাস্তা দিয়ে গেলে আমাদের পক্ষে সহজ হবে ও সময় কিছুটা কম লাগবে। পেম্বা দাজু দু-দুবার এখানে আসায় তার এখানকার পথ-ঘাট সবই জানা। তাই সে আমাদের দুতিনটে পথ বাতলে এবং ব্যাখ্যা করে আমাদের উপরই

ভার দিল রাস্তা বেছে নেওয়ার। এরই মধ্যে দাওয়া বলতে লাগল আরও একটা পথ আছে যেটা অন্যান্যগুলির তুলনায় অনেক সহজ। এই নিয়ে পেম্বা দাজু ও দাওয়ার মধ্যে তুমুল বচসা বেধে গেল। একে অপরকে বোঝাতে লাগল তু জান্‌দাই নস্‌, তিয়বাটো চাই সার স্টিফ রইছো। অর্থাৎ তুই জানিস না সেই রাস্তা প্রচণ্ড খাড়া। এই কথাটা বলা বাহুল্য পেম্বা দাজু, দাওয়াকে বলেছিল। দাওয়া-ও তার প্রত্যুত্তরে বলছে, আমি গিয়েছি আর তুই আমাকে শিখাবি (মো গয়ে অন্ত তোইলে মলয় শিখাউছস্‌)। এরই মাঝে বিনয় এসে পেম্বা দাজুকে বলল, তুমি থামো, তোমার তো সব রাস্তাতেই যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, বরঞ্চ দাওয়া নির্দেশিত নতুন পথেই চল। অবশেষে বিনয়ের মধ্যস্থতায় দাওয়া নির্দেশিত পথেই আমরা যাব স্থির করলাম।

পরদিন সকালে আমরা প্রাতরাশ সেরে রওনা দিলাম দাওয়ার নেতৃত্বে। এবড়ো-খেবড়ো, সরু, কখনও খাড়া আবার কখনও ঢালু পথ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের সবার ঘাম বেরিয়ে গেল। এরই মাঝে পেম্বা দাজুর সঙ্গে দাওয়ার আবার কথা কাটাকাটি শুরু হলো, পেম্বা দাজু বলতে লাগল, এদিক দিয়ে কোনোদিনই সন্দাকফু পৌছনো যাবে না। দাওয়া বলতে লাগল, আগে চল। এই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমরা যখন ক্লান্ত তখন সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। ফলে আমরা সবাই হতাশ হয়ে গেলাম এবং কাছে কোনো বাড়ি খুঁজতে লাগলাম যেখানে গেলে আপাতত কোন জায়গায় পৌছেছি বুঝতে পারা যাবে এবং রাত্রিবাস করা যাবে। যে বাড়িটা দেখতে পেলাম সেটা কমসে কম ২ কি.মি. দূরে। বাধ্য হয়ে সেখানেই রওনা দিলাম এবং পৌছে বুঝতে পারলাম আমরা সম্পূর্ণ উল্টো পথে এসেছি এবং যে জায়গায় পৌছেছি তার নাম লামডিং। সেখান থেকে বিজনবারি শহরের দূরত্ব মাত্র ৪ কি.মি.। ফলে সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে আমরা সেই রাত্রি কাটিয়ে পারদিন বিজনবারি হয়ে দার্জিলিং ফিরে এলাম। আমরা এতই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমাদের পক্ষে আবার ঐ জায়গা থেকে সন্দাকফু যাওয়ার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তার উপর আমাদের খাওয়া-দাওয়া, টাকা পয়সা সবকিছুরই অভাব হয়ে পড়েছিল। তবে দাওয়া খুব লজ্জিত তার অনমনীয় মনোভাবের জন্য। আমরা এই ভাবেই একটা আলাদা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম। দেখা যাক্‌, প্রকৃতি আবার আমাদের দুঃসাহসিক অভিযানে ডাকে কি-না!

ছবি–দিলীপ দাশ

শ্রী নিমাই চন্দ্র দে (বেলিয়াঘাটা মেন রোড,কলকাতা-১০) এ.কে.দে এণ্টারপ্রাইজের স্বর্গত অজিতকুমার দের নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন। তাঁর প্রস্তাবমত আমরা অজিতকুমার দে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

অজিতকুমার দে

জন্ম : ২৬ ভাদ্র ১৩৫২ ঃ মৃত্যু : ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪

বিষয়বস্তু

হাসির গল্প

লেখা ৩০ আষাঢ় ১৩৯৩ সালের মধ্যে পাঠাতে হবে। ফলাফল আগামী কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার-২৫ টাকা **দ্বিতীয় পুরস্কার-১৫ টাকা**

নতুন ধাঁধা

[১] প্রথম দুইয়ে নতুন মানে
শেষ দুয়েতে ওজন আনে,
মরুর জাহাজ মধ্যের দুই
চারে মিলে বৈজ্ঞানিক ছুঁই।

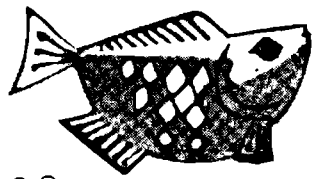

সৌমেন সামন্ত/নাড়াদাঁড়ী/ব্যবত্তারহাট, মেদিনীপুর

[২] যন্ত্রমাঝে দিয়ে চরণ।
ভাগ্যটাকে করি বরণ।।

শিবাশিস, দেবাশিস ও শুভাশিস বিশ্বাস/বগুলা কলেজ পাড়া, নদীয়া

[৩] মুড়ো-ল্যাজা কম হলে
চিন্তা করি বেশি
মধ্যমাতে 'ল'-এর খেলা
লিখতে পেয়ে খুশি।

গৌতম সুরাল/মাইনিং রিসার্চ, ধানবাদ, বিহার

[৪] জননী ও জোট
বাজাও এক চোট।

–মিনারা ও মিঠু/ডানকুনি হুগলী

চৈত্র সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

[১] কয়লা [২] মাছি [৩] সেতার [৪] নিউটন

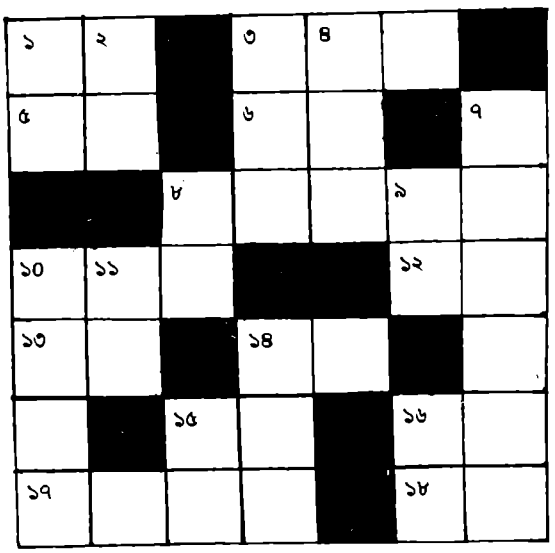

১	২	■	৩	৪		■
৫		■	৬		■	৭
■	■	৮			৯	
১০	১১		■	■	১২	
১৩		■	১৪		■	
	■	১৫		■	১৬	
১৭				■	১৮	

[এবারের শব্দমালার সূত্রগুলোর প্রত্যেকটিতে কোনো না কোনো পরিচিত রবীন্দ্রসংগীতের একটা করে লাইন তুলে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রতি লাইনে একটা করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। হারিয়ে যাওয়া শব্দ/শব্দগুচ্ছ দিয়ে শূন্যস্থানগুলো ভরাট করতে পারলেই শব্দমালার ছক পূর্ণ হবে।]

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ

[১] তুমি যত—দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা

[৩] —, তোমার করুণ চরণখানি

[৫] —নাম লয়ে চন্দ্রতারা অসীম শূন্যে ধাইছে

[৬] —এ মধুর খেলা

[৮] —তারে বলা যায়

[১০] গ্রহ—চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে

[১২] —লোকে বাজে জয়ডঙ্ক

[১৩] —করেছি, তোমার হাতে আপনারে

[১৪] সুর ভুলে—ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে

[১৫] গরুড়ের—রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত আকাশে

[১৬] এখন—দেরি নয়, ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো

[১৭] এসো—ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে

[১৮] আমরা দু—স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে

ওপর-নিচ ঃ

[১] শুধু ডাল——জল পথ্য ক'রে

[২] বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি——,

[৩] আমার——গেল বৃথা কাজে,

[৪] ——ছেড়ে গেলে চলে, এলে সকল-মাঝে

[৭] ——তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে

[৮] ——ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে

[৯] ——পরে যায় দিন, বসি পথপাশে

[১০] মণিপুরনৃপদুহিতা তোমারে চিনি——!

[১১] তোমার——জয়ের অভিযানে

[১৪] সুন্দরের পাদপীঠতলে——কল্যাণদীপ জ্বলে

[১৫] আজ প্রথম ফুলের——প্রসাদখানি, তাই ভোরে উঠেছি

[১৬] ——তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে

[উত্তর আগামী সংখ্যায়]

এটি তৈরি করেছেন– বিভাংশু দত্ত/পল্লীশ্রী, আরামবাগ

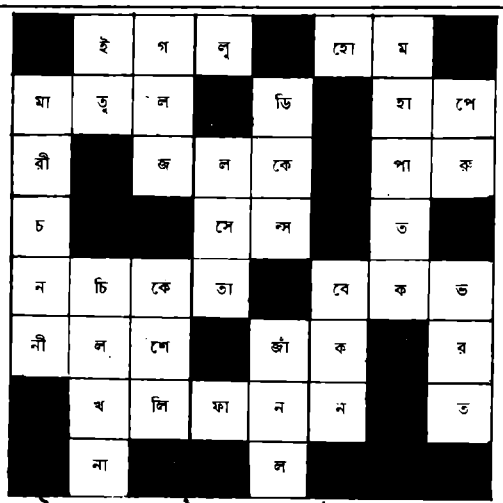

চৈত্র সংখ্যার শব্দমালার উত্তর ঃ

পৌষ সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

।। কলকাতা।।

দীপাঞ্জলী, সোমা, শুভঙ্কর, গৌতম ও পার্থ/ পটলডাঙা স্ট্রিট; তনু, পাবু, টাবু, লাবু, রাজা, যীশু, গোগল, রাধা, মালা, মলি ও পার্থ/ বিজয়গড়; শুক্লা, কৃষ্ণা, পূর্ণিমা ও অনামিকা/ বেলঘরিয়া সি.পি. এস্টেট; ইলোরা ও ইন্দিরা রায়/ গাঙ্গুলীবাগান; ইন্দ্রাণী ও দেবযানী/ ঘোষপুর পার্ক; রীমা মিত্র/ গোকুল বড়াল স্ট্রিট; অপর্ণা রায়/ রায় পাড়া হাউসিং এস্টেট; কিরীটি ও কিশলয়/ নবাদর্শ, বিরাটী; রঞ্জন ঘোষ, প্রীতি, অসিত ও স্মৃতি/ রায় বাহাদুর রোড, বেহালা; দীপা, সম্রাট ও উর্বশী/ ফরডাইস লেন; সুশান্ত, বাবী ও লম্পা/ মনোহরপুকুর রোড; অজন্তা ও অন্তরা দত্ত/ নিউ ব্রাইট এনোডিসার্স, গড়িয়াহাট; রবীন্দ্রনাথ ও অলকা গিরি/ হাজরা বাগান লেন; অরুণিমা, কৌস্তুভ, সুদীপ, স্বাতী, দেবকী, অমৃতা ও শান্তনু/ শুঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা; পার্থ, শান্তনু, সপাই ও গোপাল/ বেহালা বাবু সংঘ, ডাঃ হারবার রোড; গোপা, টুম্পা, দোলন, ঝুলন ও মণি/ পূর্ব সিঁথি, দমদম; শকুন্তলা মিত্র/ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন; লম্পা ও দীপা চ্যাটার্জী/ টি. এন. বিশ্বাস রোড, দক্ষিণেশ্বর; টুম্পা ও টুবলু দত্ত/ কালীপুর রোড; দেবশ্রী সেনগুপ্ত/ নাকতলা লেন; শ্যামলজিৎ, নিবেদিতা, পারমিতা ও অনিন্দিতা/ দমদম ক্যান্টনমেন্ট; সুবীর চ্যাটার্জী/ ডাঃ কে. ডি. মুখার্জী রোড, বেহালা;

।। হাওড়া।।

বিজু, সবু, নিবু, জীতেন, নবীন ও অপু/ চ্যাটার্জীহাট; ছন্দা, নন্দা, হাসি, টুটু, বুবু ও বুই/ রামরাজাতলা, ভট্টাচার্য পাড়া; বর্ণালী, মালবিকা, দেবযানী, সুমন, শিবাশিস শাস্ত্রী/ নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী রোড, বেতড়; শুভ্র, শোভন ও অদিতি মান্না/ আব্দুল পূর্ব পাড়া; বিশ্বজিৎ, প্রসেনজিৎ, শুভ্রজিৎ ও সুবীর/ দে পাড়া লেন, শিবপুর; মাধব নন্দী/ পল্লবপুকুর, সাঁতরাগাছি; দোলনচাঁপা, মধুমিতা ও জয়ন্ত ব্যানার্জী/ মাজু; মৌমিতা ও রুচিরা নাগ/ শান্তিরাম পাড়া, বালি; মৌসুমী, ছন্দা, সোমা ও বাবাই/ ইছাপুর, সাঁত্রাগাছি; সুদীপ্ত, সুকুমার, সুরজিৎ ও পার্থ/ কল্যাপাড়া লেন;

।। ২৪ পরগনা।।

অনিন্দিতা ও অঙ্কন/ গ্রামীণ হাসপাতাল, কাকদ্বীপ; পিনাকী, পার্থ, রাজর্ষি, অর্ঘ, অপর্ণ, দেবারতি, অরিন্দম ও মহাশ্বেতা/ বিড়লাপুর; স্বপন, ব্রততী ও অদিতি/ রাজপুর; স্মৃতি ও স্মিতা চৌধুরী/ আঁতপুর, শ্যামনগর; চৈতালী সিনহা/ বনগ্রাম, রেলবাজার; বিদ্যুৎ, নৃপেন, জিতেন, রতন, বিশ্বজিৎ, সনৎ ও সুব্রত/ দক্ষিণ রায়পুর; সুস্তা, কাকলি ও প্রসাদ/ নৈহাটি; পলা বসু/ সোদপুর; বাবাই, বুয়া, অনির্বাণ ও প্রবাহন/ বাসুদেবপুর রোড, শ্যামনগর; বনানী, কাকলি ও প্রদীপ্ত/ রহড়া; কৌশিক ও কিংশুক/ পূর্ব তালবাগান রোড, নোনাচন্দন পুকুর, ব্যারাকপুর; দেবযানী ও কৃষ্ণা/ বেলঘরিয়া; শুভ্রমালা, গৌরী, দেবী, চন্দনা, টুটুন ও রীতা/ ইছাপুর, আনন্দমঠ 'সি' ব্লক; সুশান্ত, গোপা/ ইছাপুর, ইস্টল্যান্ড; কৌশিক নাথ/ শ্রীনগর কলোনী, বসিরহাট;

।। হুগলী।।

সঞ্জয় ও সৈকত দত্ত/ মাহেশ; অচিন্ত্য ভট্টাচার্য/ খামারবেড়, হাটবসন্তপুর; দেবাশিস ও স্নেহাশিস/ শ্রীরামপুর; সোমালী ও সৃঞ্জয় ভট্টাচার্য/ ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী লেন, উত্তরপাড়া; ঈশান, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও অশোক/ টুলিপাড়া লেন, শ্রীরামপুর; শ্যামাপ্রসাদ দাস, মীরা সরকার ও সুপর্ণকান্তি দাশ/ কয়াপাট; সুমিত, মৌমিতা, লিউলি ও মিঠু/ মাহেশ/পাপিয়া ও রাজীব/ ওলাইচণ্ডীতলা, হুগলী; সুপ্রিয়া ও সুপর্ণা/ কালীমাতা হার্ডওয়্যার স্টোর্স হরিপাল; তুলতুল, পকাই, চকাই, সোনাই ও টিনা/ পল্লীশ্রী, আরামবাগ; শুভ্র, শাখী, কবি ও তনুশ্রী গাঙ্গুলী/ নিত্যানন্দপুর; বল্টু, বুলবুল, সিদ্ধার্থ, সোমা, শান্ত ও সৌভন/ নন্দনকানন, ডানকুনি; বিকাশ চৌধুরী/ আরামবাগ; দোয়েল, মুক্তিপ্রকাশ, চৈতালী, দেবদত্ত ও রবি রায়/ আরামবাগ; সজল, অপূর্ব, তন্ময়া, রিক্তা ও শুভ্রা/ বিবেকপল্লী, লেওড়াফুলী; ফুগলী, লম্পা, করুণা, শৈলপ্রদীপ, অপ্রতিম ও অরুণবাবু/ গভঃ কলোনী, লেওড়াফুলী; মামাই, ইতু, রুমা, মীন, অ্যান্টনী, শেলী ও সজল/ চণ্ডীকৃষ্ণ মঠ, লেওড়াফুলী;

।। মেদিনীপুর।।

কপিল দেবপাহাড়ী/ কেরানীতলা/নেড়া, মণি, খোকা, রীতা,তনু, বনু ও নীতু/ ইন্দা, মাহালীপাড়া, খড়্গপুর; বুলি ও রাণা/ হলদিয়া; বাপটু ও বুবান/ গিধনী; লম্পা, সিক্তা ও মৌসুমী ঘোষাল/ ওল্ড সেটেলমেন্ট, খড়্গপুর; টুলু, বুবু, টুটু/ আলবাগিচা, খড়্গপুর; শাকাসিংহ ও অর্চনা দত্ত/ রবীন্দ্রনগর; বাপী, বাবুয়া ও মৌ/ রেল কোয়ার্টার, ঝাড়গ্রাম; সুনেত্রা ও জর্জ নাগ/ বড়বাজার;

[বাকি উত্তর দাতাদের নাম আগামী সংখ্যায়]

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে। আস্তে আস্তে কি রকম গরম পড়ছে দেখেছো! রোদের তেজে গায় জ্বালা ধরে যায়। সূর্যদেব ঘুম ভেঙে উঠে পড়েন সাড়ে পাঁচটার আগেই। অস্তে যেতে যেতে প্রায় ছটা। সারাটা দিন শুধু গরম আর গরম। যেন আগুন ছোটে। তার মধ্যে ছুটে আসে এলোমেলো বাতাস। কখনো কালো মেঘের দল দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে কখনো সখনো বৃষ্টি। কালবৈশাখীর ঝড় থামলে চারদিকটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। মেঘ টেঘ কেটে গিয়ে তখন বইতে শুরু করে ঝিরঝিরে হাওয়া। পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকালেই তখন দেখতে পাবে উত্তর দিকে জ্বলজ্বল করছে ধ্রুবতারা আর সপ্তর্ষিমন্ডল। পশ্চিমাকাশে দেখবে ছায়াপথ আর কালপুরুষ। নিচের দিকে লুব্ধক আর অগস্ত্য নক্ষত্র। মধ্যিখানে দেখবে সিংহ রাশির পূর্ব ও উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র। পুবদিকে ঘেঁষে আছে স্বাতী, কন্যা আর তুলা রাশি।

তোমরা নিশ্চয়ই এখন খুব খুশি। পুজোর সময় পেয়েছিলে শুকতারার পুজো সংখ্যা। আর এবার বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা। তোমাদের ভালো লাগার মতো করেই এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছে। কতো কি আছে বলো! কেমন লাগে জানিও। আর একটা কথা, তোমাদের বন্ধুরা চিঠি দিচ্ছে–তাদের দাবি, শুকতারাকে পাক্ষিক করতে হবে। তারা বলছে, মাসে একবার–বড্ড দেরি হয়ে যায়। তাই মাসে দুবার করে শুকতারা চাইছে তারা। তোমরা সকলেই কি তাই চাও? তোমরা যদি সকলেই তাই চাও তাহলে আমাদের জানাও। তখন তোমাদের হয়ে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমরা দরবার করবো। তোমাদের ইচ্ছের কথা জানাবো।

দেখো আবার সেই একই কান্ড। আমাদের এক বন্ধু অন্যের লেখা কবিতা নিজের লেখা বলে পাঠিয়েছে। আমরাও ছেপে দিয়েছি। আর তারপরই চিঠির পর চিঠি। গত কার্তিক মাসে শিবকুমার রক্ষিত এই কান্ড করেছে। 'কান টানলে' ছড়াটি ক'বছর আগে একটি ছোটদের পত্রিকার পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। সমীরণ মন্ডলের (আর.বি.আই স্টাফ কোয়ার্টার্স, বি. বি. কে পাল লেন, কলকাতা-৩০) অভিযোগ করা চিঠিটাই আমরা সবার আগে পেয়েছি। এমন ঘটনা যদি প্রায়ই ঘটতে থাকে তাহলে কিন্তু মুশকিল। 'তোমাদের পাতা' তোমাদের জন্যেই। এতে যাতে অমন সব বিচ্ছিরি ব্যাপার না হয় তার দায়িত্ব তো তোমাদেরই। তাছাড়া অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো–সেও তো যা তা ব্যাপার। শিবকুমারের এই কান্ড দেখে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। তোমরা কেউ যেন অমন কাজ কোরো না। আর শিবকুমার, তুমি নিজে লেখো। চেষ্টা করো, দেখবে তুমি নিজেই কতো ভালো লিখতে পারবে। তখন সকলে প্রশংসা করবে, ভালো বলবে–তাই না! এমন আর কখনো কোরো না কেমন!

এবার তোমাদের ক'জনের চিঠির উত্তর দিই।

প্রবীরকুমার চক্রবর্তী (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, চাইবাসা, সিংভূম, বিহার)
তোমার চিঠি সেই কবে এসেছে। উত্তর দেওয়াই হয়নি। তোমার লেখা কবিতা গল্প যা খুশি পাঠাও। হাতের লেখা ভালো নয়–তাতে কি। লিখতে লিখতেই ভালো হয়ে যাবে। তবে নাম, ঠিকানা, স্কুলের নাম, বয়েস, ক্লাশ সব লিখে দেবে কিন্তু। নিয়ম শুধু ঐটাই।

প্রবাল সেনগুপ্ত (যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা)
তোমার চিঠি পড়ে ভীষণ ভালো লাগলো। তুমি ঠিক কথাই লিখেছো–শুকতারা 'নয় থেকে নব্বই' সব বয়সের জন্যেই। তোমার বন্ধুদের কি ধরনের লেখা ভালো লাগে, তারা কি চায়–জানাও। দেখবে তারাও 'নয় থেকে নব্বইয়ের' দলে দিব্যি ভিড়ে গেছে।

সুদীপ্ত মুখার্জি (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ)
খুশি তো! তোমাদের কথা মতো আমরা 'হাতে কলমে' বিভাগটি শুরু করেছি। তবে এখনই প্রতি সংখ্যায় দেওয়া যাবে না। তোমরা করে দেখবে কিন্তু। কেমন হয় জানিও।

রীনা দাস (ইলছোবা মণ্ডলাই, হুগলী)
যতো খুশি লেখা পাঠাতে পারো। কোন নিয়ম টিয়ম নেই। শুধু নাম, ঠিকানা, স্কুলের নাম, ক্লাস আর বয়েস দিয়ে দেবে। কেমন!

দেবযানী সাহা (যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুল, কলকাতা ৬৮)
পাঠাও না লেখা। খামে, ইনল্যান্ডে, পোস্টকার্ডে–যত খুশি।

সন্দীপ দাস (বয়স বার, আমদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, আমদাবাদ)
কি সর্বনাশ! তুমি দাদুমণির সঙ্গে লড়তে চাও। দাদু-নাতির যুদ্ধ হলে নাতিই যে জিতবে! তখন...? তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি–গল্প চেয়েছিলে–পেয়ে গেলে হাসির উপন্যাস।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই।
আদর আর ভালোবাসা নাও।
জয়হিন্দ

দাদুমণি

তোমাদের পাতা

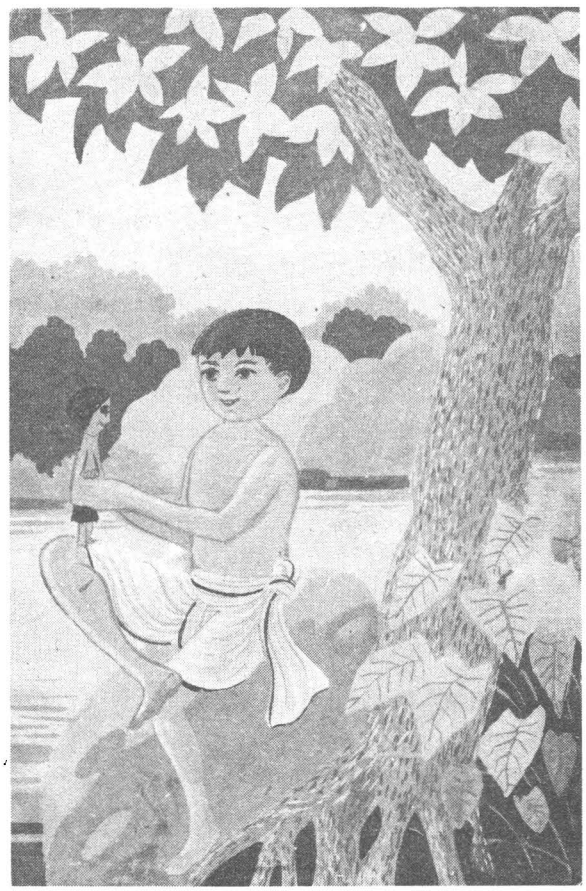

নীলাঞ্জনা মজুমদার বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী
লরেটো ডে স্কুল, বৌবাজার, কলকাতা

বিড়াল

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে একটি বিড়ালের দুটি বাচ্চা হয়েছে। আমি আমার মাকে নিয়ে বাচ্চা দুটোকে দেখতে গেলাম। কী সুন্দর সাদা সাদা ছোট্ট দুটো বিড়ালছানা ওদের মার পেটের কাছে কুঁ কুঁ করছে। আমার মা বলল ওদের নাকি এখনও চোখ ফোটেনি।

পরদিন দুপুরবেলা একটা যেন হুলো বিড়ালের ডাক শুনলাম বলে মনে হলো। মা আর আমি দৌড়ে নিচে গিয়ে দেখলাম হুলোটা বাচ্চা দুটোকে নিচে নামিয়ে একটাকে মারছে। বাচ্চাটার পিঠ ও পেট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তাই দেখে আমার খুব কষ্ট হলো। আমি হুলোটাকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিলাম আর বাচ্চা দুটোকে ওদের জায়গায় তুলে দিলাম। একটু পরেই ওদের মা এসে গেল। আমি রান্নাঘর থেকে একটু দুধ এনে ওদের দিলাম। দুটো দিন কাটল।

তিন দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে গিয়ে দেখি মা-বিড়াল আর বাচ্চা দু'টো কেউ নেই। অন্য কোথায় চলে গেছে। কোথায় গেছে, কেন গেছে কিছুই বুঝলাম না। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মাও চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

সঞ্চালী ভট্টাচার্য
বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী
রাজকুমারী বালিকা বিদ্যালয়
বরানগর

সুব্রত সরকার
বয়স দশ, ষষ্ঠ শ্রেণী
মাইথন সিরামিক,
কুমারডুবি

কালবৈশাখী

ঐ কালবোশেখি আসছে রে,
মত্ত পাগল, চিত্ত যে মোর
উল্লাসে আজ হাসছে রে
কালবোশেখি আসছে রে।

প্রাচীন উষর, ধূলায় ধূসর
অন্তরে আজ ফুঁসছে রে
কালবোশেখি আসছে রে।

বর্ষশেষের আবর্জনা
দূর হলো আজ এক ফুঁয়ে
নতুন জগৎ উঠলো হেসে সর্বনাশা প্রলয়ে
ধ্বংস মাঝে সবুজ শ্যামল
নতুন জগৎ হাসলো রে,
আকাশ বাতাস মাতিয়ে শেষে
কালবোশেখি থামলো রে।

গৌতম রায়চৌধুরী বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
নিউ আলিপুর, কলিকাতা

কোনটা

সবাই জানে কোনটা বেলুন,
কোনটা বলে চাকি,
শিলনোড়াটা চিনতে কারো
আছে কি আর বাকি?
কিন্তু এখন প্রশ্ন ভেবে
বিগড়ে গেছে মনটা,
কোনটা বলে হামান?
আর দিস্তে বলে কোনটা?

সৌগত রায়চৌধুরী বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
চিলড্রেন্স্ ওন হোম, উত্তরপাড়া

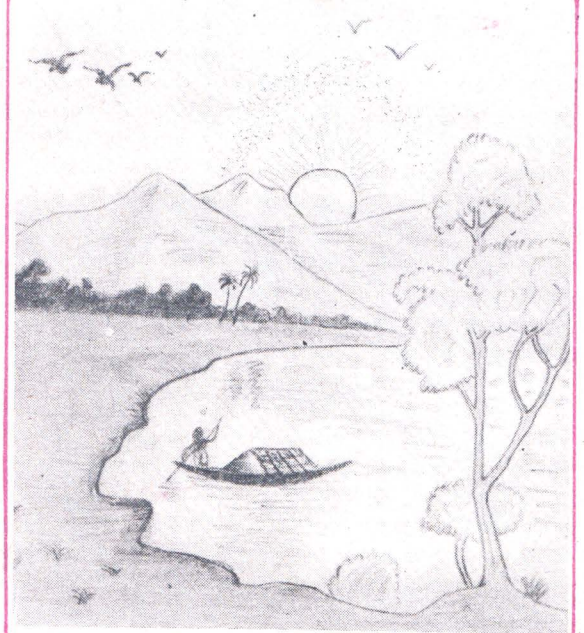

সঞ্জয় মন্ডল বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
রাউরকেলা –উড়িষ্যা

আফ্রিকার জঙ্গলে

অমিয়কুমার হাটি

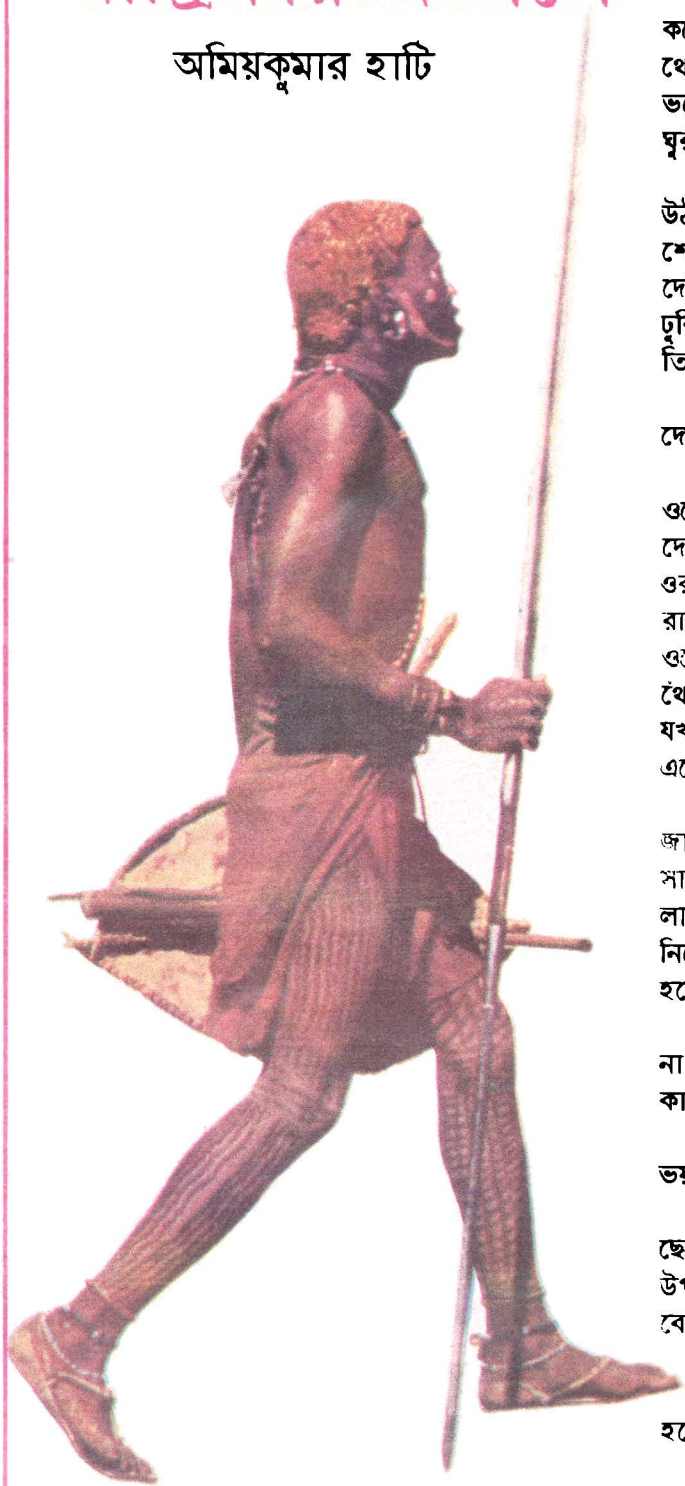

ভয়ে আমি কাঁপছি। আমার চারপাশে গোটা চারেক সিংহ। আফ্রিকার জঙ্গলে তখন দিনের আলো কমে আসছে। অন্ধকার হয় হয়। কেন যে মরতে গাড়ি থেকে নামতে গিয়েছিলাম, না নামলেই ছিল ভাল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সিংহগুলো চারপাশে ঘুরছে। আমি ওদের দিকে তাকাতে ভরসা পাচ্ছি না।

হঠাৎ কে যেন আমার হাত ধরে টানলো। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। শেষকালে সিংহেরই ভোজে লাগলাম বুঝি! এক লহমায় দেখি কি, আমাদের গাড়ির নিগ্রো চালক সিজার আমাকে ঢুকিয়ে নিয়েছে আমাদের গাড়িটার ভিতরে–আর তিনজন সাহেবকেও।

কেন যে ভীমরতি ধরেছিল। সিংহ তো গাড়িতে বসেই দেখা যেতো। তা না–যত্তো সব–

শুধু সাহস করে নেমেছিলাম আমরা একই কারণে। ওদের ওই আখড়াটার মাঝখানে দেখেছিলাম একটা পশুর দেহের শেষাংশ। খাওয়া শেষ করেছে বুঝি গত রাতে। ওরা সপ্তাহে দু'বার শিকার করে। তাই, আগের রাতে শিকার করলে আর এখন ভয়টা কী? পেট আছে ওদের ভরে, এখন কি আর গর্জন করবে। এখন তো তার থেকে হাই তুলবে। সিজার ছেড়েছিলও যে কারণে, আর যখনই দেখেছে আমাদের সবারই একই হাল, তখন টেনে এনেছে গাড়িতে।

যখনই এই ঘটনাটা মনে পড়ে তখনই শিরশিরানি জাগে সারা শরীরে। জয় অ্যাডামসন হওয়া কি সকলের সাজে? তবে তিনি তো নবজাতক সিংহীকে ছোট থেকেই লালনপালন করেছিলেন–নাম দিয়েছিলেন এলসা। তাঁর নিজের মেয়ের মতোই ছিল সে–পরে তারও ছেলেমেয়ে হয়েছিল–সে এক সিংহীর সংসার।

আফ্রিকায় এখন নরখাদক সিংহের কথা শোনা যায় না। ওরা লোপ পেয়েছে। আমাদের সাহসের বাড়তি কারণ ছিল সেটাও।

তবে একসময় ছিল নরখাদক সিংহ আফ্রিকায়। ভয়ানক অভিশাপের মতো।

সারা দেশটাই জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভিতর ছোট ছোট গাঁ। এখনো এরকম কোনো গাঁ, বিশেষ করে মাসাই উপজাতির গাঁয়ে গেলে দেখা যাবে, গাঁটা বেড়া দেওয়া। বেড়া দেওয়া এ ধরনের নাম কারাল।

সে বেড়া সিংহের পালকে রুখবে কী করে? বিশেষ করে গোটা সিংহের দলটাই যখন নরমাংসভুক হয়ে উঠেছিল।

অবাধে ভয়ংকর উৎপাত চালাতো সিংহের দল। আফ্রিকার কালো মানুষদের অসহায়তা বেড়ে যেতো, তার

আরও একটা কারণ–কোথাও কোথাও তাদের ধারণা ছিল পালের গোদা যে সিংহ সে আসলে সিংহ নয়, মানুষ সিংহ হয়ে গেছে। সে মানুষ আর কেউ নয়, ওঝা গাঁয়ের ওঝা–যে জানে যাদু, যে উৎপীড়ক–গাঁয়ের লোকেদের ভয় দেখায়, বশে রাখতে চায়। ওঝা যা দাবি করত তাই দিতে হতো গাঁয়ের লোকদের, নইলে দেবে সাজা, মরতে হবে সিংহের মুখে। ওঝাই সেই সিংহ। তাদের ধারণা, সিংহকে যদিও মারা যায়, এই নৃসিংহকে বধ করতে কেউ পারে না, অমর সে।

কেনিয়ার পাশের দেশ তানজানিয়াতে একবার দেখা দিয়েছিল এরকম একটা সিংহের দল–ছারখার করেছিল কারালের পর কারাল। এদের দলপতি আবার ছিল একটা সিংহ (ওদের মতে নৃসিংহ), যার কেশরের রং কালো। ছোট ছোট খড়ে ছাওয়া ঘর। বাঁশের ঠেকা দেওয়া বেড়ার দরজা। সিংহগুলো করত কি চালে উঠে খড় সরিয়ে ঘরে লাফিয়ে নেমে মানুষ মারত। কখনো বা দরজা সটান ঠেলে ঘরে ঢুকত। নারী বুড়ো জোয়ান কেউ বাদ যেতো না। দিনে পাঁচ-সাত জন অবধি মানুষ মেরেছে, খাবলে খেয়েছে। সিংহ শিকারের সে ছিল সোনার যুগ।

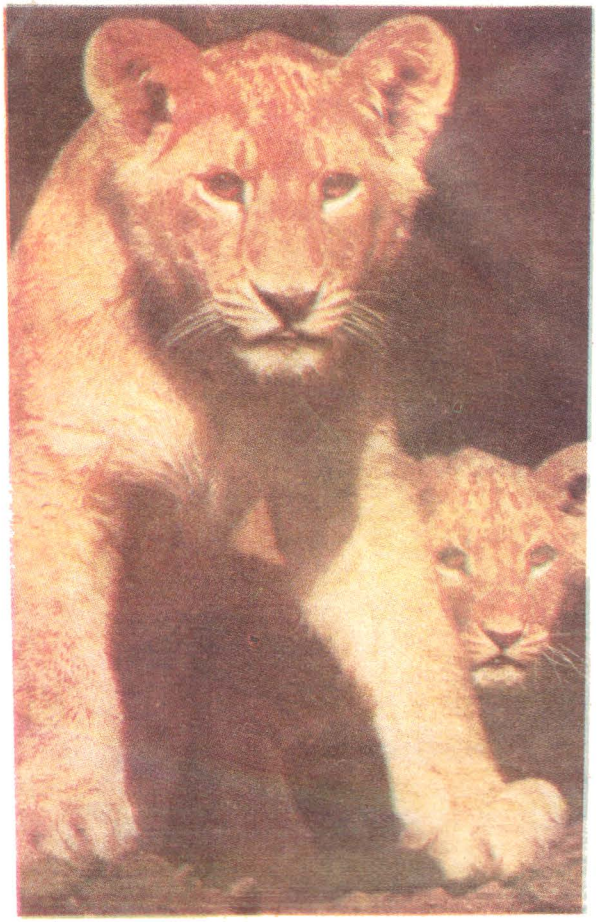

তবে বোধ হয় সিংহেরা বাঘের চেয়ে বোকা। দলে দলে মারা পড়ত শিকারীদের হাতে–বন্দুকের গুলিতে।

কোনো সিংহ যদি আহত হয়ে খোঁড়া হয়ে পড়ত–তাহলেও সে পরিণত হতো নরখাদকে। আগে ইঁদুর-ধরা কলের মতো সিংহ ধরা কলের চল ছিল। এখন এসব আইন করে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে–বনের পশুকে উত্ত্যক্ত করা চলবে না।

যাই হোক এ রকম এক পশুরাজ একবার আটকা পড়েছিল ঐ ধরনের ফাঁদে। পশুরাজ বলে কথা! স্বাধীনতা তার বড় প্রিয়। তর্জন-গর্জন, লাফ-ঝাঁপ, শিকল টানা, সামনের একটা পায়ের আটকানো থাবাটি রইল শুধু–সিংহ পালাল। দিন পাঁচ পরে শুরু হলো তার মানুষ মারা অভিযান–কারণ খোঁড়া সিংহ বনের পশু মারবে কী করে? এমনকি একসঙ্গে দল বেঁধে দিনের

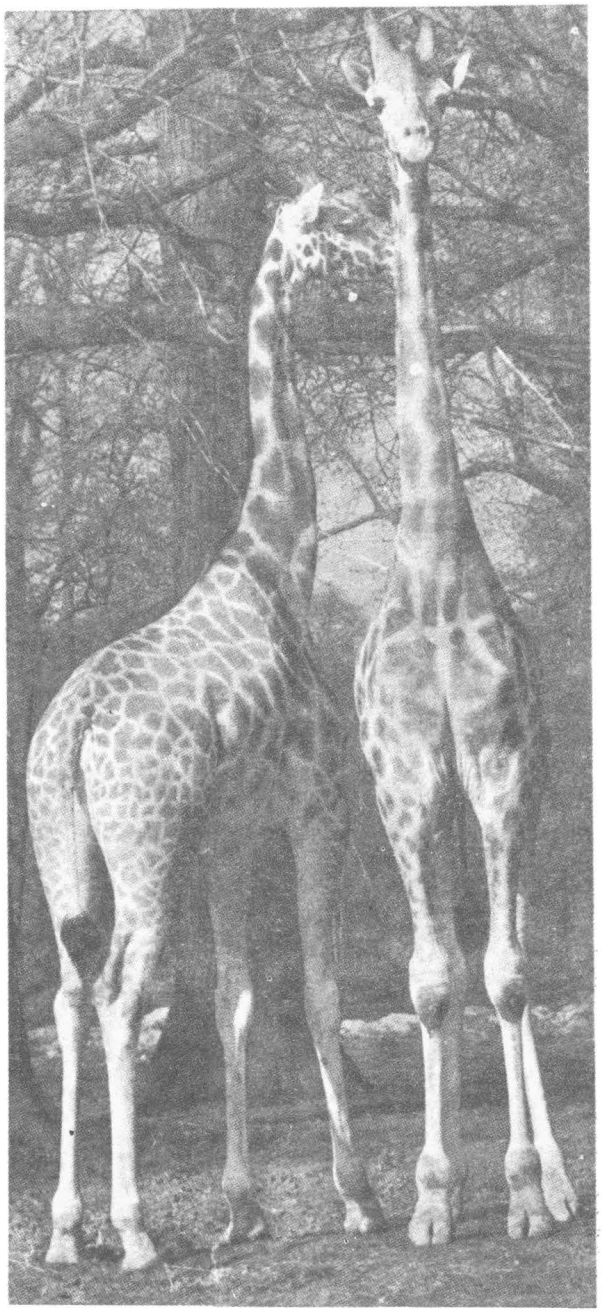

বেলা দূরে কোথাও ঝোরা থেকে জল আনতে গেলেও রেহাই নেই–সারির শেষের মানুষটাকে তুলে নিয়ে যাবে। সাধারণত সিংহ রাত্রেই শিকার করে। এর বেলা সময়টাও বদলে ফেলল–রাতে পাহারা দেয় মানুষ, ঘরে-টরে ঢোকা মানে অনেকটা ঝুঁকি নেওয়া। শিকার ধরে নিয়ে লুকাতো 'মেতেতি' বলে বাঁশের মতো এক ধরনের গাছের গভীর বনে, যার পাতা সূঁচের মতো সরু। গাঁয়ের লোকেদের হাতে তো সাদা চামড়ার শাসক লোকেরা বন্দুক তুলে দেবে না! মরছিল তারা সিংহের হাতে। এলেন এক শিকারী। একদিন তাঁরই এক নিগ্রো সহকারী জঙ্গলে ঢুকেছে। সাহেব সিংহের খোঁজে বেরিয়ে দেখলেন, মাটিতে সেই সহকারীর পায়ের ছাপ। ভয় হলো তাঁর, যদি ওকে সেই মানুষখেকো সিংহটা অনুসরণ করে। পায়ের ছাপ ধরে চললেন। কিছুদূর এগিয়ে দেখেন কি, যা ভেবেছিলেন তাই, খোঁড়া পায়ে চুপিসাড়ে নিগ্রোটির পিছু নিয়েছে সিংহটা। নিগ্রোটি হাঁটছে। থামলেই তার ঘাড়ে লাফাবে সিংহ। চলন্ত জীব বা পশুর উপর সিংহ সাধারণত লাফায় না। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা জীবই তার পছন্দ। খোঁড়া সিংহটাও চাইছে কখন থামবে ছেলেটা, কখন মটকাবে তার ঘাড়। বিপদ গুনলেন শিকারী। বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। যেই পিছু ফিরল সিংহ, সেই গুলি। এক গুলিতে শেষ।

কোনো এক সময়ে কেনিয়াতে সিংহ বেড়ে গিয়েছিল খুব, বলতে গেলে জঙ্গলে গিজগিজ করত। অত আর পেট ভরাবার পশু পাবে কোথায় জঙ্গলে? হানা দিত তাই গৃহপালিত পশুর উপর, চড়াও হতো মানুষের ঘাড়েও। ডাক পড়ল শিকারীদের। কয়েক সপ্তাহে এরকম গোটা পঞ্চাশ সিংহ শিকারের বিবরণ পাই শিকারী জে. এ. হান্টারের 'আফ্রিকান সাফারি'তে।

সুন্দরবনের মানুষকে যেমন বাঘ নিয়ে ঘর করতে হয়, আফ্রিকার আদিম মানুষদেরও সেই রকম বাস করতে হতো সিংহদের নিয়ে। এরকম একটা উপজাতির নাম 'মাসাই'–এদের তরুণ যোদ্ধারা দল বেঁধে সিংহ শিকারে বেরুত। অসীম ছিল তাদের সাহস এবং মনের বল। না থেকে উপায়ও ছিল না বুঝি–সে যে বীর, তা প্রমাণ করবে কেমন করে, সিংহ না মারলে? আর বীর না হলে, নিজের হাতে সিংহ না মারলে তাকে বিয়ে করবে কোন মাসাই রমণী? তারা সিংহ শিকারে যখন বের হতো, তখন মাথায় পরত সিংহের কেশরছাওয়া টুপি, এক হাতে থাকত চকচকে বড় বর্শা আর হাতে বুনো মোষের চামড়ার তৈরি ঢাল–এক একটা ঢালের ওজনই ১৫।২০ কেজি।

এখন সিংহ শিকার আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে নাকি জিম্বাবুয়েতে কোনো বিশেষ 'সাফারি' এলাকাতে এক লাখ সোয়া লাখ টাকা জমা দিয়ে সিংহ শিকার করতে পারা যায়! পশুরাজ শিকারের শখ! যে সে শখ তো আর নয়!

[চলবে]

ছোটদের মনের মত বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
- টুনটুনির গল্প [৩.০০]

সুকুমার রায়
- খাগড়াই [৩.৫০]

সুখলতা রাও
- ঈশপের গল্প [৩.৫০]

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- হাসিখুশি-১ [৩.৫০]
- হাসিখুশি-২ [৩.৫০]
- হাসিরাশি [৪.৫০]
- আষাঢ়ে স্বপ্ন [৩.০০]
- ছোটদের রামায়ণ [৩.০০]
- ছোটদের মহাভারত [৬.০০]

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- কুমির সাহেব [৩.০০]

লীলা মজুমদার
- জানোয়ার [৪.০০]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে [৫.০০]
- ছেলেবেলার বিবেকানন্দ [৪.০০]
- ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ [৫.৫০]
- ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত [৬.০০]

সুনির্মল বসু
- আমার ছড়া [৪.৫০]

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
- ছোটদের সারদাদেবী [৬.৫০]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- বর্ণ পরিচয়–১ম ভাগ [২.৫০]
- বর্ণ পরিচয়–২য় ভাগ [২.৫০]

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
- ছবিতে হিতোপদেশ [৩.০০]
- ছবিতে রামায়ণ [৫.৫০]
- ছবিতে মহাভারত [৬.০০]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস
- আমরা বাঙালী [৪.০০]
- আমাদের দেশবন্ধু [২.২৫]

মনোমোহন চক্রবর্তী
- ছবিতে পৃথিবী ১ [৪.০০]
- ছবিতে পৃথিবী ২ [৪.০০]

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
- মজার ছড়া [৫.০০]

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
- মজার কবিতা [৫.০০]

শৈল চক্রবর্তী
- ছড়ার দেশে টুনটুনি [৬.০০]

গৌরী ধর্মপাল
- চোদ্দ পিদিম [৬.০০]

মীরা বালসুব্রমনিয়ন
- তিনটে তামার পয়সা [৭.০০]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রভাত বসু
- ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন [৬.০০]

আমার শৈশব

জন্মদিনে, অন্নপ্রাশনে উপহার দেবার মত বই। সাধারণ ২৫.০০ : শোভন ৪০.০০

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা-৯ ঃ ৩৫-৭৬৬৯

বাহাদুর বেড়াল

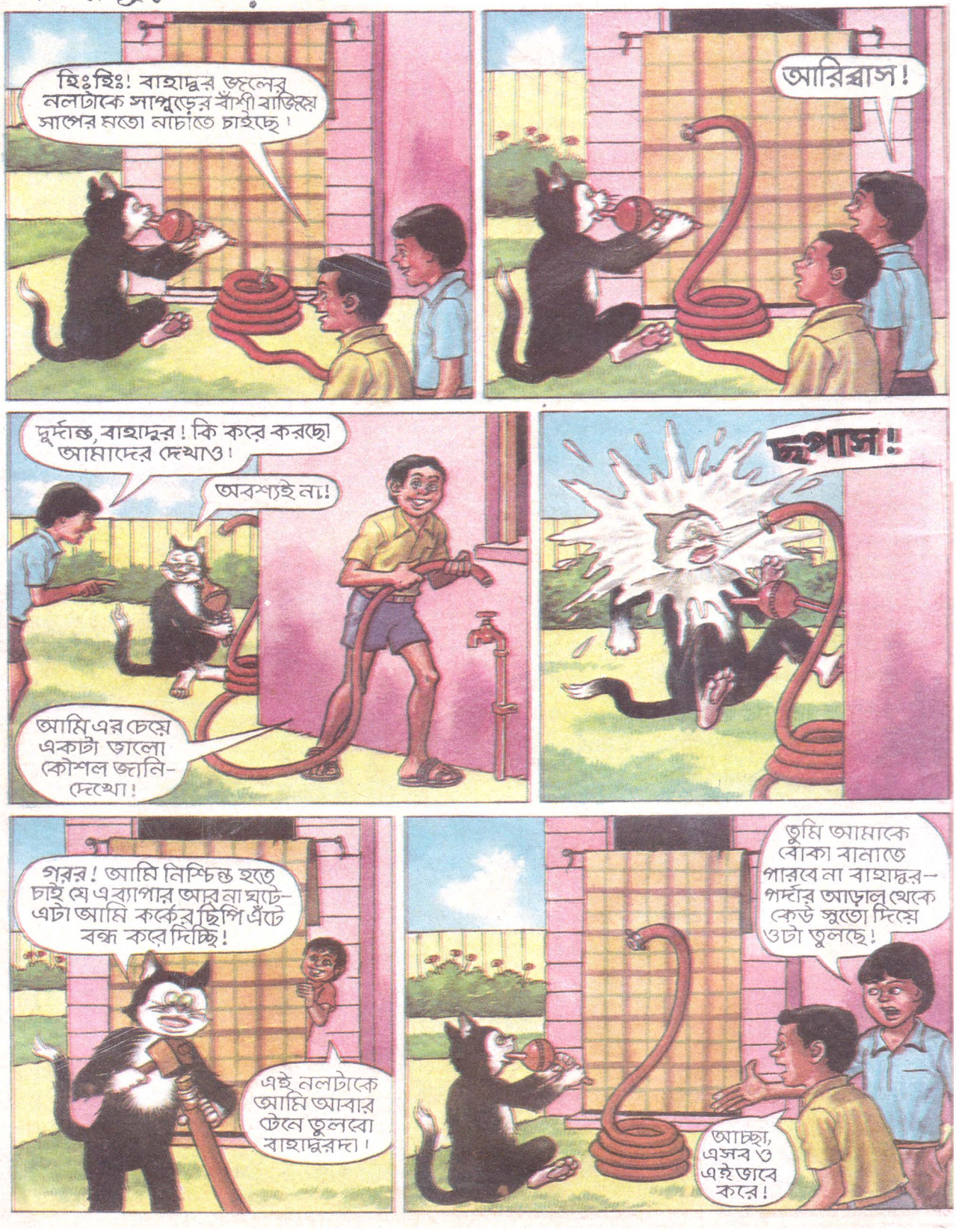
হিঃহিঃ! বাহাদুর জলের নলটাকে সাপুড়ের বাঁশী বাজিয়ে সাপের মতো নাচাতে চাইছে!
আরিব্বাস!
দুর্দান্ত, বাহাদুর! কি করে করছো আমাদের দেখাও!
অবশ্যই না!
আমি এর চেয়ে একটা ভালো কৌশল জানি- দেখো!
ছুপাস!
গরর! আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই যে এ ব্যাপার আর না ঘটে- এটা আমি কর্কের ছিপি এঁটে বন্ধ করে দিচ্ছি!
এই নলটাকে আমি আবার টেনে তুলবো বাহাদুরদা!
তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না বাহাদুর- পর্দার আড়াল থেকে কেউ সুতো দিয়ে ওটা তুলছে!
আচ্ছা, এসব ও এইভাবে করে!

এটা কি করে হচ্ছে তোমাকে বলবো না-আর এবার আমাকে জলে চোবাতে পারবে না- আমি নলের মুখ এঁটে দিয়েছি।
তাই বুঝি-ঠিক আছে দেখি!
ঠপাৎ!
ছিপি গিলে বাহাদুরের সব বাহাদুরি একেবারে ঢিলে হয়ে গেলো!
হিঃ হিঃ!

এপ্রিল ফুল

আরতি বসু

সকালবেলা সবে চায়ের কাপটা হাতে নিয়েছি টুনু এসে হাজির। হাসি হাসি মুখ, হাতের মুঠোয় কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে।

–কী ব্যাপার টুনুবাবু, আজ স্কুল নেই।

–সে তো অনেক দেরি। তার আগে দেখ তোমার জন্যে কী এনেছি।

–কী এনেছো দেখি। টফি! বাঃ, দাঁড়াও আগে চা-টা শেষ করি।

–না, আগে এটা নাও, নিতেই হবে।

অগত্যা চা রেখে টফিটা নিলাম। তারপর যেই না টফির মোড়কটা খোলা অমনি টুনু লাফাতে শুরু করে দিল –এপ্রিল ফুল, কাকু এপ্রিল ফুল।

আমিও হাসছিলাম, টুনুবাবুর দিনটা তো বেশ মজা দিয়েই শুরু হলো।

টুনু বলল, জানো কাকু দাদাকেও আজ এপ্রিল ফুল করেছি। কিন্তু দাদাটা এমন যে ঠকে গিয়ে আমাকেই মারছে।

–খুব অন্যায়, আজ রাগ করা মোটেই উচিত নয়। কারণ এই এপ্রিল ফুল ব্যাপারটা এসেছে একটা আনন্দ-উৎসব থেকে।

–সত্যি! টুনু অবাক হয়ে শুধোল, সে কোথাকার উৎসব কাকু!

–জানো তো ইউরোপে শীতকালে কী ভীষণ ঠান্ডা পড়ে। সেই যে ঠান্ডা পড়তে শুরু করে অক্টোবর থেকে, চলে একেবারে মার্চ মাস অবধি। এই কটা মাস ধরে শুধু বৃষ্টি, বরফ আর হাড়কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়ার মাতামাতি। মার্চ মাসের পর থেকে আবহাওয়া একটু একটু করে বদলাতে থাকে। বরফ গলে গিয়ে মাঠ আবার সবুজ ঘাসে ভরে ওঠে, গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়, দু একটা করে ফুলের কুঁড়িও দেখা দিতে থাকে। ইতিমধ্যে নতুন বছর শুরু হয়ে গেছে জানুয়ারিতে। কিন্তু নতুন বলতে যে ঝকঝকে সুন্দর একটা ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটা জানুয়ারিতে পাওয়া যায় না, যায় এই এপ্রিল মাসে। তাই এই মাসের গোড়াতেই ওদের দেশে একটা উৎসব হতো, বসন্তবরণের উৎসব। বর্ষবরণের উৎসবও বলতে পারো। সেই উৎসবটার নাম আর চেহারা বদলে হয়েছে এপ্রিল ফুল।

–বাঃ বেশ মজা তো, কোথায় বসন্ত-উৎসব আর কোথায় বোকা বানানো। আচ্ছা কাকু তাহলে কি, এপ্রিল মানে বসন্তকাল।

–না ঠিক তা নয়, এপ্রিল শব্দটা এসেছে ল্যাটিন 'অ্যাপিরায়ার' (Aperire) থেকে যার অর্থ উন্মোচন করা। ঐ যে বললাম এপ্রিলের ঝলমলে দিন যেন সত্যি করে নতুন বছরের সূচনা করে, তাই মাসটার নাম দেওয়া হয়েছে এপ্রিল।

–কিন্তু তুমি যে বলেছিলে ক্যালেন্ডার প্রথম করেছিল রোমানরা, তাহলে ল্যাটিন নাম কেন হলো?

–ব্যাপারটা কি জানো এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকে বলেন রোমানরা ক্যালেন্ডারের এই চারনম্বর মাসটিকে উৎসর্গ করেছিল সৌন্দর্য ও ভালবাসার দেবী ভেনাসের নামে। দেবী ভেনাসের গ্রীক নাম 'অ্যাফ্রোদিতি' (Aphrodite)। সেই থেকেই মাসটির নাম হয়েছে এপ্রিল।

টুনুর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল, ভাগ্যে আজ তোমাকে এপ্রিল ফুল করতে এসেছিলাম।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

বিশ্ব-পরিচয়

মানেই

পৃথিবীর ইতিহাস

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বিবরণ

পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ ৭০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। আধুনিক ছোট আপ, সুদৃশ্য বাঁধাই। দাম ৪০ টাকা।

৪০ টাকা পাঠালে রেজেস্টারী করে পাঠান হয়।

দেব সাহিত্য কুটীর /২১, ঝামাপুকুর লেন/কলি-৯

Registration No. W.B./E.C.—60 April '86 "Suktara"

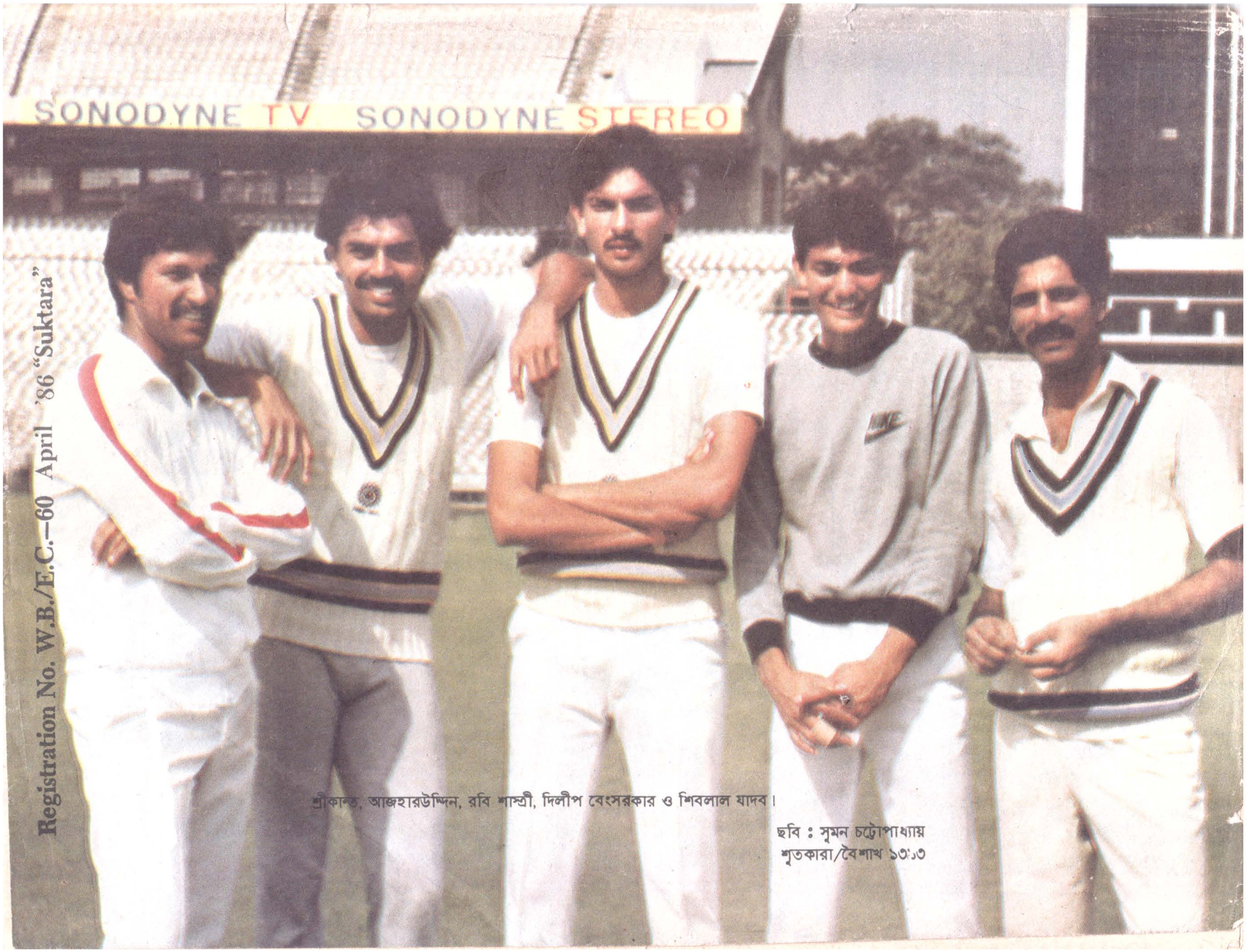

শ্রীকান্ত, আজহারউদ্দিন, রবি শাস্ত্রী, দিলীপ বেংসরকার ও শিবলাল যাদব।

ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়
শুতকারা/বৈশাখ ১৩৯৩